চল্লিশের দশকের ঢাকা

চল্লিশের দশকের ঢাকা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত
সরদার ফজলুল করিম

মান্না পাবলিকেশন
৩০/১ বি, কলেজ রো • কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর, ২০০০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ লেখক
প্রচ্ছদ ঃ সন্দীপ রায় চৌধুরী ও জয়দীপ রায় চৌধুরী

প্রকাশক ঃ অশোক মান্না
মান্না পাবলিকেশন, ৩০/১বি, কলেজ রো, কলকাতা-৭০০ ০০৬
ফোন ঃ ৯৪৩৩১৮৬০৬৪

টাইপসেটিং ঃ স্বস্তিকা এন্টারপ্রাইজ
১৯/১, নীলমণি মিত্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৬

মুদ্রণ ঃ নবলোক প্রেস
৩২/২ সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৬

উৎসর্গ

সেই সে ঢাকার
স্মৃতিবাহকদের
উদ্দেশে

প্রকাশকের কথা

চল্লিশের দশকের ঢাকা বিষযক এই গ্রন্থেব পরিকল্পনায সদয় সম্মতি এবং গ্রন্থরূপ বাস্তব কবে তোলার প্রচেষ্টায সর্বাত্মক সহযোগিতা দিযে আমাদেব অশেষ ঋণে আবদ্ধ কবেছেন কিবণশঙ্কব সেনগুপ্ত ও সরদার ফজলুল কবিম। তাঁরা উভযেই বড় অর্থে ঢাকাবই সন্তান, ঢাকায় অতিবাহিত যৌবনদীপ্ত দিনগুলো উভয়েব চারিত্রবৈশিষ্ট্য, সৃজনপ্রতিভা ও কর্মধারাব মূল সুর বেঁধে দিযেছিল। পববর্তী জীবনে উভযেই নানাভাবে লিখেছেন ঢাকাব কথা। বিক্ষিপ্ত ও পাবস্পরিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্নভাবে হলেও এইসব রচনাব ভেতর দিযে আমাদের এই মহানগরী তথা পূর্ববঙ্গের অতীতজীবনেব অন্তরঙ্গ সামাজিক পবিচয ফুটে উঠেছে, আজো যা বিশেষ প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যময।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত'র জন্ম ১৯১৮ সালের ১ ফেব্রুযাবি ঢাকায। পিতা ছিলেন ঢাকা কলেজেব শিক্ষক, মা প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্তব কন্যা। ইংবেজি সাহিত্যে এম.এ পাশ কবে কিছুকাল শিক্ষকতা ও বাণিজ্যসংস্থায কাজ করেন। ১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গে সবকাবি চাকুরি গ্রহণ কবেন।

১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রথম কবিতাব বই 'স্বপ্ন কামনা'। ১৯৯১ সালে প্রকাশিত হযেছে অষ্টম কাব্যগ্রন্থ 'ছাযা হেঁটে যায়'। প্রায দুই দশক যাবৎ সম্পাদনা কবছেন 'সাহিত্যচিন্তা' পত্রিকা। একাধিক প্রবন্ধগ্রন্থের রচযিতা তিনি এবং কবিতাব জন্য ববীন্দ্র পুবস্কার পেযেছেন ১৯৯০ সালে।

কিবণশঙ্কব সেনগুপ্ত তাঁব বচনাংশের শেষে সংযোজন করেছেন ঢাকাব সঙ্গীত-সমাজ বিষয়ে সুকুমাব বাযেব নিবন্ধ। সুকুমাব রায ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযেব জগন্নাথ হল ছাত্রাবাসের মুখপত্র 'বাসন্তিকা'ব সম্পাদক (১৯৩৩-৩৫), ঢাকা বেডিওর নিয়মিত শিল্পী। ১৯৪৮-এব পব কিছুকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। পবে যোগ দেন অল ইন্ডিয়া বেডিওতে। ১৯৭৪-এ সঙ্গীতবিষয়ক গ্রন্থের জন্য ববীন্দ্রপুবস্কাবে ভূষিত হন।

বর্তমান গ্রন্থেব দ্বিতীয় অংশেব লেখক সরদার ফজলুল করিম-এব পবিচয় এদেশেব পাঠকেব সঙ্গে নতুনভাবে কবিযে দেওযা অর্থহীন। দীর্ঘকালের জ্ঞানসাধনা ও কর্মস্পৃহায় তিনি নানাভাবে আমাদের জীবন ক্রমাগত সমৃদ্ধ করে চলেছেন।

বাংলার এই দুই মনীষীব সহযোগিতা ও স্নেহধন্য হয়ে এমনি এক গ্রন্থ প্রকাশ করতে পেযে আমবা আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ বোধ করছি। 'চল্লিশের দশকের ঢাকা' সুধী পাঠকের আনুকূল্য পেলে আমাদের প্রযাস সার্থক বিবেচিত হবে।

ঢাকা
জানুযারি ১৯৯৪

মফিদুল হক

ভূমিকা

১৯৮৩ থেকে ১৯৯৩ : দশ বছর অতিক্রান্ত। যাঁদেরকে সামনে রেখে এই স্মৃতিকথামূলক রচনা কয়টি দাঁড় করিয়েছিলাম তাঁদের বয়সও দশবছর বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০ বছরের তরুণ প্রজন্ম ৩০ বছরের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে।

তাঁদের কেউ কেউ তাগিদ দিয়েছেন : চল্লিশের দশকের ঢাকার কথা লিখুন। আপনি না লিখলে আর কে লিখবে। আমাদের গণতন্ত্র ও প্রগতি সাহিত্যের আন্দোলনে আপনার দেখা চল্লিশের দশকের ঢাকার একটা ভূমিকা আছে। তার কথা আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

এমন বন্ধুজনদের তাগিদেই স্মৃতির পাতা ওল্টাবার চেষ্টা। চল্লিশের দশকের ঢাকা কারুব একার স্মৃতিচারণের বা গবেষণার ব্যাপার নয়। আমার এই সঙ্কলনের রচনা কয়টি না ধারাবাহিক কোন স্মৃতিচারণ, না তথ্যমূলক কোন প্রবন্ধ রচনা। তাছাড়া স্মৃতিতে আমি ভয়ানক দুঃখজনকভাবে দুর্বল। কোন ঘটনা এবং তার কুশীলবদের ছবি স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারিনে। তবু সেই আধো স্মৃতি, আধো বিস্মৃতির আলো-আঁধারিতে ফিরে যেতে মন চায়। ভাল লাগে। ঘটনা এবং ইতিহাসের খুঁটিনাটি নয়। তবু চল্লিশের দশকের এবং তার পূর্বাপরের ইতিহাসের বন্যার মতো দুর্দম স্রোত ক্ষুদ্র এ জীবনের জমিতেও পলি তো কিছু রেখে গেছে। সেই পলিকেই ওল্টানো-পাল্টানো। তাতেই এই প্রৌঢ়ত্বেও নতুনের দিকে তাকিয়ে বীজ বপনের চেষ্টা। এই আশায়, আমার চিরজীবী থাকার ব্যাপার নয়, এ বীজে যদি একটি ফলবান বৃক্ষের জন্ম ঘটে তবে তার ফল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কিছু খোরাক নিশ্চয়ই জোটাবে।

সরদার ফজলুল করিম

ডিসেম্বর, ১৯৯৩

সূচি

যে আমি ঢাকার সন্তান

শৈশবের ঢাকা

ঢাকা শহরে আমার জন্ম ; সেখানেই কেটেছিল শৈশব, কৈশোব আর যৌবনের প্রথম দিক। শৈশবে যে-পাড়ায় ছিলাম সেটি কোনো বনেদী পাড়া ছিলো না; গলির নাম বাসাবাড়ি লেন, ঢাকার তাঁতিবাজার এলাকার সংলগ্ন। ১৯২০ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত আমরা এই গলিতে ছিলাম, ১৯৩০-এ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পরেই আমরা বাড়ি বদল করে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ তাঁতিবাজাব এলাকায় চলে আসি।

ছেলেবেলায় দুবন্ত ছিলাম। বড়ো হয়ে আমাব দুরন্তপনার তেমন কোনো কথাই মনে পড়ে না। তবে মনে পড়ে ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে একবার একতলা বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স দশ-বারো বছরের বেশি নয়। আমাব পিতৃদেব বিজয়শঙ্কর সেনগুপ্ত ছিলেন ঢাকা শহরের তখনকার দিনে একজন নামকরা অধ্যাপক। ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ভূগোল বিভাগের তিনি ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। সে সময় যেসব ছাত্র ভূগোল নিয়ে পড়তেন তাঁরা ছাড়াও যাঁরা অন্য বিষয় নিয়ে পড়তেন, সকলেই একজন কৃতী অধ্যাপকের দৃষ্টান্ত দিতে হলে আমার পিতৃদেবের নামেব উল্লেখ করতেন। ঢাকা কলেজের অবস্থান ছিল রমনায়, আমাদের ভাড়াটে বাড়িটা ছিল পুরনো ঢাকা অঞ্চলে। বাড়ি থেকে কলেজেব দূবত্ব চার কিলোমিটারের কাছাকাছি। অল্প বয়স থেকেই দেখতাম বাবা প্যান্ট-কোট পরে সাইকেলেই কলেজে যাতায়াত করতেন। কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তিনি সন্ধ্যার দিকে যেতেন আরমানিটোলায় 'রায় হাউস'-এ অর্থাৎ সেকালের একজন বিখ্যাত আইনজীবী ও স্বদেশী আন্দোলনের কর্মী আনন্দচন্দ্র রায়েব বাড়িতে। আনন্দ রায়ের বাড়িটি ছিলো বিশাল এবং তিনি নিজেও ছিলেন বিত্তবান। আমরা বড়ো হয়ে উঠবার আগেই অবশ্য তিনি লোকান্তরিত হয়েছিলেন। বাবা যেতেন যখন, তখন আনন্দ রায়ের পুত্র ধীরেন্দ্রচন্দ্র রায় ছিলেন গৃহকর্তা, প্রতিদিন তাঁর উৎসাহে তাঁর বাড়িতে বেশ কয়েকজন গণ্যমান্য ভদ্রলোক পাশা খেলতেন, বাবা ছিলেন তাঁদের অন্যতম। পাশাখেলার ফাঁকে-ফাঁকে শহরের নানা ধরনের খববাখবর নিয়েও আলোচনা হতো এবং রাত ন'টায় সভাভঙ্গ হতো। বাবা রাত সাড়ে ন'টার মধ্যে ফিরতেন এবং খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। আমি সারাদিন যে দুরন্তপনা করতাম তার ধকল মা-কেই সইতে হতো।

বাবাকে না জানালে তাঁর পক্ষে সব জানা সম্ভব ছিলো না।

আমাব শৈশবে ঢাকা শহরে আমরা যে-পাড়ায় থাকতাম সে পাড়ার অধিকাংশই ছিল একতলা বাড়ি এবং ঘেঁষাঘেঁষি করে তৈরি। অনেক সময় পাশাপাশি নির্মিত দু'তিনটি বাড়ির মালিক ছিলেন একই ব্যক্তি। ঘুড়ি উড়াতে গিয়ে আমি এবং আমাব সঙ্গীরা অনায়াসে এক বাড়িব ছাদ থেকে অন্য বাড়ির ছাদে লাফিয়ে যেতাম এবং দুপুরে ছাদের ওপর দুরন্ত ছেলেদেব দাপাদাপিতে বাড়ির লোকদের দিবানিদ্রাব বিস্তর ব্যাঘাত ঘটতো। এ নিয়ে আমার বাড়ির অভিভাবকের কাছে নালিশ আসতো, যেমন নালিশ যেতো অন্য বাড়িতেও। আমার মা তাঁর সুন্দব স্বভাব ও আচরণের জন্যে পাড়ার মহিলামহলে বেশ জনপ্রিয় ও পরিচিতা ছিলেন। আমাব বাবা-মাব সংসার খুব ছোট ছিল না, আমবা চার ভাই ও ছয় বোন, ভাইবোনদের মধ্যে আমার দিদির (যিনি সকলেব বড়ো) বিয়ে আমাদেব শৈশবেই হযেছিলো। অন্য সবাই লেখাপড়ায় ভালো ছিলাম বলে—অর্থাৎ ভালোভাবে পাশ করে যেতাম বলে—পাড়ায় পবিবারের সুনাম আমার শৈশব-কৈশোরেব চরম দুবন্তপনা সত্ত্বেও কখনো তেমন বিঘ্নিত হয় নি।

বযস যখন একটু বাড়লো তখন ঘুড়ি ওড়াবার নেশা যেন একটু কমে এলো; কিন্তু অপব দিকে বাড়লো সিনেমাব আকর্ষণ। যতোদূর মনে পড়ে ১৯২৭-এ আমি আবমানিটোলা গভর্নমেন্ট স্কুলে ক্লাস থ্রি-তে ভর্তি হযেছিলাম, এব আগে আরো কম বযসে কিছুকাল পড়েছিলাম ব্যাপটিস্ট মিশন স্কুলে। এই স্কুলটা বেশ কযেক একর জায়গা নিযে সদরঘাট এলাকায ঢাকাব হেড পোস্টাপিসের কাছেই ছিলো। প্রতিদিন দেখা যেতো বিশালকায় অশ্বচালিত গাড়িতে শহরের ডাক নিযে ডাক বিভাগের কর্মীবা আসা-যাওয়া কবতো। পোস্টাপিসেব কাছেই ছিলো তখনকার দিনের স্বনামধন্য বিভু গুহঠাকুরতার বাড়ি। এই বাড়িরই ছেলে ডঃ প্রভু গুহঠাকুরতা, যাঁর সঙ্গে আমার আলাপের সুযোগ হযেছিলো বহুকাল পরে কলকাতায তাঁব এলগিন রোডের বাড়িতে, তখন তিনি ছিলেন ইণ্ডিয়ান টি এক্সপানসন বোর্ডেব প্রচার বিভাগেব কর্মকর্তা। এই বাড়িবই মেয়ে অরুন্ধতী গুহঠাকুরতা উত্তরকালে অভিনেত্রী ও পরিচালিকারূপে খ্যাতি অর্জন করেন। ব্যাপটিস্ট মিশন স্কুলেব কাছেই ছিল ব্যাপটিস্ট মিশন হোস্টেল যেখানে বহিরাগত কলেজেব ছাত্ররা থাকতো। এই আবাসিক ছাত্রাবাসটি পবিচালনা কবতেন শ্বেতাঙ্গ মিশনারীরা এবং নিয়মিতভাবেই ঢাকার নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোর আয়োজন থাকতো। পুরনো ঢাকাব এই দিকটাই আমার কাছে খুব আকর্ষণীয ছিলো। সদরঘাট বাংলাবাজার দিগবাজার এবং বাকল্যাণ্ড বাঁধ নিয়ে এই এলাকা। এদিকে ওদিকে উল্লেখযোগ্য স্থানগুলোতে হেঁটেই যাওয়া যেতো। সেন্ট গ্রেগবী স্কুল, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, ইডেন কলেজ ও স্কুল, পগোজ স্কুল, ঢাকা জগন্নাথ কলেজ পূর্ববঙ্গের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা বিস্তারে যথেষ্ট অবদান জুগিযেছিল। সদরঘাট ও বাংলাবাজার এলাকায ছিল বইপত্র ও কাগজের অনেক দোকান। বিপ্লবী নলিনীকিশোব গুহ সম্পাদিত সাপ্তাহিক সোনার বাংলা পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো বাংলাবাজার অঞ্চল থেকেই এবং এই অঞ্চলেই প্রতিষ্ঠিত ছিলো স্বদেশসেবী অনিলচন্দ্র ঘোষের প্রকাশনা সংস্থা প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি। তাছাড়া সংলগ্ন ফরাশগঞ্জ এলাকা থেকে বেরুতো মাসিক শান্তি

পত্রিকা যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রূপলাল হাউসের যোগেশচন্দ্র দাশ। প্রথম যৌবনে যখন লেখালেখি শুরু করি তখন সেইসূত্রে এই তিনটি সংস্থার সঙ্গেই আমার যোগাযোগ বেশ কিছুটা ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ হয়েছিলো।

ব্যাপটিস্ট মিশন স্কুলে পড়েছিলাম কেজি থেকে ক্লাস ওয়ান পর্যন্ত ; সেই সময় আমাকে ধরেছিলো কালাজ্বরে—যা পূর্ববঙ্গে তখন বেশ ব্যাপকতা লাভ করেছিলো। মনে পড়ে পিতৃদেব আমাকে নিযমিত নিযে যেতেন ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে রক্ত পরীক্ষা ও ইন্‌জেকশন দেবার জন্যে। ঢাকায় অধ্যাপক হিসেবে বাবাব সুনাম ছিল, তাঁর ছাত্রদের কেউ কেউ পরে ডাক্তারও হযেছিলেন। সুতরাং বেশ যত্নের সঙ্গে আমার চিকিৎসা চলতো। আমাদেব বাড়ি থেকে ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালেব দূবত্ব ছিলো প্রায় দেড় কিলোমিটার। বাবার সঙ্গে হেঁটেই যেতাম সেখানে, মাঝপথে বাবা আমাকে কমলা কিনে দিতেন, কখনো অন্য কিছু, আমি খেতে খেতে সমস্তটা পথ আনন্দে অতিক্রম করতাম। যখন স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি তখন বাসা বদলেব পর তাঁতিবাজার অঞ্চলে চলে এসে নতুন পাড়াব অনেক নতুন সমবযসী কিশোরেব সঙ্গে মিলিত হযেছি। তখনও স্বাস্থ্য তেমন ভালো ছিলো না। জ্বরটর মাঝে–মাঝেই লেগে থাকতো। একদিন খুব সকালের দিকে বাড়ির সদর দরজায় দাঁড়িযে আছি, পাড়াব একজন বন্ধুস্থানীয় তরুণ আমাকে ডেকে নিযে গেলেন কাছাকাছি একটি বাড়িতে। যেতে রাজি হই নি সহজে, তরুণটি এক বকম জোর করেই আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখি ঐ বাড়ির একটি ঘবে ব্যায়ামচর্চাব সমস্ত জিনিসপত্র রযেছে; কয়েকটি তরুণ নিঃশব্দে ব্যায়ামচর্চায নিরত। ঐদিন আমাকেও ভর্তি করে নেওযা হলো এবং পরবর্তী প্রায চাব বছব ওই একই বাড়িতে আমার ব্যাযামচর্চা অব্যাহত ছিলো। আমাব অসুস্থতা, জ্বব, সর্দিকাশি যে কোথায পালালো জানি না, শরীর ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠলো সম্পূর্ণ সুস্থ। একদিন জানতে পারলাম স্বাস্থ্য বক্ষাকারী এইসব তরুণ সকলেই কোনো একটি বাজনৈতিক দলেব সদস্য; আমাকেও এবা নানা বইপত্র পড়িয়ে সদস্য হবার যোগ্যতার অধিকাব দিয়েছিলো।

'মুশকিল আসান'

ব্যাপটিস্ট মিশন স্কুলে প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েই আমি স্বাস্থ্যের কারণেই সম্ভবত বাড়িতে ফিরে এসে প্রায় বছর খানেক ঘুড়ি উড়িয়ে এবং পাড়ার ছোট গলিতে হকিস্টিক খেলে কাটিয়ে দিচ্ছিলাম। আমার দুই দিদি লেখাপড়ায় ভালো ছিলেন এবং প্রতি বছরই স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসবে সুন্দর–সুন্দর বই প্রাইজ পেয়ে ঘরে ফিরতেন। গ্রেট বৃটেনে ছাপা সদ্যপ্রেরিত বই, ঝক্‌ঝকে ও তক্‌তকে। কিন্তু লেখাপড়ায় আমি নিজে ছিলাম মাঝারি ধরনের, স্কুলে ফার্স্ট সেকেন্ড হয়ে প্রাইজ নিয়ে ঘরে ফিরব একথা কখনো মনে হয় নি। পাঠ্যপুস্তকের দিকে মনোযোগও ছিল কম, পরীক্ষা যখন খুব কাছে এসে পড়তো তখনও বাইরের নানা কিশোরপাঠ্য গল্প–উপন্যাসই লুকিয়ে–চুরিয়ে গোগ্রাসে গিলতাম।

অষ্টম শ্রেণীতে যখন পড়ি তখন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে পুরোপুরি যুক্ত এবং সন্ত্রাসবাদী যুগের প্রচলিত ছোটদের উপযোগী বইগুলো তখন নিয়মিত পড়ছি, অন্য বইও, ডিটেকটিভ উপন্যাস পর্যন্ত। ছেলেবেলায় অজস্র বই পড়েছি, তাব সম্পূর্ণ উল্লেখ এখন প্রায় অসম্ভব। তবু কয়েকটি বাংলা বইযের নাম করা যেতে পারে : বনে-জঙ্গলে (যোগীন্দ্রনাথ সরকার), আবোল-তাবোল (সুকুমার রায়), কুটকুটের দপ্তর (যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়), শয়তানের সুমতি (যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়). আশ্চর্য দ্বীপ (অনুবাদ : কুলদারঞ্জন রায এবং তাঁরই অনূদিত বাস্কারভিল কুক্কুর), বেপবোয়া (অখিল নিয়োগী), রাজকাহিনী (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর), আজব দেশ (সীতা দেবী ও শান্তা দেবী), গল্পগুচ্ছ (রবীন্দ্রনাথ). লালকুঠি (সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায) ইত্যাদি। বিবেকানন্দের পত্রাবলী, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট-এব জীবনী, নিগ্রোজাতিব কর্মবীর বুকার ওয়াশিংটন, সতীশ দাশগুপ্ত অনূদিত গান্ধীজীর আত্মজীবনী পড়েছিলাম যখন স্কুলেব অষ্টম বা নবম শ্রেণীতে পড়ি এবং শেষের দিককাব বইগুলো পড়েছিলাম গোপন স্বদেশচর্চাকে লালন করবার জন্যেই। মনে পড়ছে যখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি তখন শরৎচন্দ্রেব পথেব দাবী হাতে নিয়েছিলাম পড়বাব জন্যে। কিন্তু আমাদের এক দাদা (বাজনৈতিক সূত্রে যিনি আমাদেব পাড়ায় নেতৃত্ব দিতেন) বইটি তখন আমাকে পড়তে নিষেধ কবেছিলেন। বছব দুই পবে ঐ বইটি দাদাব অনুমতি নিয়ে পড়ে ফেলেছিলাম। এই বকমই আবো একটি ঘটনা ঘটেছিল যখন আমি দশম শ্রেণীতে পড়ি। স্কুলেব লাইব্রেবি থেকে এনেছিলাম অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তব গল্পগ্রন্থ টুটাফুটা। আমাদের ক্লাসে যে শিক্ষক মহাশয় সংস্কৃত পড়াতেন তিনি আমার হাতে বইটি দেখে তৎক্ষণাৎ লাইব্রেরিতে ফেরত দিযে আসতে বললেন। বললেন বইটি নাকি অশ্লীল এবং অচিন্ত্যকুমার বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ কয়েকজন তরুণ লেখক নাকি তখন যা-তা লিখে দেশের মহা অকল্যাণ সাধন করছেন। সুতরাং বইটি না পড়েই ফেরত দিতে হযেছিলো।

বই নিযে স্কুল জীবনে আমি নিজে খুব বাছবিচাব কবি নি, হাতের সামনে যা পেযেছি পড়ে ফেলেছি। পঞ্চম ষষ্ঠ শ্রেণীতে যখন পড়ি তখন দিদিদের প্রাইজের বইগুলো পড়েছিলাম। ঐ সময় সন্ধ্যাব নিভৃত অবসরে অবনীন্দ্রনাথের রাজকাহিনীর গল্পগুলো এক একদিন পড়ে শোনাতেন আমার এক দিদি। আমবা ছোটরা তাঁকে ঘিরে বসে শুনতাম ঐ গল্প। শিলাদিত্য বাপ্পাদিত্য গোহকে জড়িয়ে যেসব ঘটনা সেগুলো যেন আমাদের চোখেব সামনে জীবন্ত হযে উঠতো। তখনকাব দিনে ১৯২৮-২৯ সনে ঢাকাব অনেক জায়গায়ই ইলেকট্রিসিটি আসে নি, লণ্ঠনেব আলোয় আমাদের পড়াশোনা এবং বাড়ির যাবতীয কাজকর্ম চলতো। সন্ধ্যার পর বাস্তায় গ্যাসপোস্ট জ্বলতো, রাত একটু বাড়লেই সমস্ত পাড়া নিঝুম হয়ে যেতো। প্রায়ান্ধকার পরিবেশে রাজকাহিনীর গল্পগুলো শুনতে শুনতে রোমাঞ্চিত হযে উঠতাম। আর অনেক সন্ধ্যায প্রায় এই সময়েই গলিপথে হাঁক শোনা যেতো 'মুশকিল আসান'। একটি কাচের বাক্সে মোমবাতি বা প্রদীপ জ্বালিয়ে বাক্সটি মাথায় চাপিয়ে অন্ধকারে ধীর পায়ে এগিয়ে আসতো ফকিরবেশি বিশালকায় একটি লোক, এক আধ পয়সা বাক্সটির ভিতরে ফেলে না দেয়া পর্যন্ত লোকটি নড়তে চাইতো না। পয়সা পেলে ধীরে-ধীরে ছায়ামূর্তির মতো সে গলির মোড়ে মিলিযে যেতো। মুশকিল আসানের এই মূর্তিও

আমাদের কাছে কম ভীতিপ্রদ ছিল না; অনেকদিন হাঁক শুনলেই রাস্তার দিকের দরজা-জানালা বন্ধ করে অন্ধকার ঘরে চুপ করে বসে থাকতাম। কারুর তেমন সাড়া না পেয়ে সেই মূর্তি হতাশ হয়ে নিঃশব্দে প্রস্থান করতো।

বাইরের জীবন

ঢাকায় হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক বিশের দশকের শুরুতেও ভালোই ছিলো। ১৯২৬-এ কলকাতা ও ববিশালে দাঙ্গা হওয়ার পর ঢাকায় কিছুটা অস্বস্তি অনুভূত হতে থাকে। ১৯৩০-এ যখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি তখন কী একটা সূত্রে শহবে দাঙ্গা বেঁধে ওঠে। সেবাবই মুরাপাড়ার জমিদাব মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায় গুণ্ডাব ছুরিকাঘাতে নিহত হন। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ঢাকায় সুত্রাপুব ও নবাবপুর এলাকা থেকে দু'টি মিছিল বেরুতো, বাইবে নানা গ্রামাঞ্চল থেকে এই মিছিল দেখতে হাজাব হাজাব লোক সমাগম হতো। এই উৎসবের দু'দিন স্থানীয় মুসলিমদেরও যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যেতো: ঘোড়ার গাড়ি গরুর গাড়ি সাজিয়ে বড়ো বড়ো চৌকি চালিয়ে নিয়ে যেতো যারা তাদেব অধিকাংশই ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের। গরিব শ্রমজীবী বছরের এই সময়টাতে রোজগারও করতো বেশ মন্দ নয়। কিন্তু ১৯৩০-এর জন্মাষ্টমী মিছিলের সময় গরুব গাড়ি ও ঘোড়ার গাড়ির চালকরা তাদের কতিপয় নেতাব নির্দেশে মিছিলের দিন অসহযোগিতা করায় স্থানীয় হিন্দু-যুবকরা মিছিলের সব গাড়ি নিজেরাই টেনে নিয়ে গেলেন। প্রথম দিন গোলমাল হয় নি কিন্তু দ্বিতীয় দিন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বেঁধে গেল বিকেলের দিকে মিছিল আক্রান্ত হবার পর। ১৯৩০-এর পর ১৯৪০ পর্যন্ত ঢাকায় অবশ্য হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ন ছিলো। এই সময়টা আমার নিজের কৈশোব থেকে যৌবনে পৌছাবার কাল। এই সময়ের স্মৃতি সুখবহ, সুস্থির ও তরঙ্গিত; এই দশটা বছর যেন আমার জীবনে সোনার ঝাঁপির মুখ খুলে দিযেছিলো।

সংস্কৃতিচর্চা, খেলাধুলো, সঙ্গীতচিন্তা, নাটক ও সিনেমা—এমন কোনো দিক নেই যা ঢাকা শহরেব জীবনচর্চার উৎস নয়। যে যে-রকম সঙ্গ পেতে ইচ্ছুক সে সে-রকম সঙ্গই পেয়ে যেতো। সংখ্যায় হয়তো বেশি নয়, কিন্তু খুঁজলেই সঙ্গীতচর্চার আসব, নাট্য অনুষ্ঠানের চক্র এবং সর্বোপরি খেলাধুলোর ক্লাবগুলো, যার মধ্যে ওয়ারী ও ভিক্টোরিয়া ক্লাব অন্যতম। সর্বত্রই একটি জমজমাট ভাব, আনন্দধারা, উৎসবের প্রকাশ। দলাদলি, মতবাদের সংঘর্ষ তখন পর্যন্ত ব্যাপকতা লাভ করে নি; সবাই তখন পর্যন্ত যেন একটি সম্মিলিত আযোজন-উদ্যোগের শরিক; সব মিলিয়েই যেন একটি সমগ্রতা যা স্বচ্ছ নদীর জলধারার মতো সমাজজীবনে প্রবাহিত। স্বদেশপ্রেমিক বাঙালি এই সময়েই প্রবল আত্মপ্রত্যয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে : সম্ভব হয়েছে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মতো অকল্পনীয় ঘটনা; মাস্টারদার মন্ত্র তখনই আমার মতো অনেক কিশোরের কানে এসে পৌছেছে। বিপ্লবী নায়ক অনিল দাস প্রাণ দিলেন ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে। বিপ্লবীর গুলিতে

নিহত হলেন মিটফোর্ড হাসপাতালে লোমান সাহেব। ঢাকা শহরেই সব কিছু স্থির করে সম্ভব হয়েছিলো দিনেশ গুপ্ত, বিনয় বসুদের মৃত্যুপণজয়ী ঐতিহাসিক রাইটার্স বিল্ডিংস অভিযান। ঢাকা থেকেই প্রথম প্রকাশিত হলো দেশনেত্রী লীলা নাগ (পরে লীলা রায়) সম্পাদিত জয়শ্রী পত্রিকা, নারীমুক্তির আন্দোলন ও স্বাধীনতা আন্দোলনকে সম্মুখে রেখে। অন্যদিক থেকে গান্ধীজীর নায়কতায় লবণ আইন আন্দোলনেব ঢেউ এসেও লেগেছে সর্বস্তরেব মানুষের মনে। সব মিলিযে এই সময়টা মানুষের স্বদেশপ্রেম ও সামাজিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নানা দিক থেকে তরঙ্গিত কবে তুলেছিলো।

কৈশোরে বাসাবাড়ি লেনে থাকতেই দশ বছব বযসে প্রথম 'স্বদেশী' শব্দটির অর্থ জানতে পেবেছিলাম। আমাদের পাড়ায়ই ছিলেন অন্তত তিনজন যাঁবা দারুণ স্বদেশী করতেন বলে পাড়ার সবাই জানতেন। কেননা পুলিশের গোয়েন্দারা এসে প্রায়ই তাঁদেব খোঁজখবব কবতো। এঁদের মধ্যে অনিলদা, অর্থাৎ অনিলচন্দ্র রায় ছিলেন আমাদেব সবচেযে ঘনিষ্ঠ এবং নিকট আত্মীয়। অনিলদার বাবা ছিলেন আমার বাবাব বন্ধু, দুই পরিবারের মধ্যে অব্যাহত ছিলো ঘনিষ্ঠতা। তখন দুষ্টুমি ও দৌরাত্ম্য কবতাম বলে বকুনিও কম খাই নি রাণীদির কাছে। বাণীদি নিনিদিরা ছিলেন সম্পর্কে অনিলদার বোন, পরে রাণীদি (উষারাণী রায়) জয়শ্রী পত্রিকাব সম্পাদিকা হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে লীলাদি (দেশনেত্রী লীলা রায়) প্রতিষ্ঠিত ঢাকার নারী শিক্ষা মন্দিবে প্রধান শিক্ষিকা হয়েছিলেন। লীলাদির পরিচালনাধীন সব রকমের জনকল্যাণমূলক কাজে তিনি এগিযে এসেছিলেন। অনিলদা ছাড়া আব যে দু'জন বাজনৈতিক কর্মী ছিলেন তাঁরা রণাদা (রণা রায) এবং অমূল্য সেন। বণ-পা'ব সাহায্যে পথে বেড়াতে দেখতাম রণা-দাকে। খুব আপনজন ছিলেন বলেই অনিলদাকে কখনো ভয় পেতাম না, কিন্তু রণাদা সম্পর্কে বেশ ভীতি ছিলো আমার। একবার এক পুলিশের টিকটিকি তাঁর খোঁজখবর নিতে তাঁর বাড়িতে আসতেই তিনি যেভাবে সেই লোকটাকে ধমকে দিযেছিলেন তা এখনও মনে পড়ে। অমূল্য সেনের ছোট ভাই অমিয আমাদের সঙ্গে খেলাধুলো করতো, সে সময় অমূল্যদা সম্ভবত পুলিশের নজরবন্দী হয়ে স্বগৃহে অন্তবীণ ছিলেন। একটু বড়ো হয়ে অনেককাল আর অনিলদাব খবর রাখি নি, ওই সময় তিনি হয অন্যত্র দেশেব কাজ করছিলেন কিংবা কারান্তরালে ছিলেন। অল্প বয়সে লীলাদির নাম শুনেছি সবার মুখে অথচ নিজে ওই সময় কখনো তাঁকে দেখি নি, যখন অনেক পরে দেখলাম তখন তিনি অনিলদাব সহধর্মিণী। ১৯৪০-এ সুভাষচন্দ্র জেলে, লীলাদি বোধহয় সম্পাদনা করছেন ফরোয়ার্ড ব্লক পত্রিকাটি। আর তাঁর দলের অন্যতম কর্মী রেণু সেনগুপ্তা দেখছেন জয়শ্রী পত্রিকা। আমার প্রবন্ধ ও কবিতা এই সময়ই জয়শ্রীতে প্রথম প্রকাশিত হলো। যুদ্ধের সময় মাঝে-মাঝে লীলাদি আর অনিলদা ঢাকায় আসতেন একসঙ্গে। তখন নারায়ণগঞ্জ আমার কর্মস্থল। খবর পেলেই তাঁদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করতাম। অল্প বয়সের সেই দুষ্ট ছেলেটি লেখক হয়েছে জেনে অনিলদা খুশি হযেছিলেন। আমার মনের খবরও রাখতেন। একবার দেখা হতেই হেসে বলেছিলেন, 'Synthesis of opposites'. লেখার ব্যাপারে প্রচুর উৎসাহ পেয়েছি লীলাদির কাছ থেকে, জয়শ্রীতে লিখেছি বছরের পর বছর।

আমার ছাত্রজীবনের শেষের দিকে সুভাষচন্দ্রকে দেখলাম ঢাকায়। তখন তিনি কংগ্রেস ছেড়ে দিয়ে ফরোয়ার্ড ব্লক সংগঠিত করছেন। নবাবপুর রোডের একটি দ্বিতল বাড়িতে কর্মিসভায় তাঁকে খুব কাছে থেকে দেখলাম। পরে করনেশান পার্কে শুনেছিলাম তাঁর বক্তৃতা। সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে তখন রণদামামার ধ্বনি, দুর্যোগের ঘনঘটা আর স্বদেশে ত্রিপুবী কংগ্রেসের পর প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আবহ। অল্প বয়সে আমাদের পাড়ায় ছানাদার কাছেও আমরা যাতায়াত করতাম। ছানাদা, অর্থাৎ বারীণ বায়, তখন জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়িতে এসে বসেছেন। বিপ্লববাদের কাহিনী তাঁব কাছে বসে শুনতাম। কলেজে ঢুকে ছানাদাব কথা আর মনে ছিল না। মহা মন্বন্তর দাঙ্গা ও দেশ বিভাগের ফলে কে যে কোথায় ছিটকে পড়লেন খোঁজ রাখা সম্ভব ছিলো না। বহু পরবর্তীকালে জানলাম ছানাদা মহাজাতি সদনেব অছি পবিষদের পক্ষে সদন দেখাশোনার ভাব নিয়ে আছেন। এখন তিনি প্রযাত।

আনন্দনগর

আমাব ছেলেবেলায ঢাকা শহবে তিনটি সিনেমা হল ছিলো; আরমানিটোলায় পিকচার হাউস, সদরঘাটে সিনেমা প্যালেস এবং জনসন রোডে তদানীন্তন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছাবিব অনতিদূবে মুকুল সিনেমা। তিনটির মধ্যে পিকচাব হাউসই ছিলো সর্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রেক্ষাগৃহ। এই হলে মহিলাদেব বসবার আলাদা ব্যবস্থা ছিলো হলের এক কোণে পর্দাপবিবেষ্টিত জায়গায, কেননা হলটি ছিল একতলা। আমার জীবনের প্রথম বায়োস্কোপ আমি দেখেছিলাম এই হলেই আমার মা এবং বড়ো পিসিমার সঙ্গে। তখন ছিল সিনেমার নির্বাক যুগ। মনে পড়ে দেখেছিলাম 'পাপের পরিণাম', 'কৃষ্ণ সুদামা', 'দেবদাস' প্রভৃতি নির্বাক বাংলা ছবি। 'মাতৃস্নেহ' নামের একটি ছবিও ঐ সময়ে দেখেছিলাম বলে মনে পড়ছে। সিনেমা হলের সামনেব দিকে একধারে পিয়ানো ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজাবার জন্যে যন্ত্রীরা উপস্থিত থাকতেন এবং গল্পেব সিচুয়েশন অনুযায়ী যন্ত্রসঙ্গীত বেজে চলতো যাতে দর্শক হৃদয উদ্বেলিত হয। করুণ দৃশ্যে বেহালা ও পিয়ানোব সহযোগে করুণ সুর, যুদ্ধ বা লড়াইযের সময় রণদামামার শব্দসৃষ্টি এবং আনন্দ কোলাহলের দৃশ্যকে দর্শক-মনে পৌঁছে দেবার জন্যে দ্রুতলয়ে যন্ত্রসঙ্গীত চালনা এসবই আমাদের মতো বহু কিশোরের মনে গভীর রেখাপাত করতো। ইংরেজি এবং বাংলা দু'ধরনের সুরই যন্ত্রীদেব নখদর্পণে ছিলো। তবে কোনো দৃশ্যের সিচুয়েশন অনুযায়ী তেমন উপযুক্ত গৎ বাদ্যযন্ত্র সহযোগে বাজাতে না পারলে সিনেমা হলের ভিতরের দর্শকরা মাঝে-মাঝে চিৎকার করে আপত্তি জানাতো। তখনকার দিনের সিনেমার এই গৎগুলো সিনেমা দর্শকদের অনেকেরই প্রিয় ছিলো এবং অনেক বাড়িতেও উৎসাহীরা অর্গান বা বেহালায় এই গৎগুলো বাজাতেন।

আরমানিটোলা হাই স্কুল থেকে পিকচার হাউসের দূরত্ব খুব বেশি ছিল না। স্কুলের টিফিনের সময় আমরা কয়েকটি কিশোর কোনো কোনো দিন দেযালে কাঠের ফ্রেমে

সজ্জিত সিনেমার ছবিগুলো দেখতাম এবং টিফিনের সময় উত্তীর্ণ হবার আগেই তাড়াতাড়ি ফিরে যেতাম সিনেমা হল এলাকার একটি জামরুল গাছ থেকে জামরুল সংগ্রহ করে। ঐ কিশোর বয়সে সিনেমা দেখবার সুযোগ ছিলো না কিন্তু চিত্রলোকের নায়ক-নায়িকা ও ছবিগুলোর নাম আমাদের প্রায় মুখস্থ হয়ে থাকতো। নির্বাক ছবির যুগে একটি সিনেমা হলে সপ্তাহে দু'টি ছবি দেখানো হতো, প্রতি শনিবাব ও বুধবার নতুন ছবি এবং কলকাতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঢাকা শহরেও নতুন নতুন ছবি প্রদর্শিত হতো। সিনেমাব দর্শকের সংখ্যা তখন বেশি ছিলো না, সন্ত্রাসবাদ ও স্বদেশী আবহাওয়ায় ঢাকার সামাজিক জীবন লালিত ছিলো বলে কিশোর ও যুবকদের সিনেমা দেখা বারণ ছিলো। তবু দলেব দাদাদেব চোখ এড়িয়ে সিনেমায যে একেবাবেই যেতাম না তা নয। খুব অল্প বয়সে তো মা ও পিসিমাদেব সঙ্গে মহিলাদের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গায বসে বায়োস্কোপ দেখতাম, পবে যখন 'টকি'ব যুগ এলো তখন অনেকটা বড়ো হযেছি, পাড়ার সঙ্গীদেব দু'একজনকে নিযে ছবি দেখতে যেতাম। মনে পড়ে চণ্ডীদাস ছবি দেখে পাড়ায ফেরবাব পথে আমাদেব বাজনৈতিক দলের এক দাদাব সামনে পড়ে গেলাম। কোথায় গিযেছিলাম জানতে চাইলে জানিযে দিলাম গিযেছিলাম সদরঘাটে বেড়াতে। তিনি আমাদেব জামাকাপড় শুঁকলেন এবং জানালেন জামায যখন এতো সিগাবেটের গন্ধ তখন নির্ঘাৎ আমরা এতোক্ষণ সিনেমা হলেই বসেছিলাম।

নির্বাক যুগেব ছবির স্মৃতি এখনো মন থেকে একেবাবে লুপ্ত হয় নি। বাংলা ছবিব কোনোটাই উল্লেখযোগ্য ছিলো না। কিন্তু সাগবপাবেব বিদেশি ছবির নাম, চিত্রতারকাদের নাম আমাদের নখদর্পণে ছিলো। স্কুল জীবনেই দেখেছিলাম চার্লি চ্যাপলিনেব 'সার্কাস' ও 'গোল্ড রাশ' এবং রুডলফ ভ্যালেন্টিনো অভিনীত 'ঈগল'। জন ব্যারিমোর অভিনীত 'বিলাভেড বোগ' দেখেছিলাম ঐ সমযেই। লন চ্যানিব 'হাঞ্চব্যাক অব নটারডেম' এবং 'লণ্ডন আফটাব মিডনাইট'। ডগলাস ফেয়াববয়াঙ্কস্ ছিলেন তখনকার দিনের ছবির হিরো, আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় অভিনেতা। রোমাঞ্চকব এবং খুব দুঃসাহসিক কার্যকলাপে পূর্ণ ছিল তাঁব অভিনীত প্রতিটি ছবি : 'ববিন হুড', 'ব্ল্যাক পাইরেট', 'দি থ্রি মাস্কেটিয়ার্স', 'গচো', 'থিফ অব বাগদাদ'। চলচ্চিত্রের আদি যুগে রুডলফ ভ্যালেন্টিনোর জনপ্রিয়তা ছিল অসীম। শুনেছি হলিউডে ভ্যালেন্টিনোর অকাল মৃত্যুতে কেঁদেছিলেন সে-দেশের বহু সুন্দরীবা কেননা একজন সুপুরুষ অভিনেতা হিসেবে তিনি তাদেব চিত্ত জয় কবেছিলেন। এই অভিনেতাব দু'টি ছবি 'শেখ' এবং 'সন্ অব দি শেখ' দেখেছিলাম অনেক পরে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয থেকে এম.এ পাশ কবে বেরিয়ে এসেছি। মনে পড়ে কিশোর অভিনেতা জ্যাকি কুগানের কথা। চার্লি চ্যাপলিনেব 'দি কিড' ছবিতে অভিনয করে সে দর্শকচিত্ত জয় করে সুপরিচিত হযেছিলো। কিশোব বয়সে তার অপব একটি ছবি 'বাটনস্' দেখেও মুগ্ধ হয়েছিলাম। আবো যে ক'টি নির্বাক যুগের ছবি সেকালে দর্শকদের আলোচনার বিষয় হযেছিল তাব মধ্যে ছিলো 'ওয়ে ডাউন ইস্ট', 'বো জেস্ট', 'সেভেনথ্ হেভেন', 'ডরোথি ভার্নন অব হ্যাডন হল', 'দি সি বিস্ট', 'অ্যাক্রস টু সিঙ্গাপুর', 'স্টুডেন্ট প্রিন্স', 'ডেভিল অ্যান্ড দি ডিপ', 'মেট্রোপলিস', 'গার্ডেন অব আল্লা', 'ফোর হর্সমেন অব দি অ্যাপোক্লিপ্স',

'ক্যামেলি', 'ইফ আই ওয়াজ এ কিং', 'লা মিজারেবলস্'। তখনকার দিনের নামকরা ও জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে ছিলেন চার্লি চ্যাপলিন, ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস, জন ব্যারিমোর, রোমান নোভারো, লিলিয়ান গীস, মেরী পিকফোর্ড, পোলা নেগ্রী, গ্রেটা গার্বো, জন গিলবার্ট এবং আবো কেউ কেউ। তখন চলচ্চিত্রের হয়ে-ওঠা ব্যাপারটাই শুধু চলছে, প্রয়োজনীয় শিল্পমাধ্যম হিসেবে নয় আনন্দ সৃষ্টির উৎস হিসেবেই তখন পর্যন্ত বিবেচিত হতো তার যা-কিছু সার্থকতা। তবু এই সময়েই তৈবি হযেছিলো এমন কয়েকটি ছবি যা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে স্থাযী মর্যাদার আসন লাভ কবেছে। এই ধরনেব কযেকটি ছবি ও তাদের চিত্রপরিচালকদের নাম স্মৃতি থেকে উদ্ধার করা যেতে পারে : টেন কমান্ডমেন্টস (সিসিল বি ডি মিলি), বার্থ অব এ নেশন, ইনটলারেন্স, ওয়ে ডাউন ইস্ট (ডি ডাবলু গ্রিফিথস), দি স্টুডেন্ট প্রিন্স, দি প্যাট্রিয়ট, অবফানস্ অব দি স্টর্ম (আর্নস্ট লুবিশ), গার্ডেন অব আল্লা, ফোব হর্সমেন অব দি এ্যাপোক্লিপ্‌স (রেক্স ইনগ্রাম), দি বিগ প্যারেড (কিং ভিডর), ডেথ অব সিগফ্রিড, মেট্রোপলিস (ফ্রিটস্ ল্যাঙ) ইত্যাদি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় তৈবি দু'টি ছবি 'দি বিগ প্যারেড' এবং 'দি সেভেন্থ হেভেন' আমার স্মৃতিতে স্মবণীয হয়ে আছে। 'অল কোযায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট' বইটি লিখে স্মরণীয় হয়ে আছেন রেমার্ক। তাঁর এই বইটিব নির্বাক যুগের চিত্ররূপও দর্শকদের মুগ্ধ করেছিলো সে সময়ে। এখানে বলা দবকার বিশের দশকে কলকাতা এবং ঢাকায অনেক ছবি একই সঙ্গে মুক্তিলাভ করতো। এমনও হয়েছে দু'চারটি বিদেশি সদ্যনির্মিত ছবি কলকাতাব প্রেক্ষাগৃহে দেখাবার আগেই ঢাকায় প্রদর্শিত হয়েছে। ঢাকাব দর্শকসমাজের সিনেমা সম্পর্কে রুচি ও বোধগম্যতা তৈবি হতে পেবেছিল অজস্র বিদেশি ছবি দেখেই, কেননা দেশি ছবি তখন পর্যন্ত ছিলো বেশ নিচু মানের। জয়দেব, নিষিদ্ধ ফল, চাষীর মেয়ে, দুর্গেশনন্দিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, কণ্ঠহাব, কপালকুণ্ডলা, জনা, প্রফুল্ল, শাস্তি কি শান্তি, চবিত্রহীন তবু আকর্ষণ করেছিল ঢাকাব দর্শকদেব, জযদেব ছবিটি তো কযেক মাস ধবে একটি ছবিঘরে প্রদর্শিত হয়েছিল। বোম্বাই থেকে প্রেরিত বেশ কিছু ছবিও এই সময় ঢাকায় দেখানো হতো। মনে পড়ে শ্রীমতী সুলোচনার (উত্তরকালে যিনি দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পেয়েছেন চলচ্চিত্রে তাঁর অবদানের জন্যে) কযেকটি ছবি দেখেছিলাম, 'নার্স' ও 'আনারকলি' ছবি দু'টি যার অন্যতম। ঢাকার সিনেমা সম্পর্কে একটু বিস্তারিত লেখা হয়ে গেল কেননা তখনকাব দিনে আজকের দিনের মতো ফিল্ম সোসাইটি না থাকলেও স্থানীয় ক্লাবে বেস্তরাঁয় শিক্ষিতসমাজে চলচ্চিত্রের শিল্পরূপ নিয়েও কিছু কিছু আলোচনা হতে শুনেছি। তখনকার দিনে স্বাধীনতা সংগ্রামের সুস্থ চিন্তার পাশাপাশি সিনেমার প্রভাব তেমন ক্ষয়কারী আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে পারে নি, বরং একটি নতুন শিল্পমাধ্যম হিসেবে সিনেমা সাধারণ মানুষের মনের পরিধিকে বিস্তৃত করতে সাহায্য করেছিলো।

ঢাকায় উৎসবের মধ্যে দুর্গাপূজা ও সরস্বতী পুজোর দিনগুলো দারুণ আনন্দের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতো। অভিভাবিকাদের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে সারা শহরের দুর্গা প্রতিমা দেখতে যেতাম। রূপবাবু রঘুবাবুরা ছিলেন জমিদার এবং ফরাশগঞ্জ এলাকায় তাঁদের প্রাসাদোপম বাড়িতে বিশাল দুর্গা প্রতিমা দর্শন যে-কোনো ব্যক্তির পক্ষে যেন অবশ্যপালনীয়

কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। বিজয়ার দিন প্রীতি–আলিঙ্গন ও শুভেচ্ছার বিনিময়। এই উপলক্ষে যেসব মিষ্টি পরিবেশিত হতো তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো মোতিচুরের লাড্ডু, ঢাকার মিষ্টি তৈরির কারিগরদের একটি বিশিষ্ট অবদান। এছাড়া তৈরি হতো প্রাণহরা অমৃতি জিভে গজা লালমোহন রসগোল্লা এবং ছানার পোলাউ। বিবাহ উৎসবে এবং অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিবেশিত মিষ্টি শুধু রসনায় স্বাদুই ছিলো না, পয়সার দিক থেকেও শস্তাই ছিল। মিষ্টির দোকানে পাওযা যেতো ঢাকাই পরোটা এবং খাঁটি ঘিয়ে তৈবি হালুযা যাকে বলা হতো মোহনভোগ। নবাবপুর ও ইসলামপুরে ছিল নামকরা মিষ্টির দোকান, শুনেছি হাতবদল হয়ে এখনো সেগুলো বাংলাদেশে টিকে আছে। বালককালে দেখেছি বিয়ে বাড়িতে যখন নেমন্তন্ন বক্ষা করতে যেতাম ঘোড়াব গাড়িব ভাড়া নিমন্ত্রণকাবীর পক্ষ থেকেই মিটিয়ে দেয়া হতো। গাড়িভাড়াও ছিলো শস্তা, তখনকার দু'আনায় দু'তিন মাইল পথ ঘোড়াব গাড়িতে অতিক্রম করা যেতো। স্কুল–কলেজেব মেয়েরাও যাতাযাত করতেন এই ঘোড়াব গাড়িতেই, সঙ্গে অবশ্য থাকতো স্কুল বা কলেজেব একজন পরিচারিকা অথবা দারোযান যাদের ওপব ন্যস্ত থাকতো ছাত্রীদের বাড়ি থেকে নিয়ে আসার বা পৌঁছে দেবার দাযিত্ব। মনে পড়ে ছেলেবেলায যখন স্কুলে প্রথম যাই তখন দিদিদের সঙ্গে এক্কা গাড়িতেই কিছুদিন যাতায়াত কবেছি, যদিও ঢাকা শহরে এই ধবনের গাড়িব চল আর পববর্তীকালে দেখতে পাই নি। ঢাকা শহবের আবো উৎসবের কথা মনে পড়ছে। দোলযাত্রা ও ঝুলন পূর্ণিমাব উৎসব। শহরে দু'দিন দোল খেলা চলতো, প্রথম দিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত আবির মাখিয়ে দেয়া হতো পরিচিত বন্ধু ও পথচারীদের, পরের দিন রঙ খেলা চলতো দুপুর বাবোটা পর্যন্ত। ঝুলনেব সময কোনো কোনো ধনী ব্যবসাযীব বাড়িতে বাঈজীদের নিযে আসা হতো সারাবাত গান শোনাবার জন্যে এবং সমাগত ব্যক্তিদেব কেউ কেউ মদ্যপানেও উৎসাহী হযে উঠতেন।

পাযবা ওড়ানো, ঘুড়ি ওড়ানোব ব্যাপারটাও ঢাকায় আমার বালককালে বেশ চালু ছিল। বাবো–তেবো বছর বয়স পর্যন্ত অনেকের দেখাদেখি আমাদেব বাসাবাড়ি লেনেব একতলা বাড়িতে আমিও বেশ কয়েক জোড়া পায়রা এনে সযত্নে পুষেছিলাম। সকালে আকাশের দিকে পাযরাগুলোকে উড়িয়ে দিযে একদৃষ্টিতে তাকিযে থাকতাম এবং অনেকক্ষণ পরে নেমে এলে সবগুলো পায়রাকে খাঁচায় পুবে নিশ্চিন্ত হতাম। পায়রা ওড়ানো যে আমাদেব মতো শিক্ষিত পরিবারের ক্ষেত্রে অগৌরবের কাজ একথা উপলব্ধি করতে কিছুটা সময় লেগেছিলো। ঢাকার বাবুব বাজার অঞ্চলে সুন্দর সুন্দব পায়রা কিনতে পাওয়া যেতো, সেখান থেকেই সবগুলো পাখি কিনে এনেছিলাম। একদিন রাতের অন্ধকারে কী করে জানি না বেড়াল এসে দুটো পায়রাকে মেরে ফেললো। তারপরেই আমার পিতৃদেবের হুকুমে আমাদের বাড়িব পরিচারিকার ছেলে মনাদা সমস্ত পায়রা নিয়ে সেই বাবুব বাজারেই বিক্রি করে দিয়ে এলো। ঘুড়ি ওড়ানোর ব্যাপারটা অবশ্য এতো সহজে মেটে নি কেননা ঢাকা শহরে এই খেলা ওই সময় খুব ব্যাপকতা লাভ করেছিলো। পায়রা ওড়ানোর ব্যাপারে যে–সব ভদ্রলোক বিরক্তি প্রকাশ করতেন তাদের অনেকেই কিন্তু বাড়ির ছাদে বহুক্ষণ ধরে ঘুড়ি ওড়াবার কাজে লিপ্ত থাকতেন। ছ'বছর বযেসের ছেলে থেকে ছত্রিশ বছরের

বুড়োধাড়িকেও ঘুড়ি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে দেখা যেতো। পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন (যেমন কলকাতায় বিশ্বকর্মা পুজোর দিন) ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাজার হাজার উড্ডীয়মান ঘুড়ি ঢাকা শহরের সারা আকাশকে আচ্ছন্ন করে রাখতো। মনে পড়ছে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঐদিন বাড়ির ছাদেই দৌড়ঝাঁপ আর দাপাদাপি করে আমার সময় কেটে যেতো। সকালে পিঠে-পায়েস খাওয়া, দুপুরের ভাত খাওয়া মাথায় থাকতো; এই দিনটিতে অভিভাবকদেব কঠোব শাসন অবশ্য কিছুটা শিথিল কবে দেয়া হতো কেননা বেপরোয়া অবস্থায় কোনো নিষেধ বন্ধনই মানার মতো মনের অবস্থা আমার মতো অনেকেরই থাকতো না। ঢাকায বংশাল এলাকায খুব উৎকৃষ্ট মানের ঘুড়ি তৈরি হতো। আমরা দল বেঁধে সংক্রান্তির আগের দিন সন্ধ্যায সেই অঞ্চলে গিযে একসঙ্গে বহু ঘুড়ি কিনে আনতাম যাতে পবের দিন ছাদে দাঁড়িযে সমস্তক্ষণ একটাব পর একটা ঘুড়ি ওড়ানো যায। আয়তনে যে ঘুড়িগুলো খুব বড়ো বড়ো সেগুলো অবশ্য কিনে আনতে হতো বাবুর বাজার এবং চকবাজার থেকে। বড়োবা বড়ো লাটাই হাতে সেই সব বড়ো বড়ো ঘুড়ি ওড়াতেন, আমরা ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিতে চেযে দেখতাম। ঘুড়ি ওড়াবার জন্যে ব্যবহৃত হতো কেষ্ট মার্কা সুতো ও বাঘ মার্কা সুতো, জড়ানো হতো নানা রঙেব মানজা দিয়ে সুদৃশ্য আর মজবুত লাটাইয়ে। ঘুড়িব প্রতিযোগিতাও লেগে থাকতো মাঝে-মাঝেই; ঘুড়ি ও লাটাই নিয়ে দু'টি দল দু'জাযগা থেকে ঘুড়ি উড়িযে একে অন্যকে পবাস্ত করবাব চেষ্টা চালিযে যেতো। ঢাকায এই ঘুড়ি প্রতিযোগিতাকে বলা হতো 'হবিপ' এবং এই প্রতিযোগিতার আকর্ষণ আমাদের মতো বালকেব কাছে ছিল অত্যন্ত তীব্র।

কিশোরের গ্রন্থভুবন

১৯২৮-২৯ সনে ঢাকার মগবাজাব অঞ্চলে আমার এক কাকা একটি বড়ো দোতলা বাড়ি তৈবি করিয়েছিলেন তাঁদেব পাঁচ ভাইযের একান্নবর্তী বিবাট সংসারেব উপযোগী করে। ঢাকা শহরের এই এলাকাটি এখন অভিজাত ও শিক্ষিত বহু পরিবারেব রুচি ও প্রগতির উপযোগী কবে গড়ে তোলা হযেছে। যখন প্রথম বাড়ি করে আমার জ্যাঠামশাই ও কাকাবা সপরিবারে এখানকার নবনির্মিত বাড়িতে চলে যান তখন পর্যন্ত এলাকাটি ছিল পল্লীগ্রামেরই অংশ, পুরনো ঢাকা অঞ্চল থেকে প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার দূবে। অতো দূব থেকে পুরনো ঢাকা শহরে নিত্য আসা-যাওয়া করে ছেলেমেয়েদের স্কুলে হাজিরা দেয়া সম্ভব ছিলো না বলে আমার বাবা সপরিবারে পুরনো ঢাকা শহরের ভাড়াটে বাড়িতেই থেকে গিয়েছিলেন। তবে গ্রীষ্মের সময় স্কুল-কলেজ যখন বন্ধ থাকতো কিংবা অন্য কোনো ছুটিতে, আমরা সবাই অল্প কয়েকদিনের জন্যে মগবাজারের বাড়িতে গিয়ে থাকতাম। প্রথম যখন ওখানে ভদ্রলোকদের বাস শুরু হয় তখন মাত্র সাত-আটটি বাড়ি তৈরি হয়েছিলো। শুনেছি তখনকার দিনে (১৯২৮-২৯) বিস্তৃত জায়গা জুড়ে কাকা দ্বিতল বাড়িটি তৈরি করেছিলেন ষোল-সতেবো হাজার টাকা ব্যয় করে। বাড়িতে সারাক্ষণের ঠাকুর চাকর ছিলো, গরুগুলো দেখাশোনা করবার আলাদা লোক ছিলো; সে বাড়ির সংলগ্ন

বাগানের আম কাঁঠাল জামরুল পেঁপে গাছগুলোরও পরিচর্চার দায়িত্ব পেয়েছিলো। মগবাজারের বাড়িতে যে ক'দিন থাকতাম সারাদিন হৈ চৈ গল্পগুজবে দিন কেটে যেতো। কিন্তু মুশকিল এই ছিলো যে কাছাকাছি কোথাও চা-সিগারেটের দোকান বা ছোট মুদিখানা ভিন্ন আব কিছু ছিলো না। আমার ভাইদের বা বাড়ির ঠাকুরকে সাইকেলে চেপে পুরনো শহরে রায়সাহেবেব বাজারে গিয়ে দেখেশুনে মাছ, মশলা ও সব্জি কিনে ফিরতে হতো। বাড়িতে দুধের অভাব ছিলো না, পল্লীতে কোনো কোনো গৃহস্থ ঘরে ডিমও পাওয়া যেতো। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে যখন পথ কর্দমাক্ত, সাইকেল চালিয়ে নেয়া অসম্ভব, তখন বাজাবে যাওযার কিছুকালের বিবতি ঘটতো; ডাল আর ডিমের তরকারি কিংবা আলুর ডালনাই পরম উপাদেয় মনে হতো। মগবাজারেব বাড়িতে ঠাকুর চাকর সমেত এক এক সময় প্রায় চল্লিশজন লোক থাকতাম। খাবাব সময ঘণ্টা বাজতো এবং সবাই খেতে যেতাম। সময কাটতো তাস খেলায, ক্যারাম খেলায়। আমার খুড়তুতো-জ্যাঠতুত ভাইদের কেউ কেউ দাবা নিযেও বসতো। এবই ফাঁকে ফাঁকে আমি পড়ে ফেলতাম রহস্যলহরি সিরিজের রোমাঞ্চকব সেই সব উপন্যাস যেগুলোর লেখক ছিলেন দীনেন্দ্রকুমার বায়। মনে পড়ে তাঁব চীনের ড্রাগন বইটি এই সময়েই পড়েছিলাম। রবার্ট ব্লেক ও তার সহকাবী স্মিথেব গোযেন্দাগিবিব নানা অধ্যায যতোই আজগুবি মনে হোক না কেন পড়তে ভালই লাগতো। রূপসী বোম্বেটে, ঝোপে-ঝোপে নেকড়ে, সাটিবাব কীর্তি এবং এরূপ অজস্র বই তখন অনেক কিশোবেরই নখাগ্রে ছিল। যখন আরো একটু বড়ো হযে উঠেছি এবং অষ্টম কি নবম শ্রেণীতে পড়ি তখন কলকাতাব শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী এ্যান্ড সন্স প্রতি মাসে একটি করে বহস্যোপন্যাস প্রকাশ কবতে শুরু কবেন। প্রতিটি বই ছিল সুমুদ্রিত, একটি বা দু'টি ছবিও থাকতো এবং মোটামুটি সুলিখিত। দাম বাবো আনা। প্রতি মাসে মাব কাছ থেকে বাবো আনা পযসা চেয়ে নিযে বেশ কিছুকাল আমি এই সিবিজেব বইগুলো কিনেছি। পবে অবশ্য বযস আবো বাড়াব সঙ্গে সঙ্গে রুচির পরিবর্তন ঘটেছে এবং অন্য ধরনের বইযেব প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম।

স্কুলেব নবম-দশম শ্রেণীতে যখন পড়ি তখন আমার মেজদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযেব লাইব্রেরি থেকে দু'টি তিনটি কবে উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ পড়বার জন্যে আনতেন। সবই তরুণ লেখকদেব লেখা এবং প্রায় সদ্য প্রকাশিত। বিভূতিভূষণেব পথের পাঁচালী ও অপরাজিত এই সমযেই পড়ে ফেলেছিলাম এবং বুদ্ধ-অচিন্ত্য-প্রেমেন্দ্রেব বেশ কয়েকটি বইও। বুদ্ধদেব বসুব যেদিন ফুটলো কমল, মিসেস গুপ্ত, বডোডেনড্রন গুচ্ছ, লাল মেঘ: প্রবোধ সান্যালের সরল বেখা, প্রিয় বান্ধবী; অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তব ছিনিমিনি, কাকজ্যোৎস্না, শৈলজানন্দেব পাতালপুরি, খরস্রোতা যেন এতোদিন ধরে অনাবিষ্কৃত নতুন একটি জগতের দিকে ঠেলে নিযে গিয়েছিল আমাকে। ঢাকার রূপলাল হাউস-এ একটি পাঠাগার ছিল, সেখান থেকেও অনেক বই আনতাম এবং সব বই-ই ছিল তিরিশের দশকের নবীন লেখকদের লেখা। অন্নদাশঙ্করের আগুন নিয়ে খেলা, পুতুল নিয়ে খেলা, প্রবোধ সান্যালের দুই আর দুইয়ে চার, বুদ্ধদেব বসুর যবনিকা পতন সেই অতি তরুণ বয়সে মনকে খুব নাড়া দিয়েছিলো একথার উল্লেখ বাহুল্য।

স্কুল জীবনে ছোটদের পত্র-পত্রিকার মধ্যে আমার কাছে আকর্ষণীয় ছিল শিশুসাথী আর মৌচাক। সন্দেশ পত্রিকাটি তখন আর বেরুতো না বলে কোনো সংখ্যা দেখবার সুযোগ ছিলো না। সন্দেশ যে-বাড়ি থেকে বেরুতো সে-বাড়ির লেখকদের নানা রচনার সঙ্গে অবশ্য পরিচিত হয়েছিলাম বারো-তেরো বছর বয়সেই। উপেন্দ্রকিশোরেব লেখা টুনটুনির বই, মহাভারত এবং সুখলতা রাওযের আরো গল্প মনে পড়ছে। মনে পড়ছে সুখলতার গল্পের অন্তর্ভুক্ত 'কাঁপুনি শিখতে হবে' ছবিটির কথা। সীতা দেবী ও শান্তা দেবীর হিন্দুস্থানী উপকথাব ছবিগুলোও আমার মতো কিশোরের কল্পনাকে বহু বিস্তৃত করতে সাহায্য করেছিলো।

কলেজ জীবনে প্রবেশ

দলেব বাজনীতিতে লিপ্ত দাদাদের সঙ্গে আমাদেব মতো সদ্য-প্রভাবিত কিশোরদের পবিচয় কখনো তেমন গভীর হতে পাবে নি। ঢাকা শহরেব কযেকটি জাযগা ছিলো যেখানে সন্ধ্যাব অন্ধকাবে পুলিশেব চোখ এড়িযে রাজনীতি নিযে আলোচনা হতো। যেদিন যে জায়গায় উপস্থিত থাকবাব নির্দেশ দেযা হতো সেদিন সে জায়গায আগেই উপস্থিত হযে সঙ্গোপনে বসে থাকতে হতো মাঠের ঘাসেব ওপর। হয়তো শীত, হযতো বৃষ্টি, এক-একদিন যেতে মোটেই ইচ্ছে হতো না, তবু শেষ পর্যন্ত যেতে হতো। তবে সব দিন সব জায়গায উপস্থিত থাকতে পেবেছি একথা জোর দিয়ে বলতে পাবা যায় না। অনেকক্ষণ বসে আছি, হযতো বেশ শীত পড়েছে কিংবা বর্ষায় গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি; হঠাৎ নজরে পড়ে অন্ধকারে একটি ছায়ামূর্তি যেন আমাব দিকে ক্রমশ এগিযে আসছে। দেরি করে এলে দাদা যে খুব কৈফিযত দিতেন তা নয়, আমি ধরে নিতাম আমার ধৈর্যের পবীক্ষা নিতেই সম্ভবত তিনি দেরি কবে এসেছেন। আধঘণ্টা কি এক ঘণ্টা পরেই আমার ছুটি, দাদার কাছ থেকে স্বদেশমন্ত্রের দীক্ষা নেবার পথে কোনো অগ্রগতি হযেছে কিনা তা নিয়ে ভাবনা চিন্তার কোনো উৎসাহ বোধ করতাম না। নবাববাড়িব পেছনে বুড়িগঙ্গার বাকল্যাণ্ড বাঁধের ঘাসের ওপর, ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালের নির্জনতম এলাকায, সেগুনবাগিচা অঞ্চলে, আরমানিটোলার খেলাব মাঠে বেশ কিছুকাল যাতাযাত করতে হয়েছিল এই সময়। কিন্তু সমযটা ছিল পবিবর্তনের কাল, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন থেকে গণআন্দোলনের দিকে কর্মীরা ঝুঁকেছিলেন; ফলে বিভিন্ন দলের ছেলেরাও নতুন রাজনীতির পথে চলতে শুরু করেছিলেন। খুব সম্ভব তিরিশ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই ঢাকায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন গণআন্দোলনের রূপ নিতে শুরু করে।

১৯৩৫-এ ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। রমনা অঞ্চলে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এই কলেজটিকে আমার কাছে প্রথম দিন রাজপ্রাসাদের মতো মনে হয়েছিলো। আদ্যন্ত সাদা বঙে মোড়া বিশাল দ্বিতল দালানের সবটাই পরিচ্ছন্ন, আলোহাওয়া যুক্ত, উপরে ও নিচে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘর জুড়ে বিজ্ঞান বিভাগ ও কলা বিভাগ;

সুবিস্তৃত সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় যাওয়া বা উপর থেকে নিচে নামা একটি নতুন অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেছিলো আমাব কাছে। ছাত্রদের মধ্যে আমরা অনেকেই আসতুম পুরনো ঢাকা শহর থেকে। পুরনো শহরের গলিঘিঞ্জি অতিক্রম করে নবাবপুর রোড, ঢাকা রেলস্টেশন এবং ঢাকা ডাকবাংলো পেরিয়ে সাইকেল করে পৌঁছে যেতাম কলেজে। কলেজ প্রাঙ্গণটিও ছিল বিশাল, সর্বত্র সবুজের আস্তবণ, বড়ো বড়ো গাছের বাহার, এদিকে-ওদিকে নানা বঙের ফুলেব মালা। গবমের সময় গাছেব নিচে নানা জায়গায় তরুণ ছাত্রদের এক-একটি জমায়েত, আড্ডা, তর্ক, হাসি-হুল্লোড়। দালানের ভিতরের দিকে প্রশস্ত বাবান্দাগুলো পার হয়ে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা উদ্ভিদবিদ্যা ইত্যাদি নানা বিষয় সংক্রান্ত পরিচ্ছন্ন ল্যাবরেটবি উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। দোতলায পশ্চিম দিকে ছিল ভূগোল দপ্তর, যার দায়িত্বে ছিলেন আমার পিতৃদেব। সন্ধ্যার পব কলেজেব বারান্দার প্রশস্ত ছাদে টেলিস্কোপ বসিযে দূব আকাশেব গ্রহ-নক্ষত্র দেখবাব জন্যে জমাযেত হতো কৌতূহলী ছাত্রদল, সবাই যে ভূগোল নিয়ে পড়তো তাও নয়; বাবা সযত্নে এদেব প্রায সকলকেই দীক্ষিত করে তুলেছিলেন।

ঢাকা ইন্টাবমিডিযেট কলেজেব লাইব্রেরি ঘবটি ছিল নিচে। প্রচুব বই ইংবেজি ও বাংলায; বহু বই বিদেশ থেকে সদ্যপ্রেবিত। তখনকাব দিনে অধিকাংশ বাড়িব অভিভাবকরা চাইতেন ছেলেবা আর্টস নয, সায়েন্স নিয়ে পড়বে। আমি সংস্কৃত নিয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস কবেছিলাম, অঙ্ক এবং সংস্কৃত দুটো বিষয় ছিল আমাব পক্ষে দুষ্পাচ্য আর মারাত্মক এবং স্কুলজীবনেই এই দুই বিষযে একটা দারুণ ভীতি মনের মধ্যে ছিল। কলেজে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে অভিভাবকের নির্দেশে বিজ্ঞান বিভাগেব ছাত্র হলাম। পদার্থবিদ্যা তবু কিছু সজীব মনে হতো, মনেব মধ্যে ঔৎসুক্য জাগিয়ে তুলতো কিন্তু বসায়নবিদ্যা এবং অঙ্কশাস্ত্র আমাব তরুণ মনে কিছুতেই তেমন কোনো রেখাপাত কবতে পারে নি। অথচ আমাব ভাইবোনদের অনেকেবই ছিল অঙ্কেব দিকে ঝোঁক, তাদের ববাবব ভালো নম্বব পেয়েই স্কুল-কলেজের সিঁড়ি পাব হতে দেখেছি কোনো গৃহশিক্ষকেব সাহায্য ছাড়াই। ইন্টারমিডিয়েট পবীক্ষাব কিছুকাল আগে আমাব জন্য শেষ পর্যন্ত কযেক মাসেব জন্যে নিযুক্ত হলো গৃহশিক্ষক এবং পাস করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আমার দাদা প্রফুল্লশঙ্কর লেখাপড়ায় ভালো ছাত্র ছিলেন। কলেজ জীবনে আশুতোষ ভট্টাচার্য (বাংলা মঙ্গলকাব্যেব ইতিহাস প্রণেতা এবং বিশিষ্ট অধ্যাপক) এবং অবনী কুশারী (বর্তমানে অবসরভোগী আই এ এস এবং কবি কেতকী কুশাবীর বাবা) এবং আরো কেউ কেউ দাদার সহপাঠী ছিলেন এবং তাঁর পড়াশোনার বিষয়ে সপ্রশংস উল্লেখ করতেন। ইংরেজি সাহিত্যে দাদার ব্যুৎপত্তি ছিলো এবং আমাব অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের কাছে শুনেছি ছাত্রাবস্থায় দাদা ইংবেজি কবিতা পড়ে তাঁদের শোনাতেন এবং বোঝাতেন। পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব বসুও আমাকে একবাব বলেছিলেন যে, যে বয়সে ছাত্র মাত্রেই আমোদপ্রমোদ ও লঘু ঠাট্টা কৌতুকে সময় কাটিয়ে দেয় সেই বয়সেই প্রফুল্লশঙ্কর সাহিত্য নিয়ে এবং অন্যান্য আরো বিষয় নিয়ে পড়াশোনায় ডুবে যেতেন। এম.এ ক্লাসে যখন ইংরেজি নিয়ে পড়ছি তখন আমার অধ্যাপক প্রফুল্লকুমাব গুহ কয়েকবার আমার দাদার সপ্রশংস উল্লেখ করেছিলেন। অথচ দাদার মধ্যে,

অন্তত প্রথম যৌবনে, কেমন যেন এক ধরনের স্থিবতার অভাব ছিল। স্কটিশের ছাত্র, ডিস্টিংশনে বি.এ পাস করে পড়া ছেড়ে দিলেন। কোনো প্রতিযোগিতামূলক ব্যাপারেও তিনি যেতে রাজি ছিলেন না কেননা যদি রেজাল্ট আশানুরূপ না হয়। একবার ইংরেজিতে এম.এ পড়বার জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযে তিরিশের দশকে ভর্তি হয়েছিলেন কিন্তু ক্লাসে তৎকালীন অধ্যাপক হাসান সাহেব কি একটা ভুল তথ্য পরিবেশন করায় দাদার সঙ্গে খটাখটি বেঁধে গেল এবং দাদা সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিযে এলেন। আমার এম.এ পাস কবার বহু পবে দাদা ওই বিশ্ববিদ্যালয থেকেই এম.এ পাস করলেন, অবশ্যই ফার্স্ট ক্লাস নিযে। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন শিক্ষা দপ্তরের ইংরেজির অধ্যাপকরূপে অবসর নিয়েছেন। একবার দাদার অনুপস্থিতিতে তাঁর সাতপুবনো ট্র্যাঙ্কের কাগজপত্র দেখার সুযোগ হযেছিলো। পেযেছিলাম বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত সম্পাদিত 'প্রগতি' পত্রিকার দু'টি কপি যাতে দাদাব দু'টি সনেট প্রকাশিত হয়েছিলো। তাছাড়া দেখেছিলাম মৃণালিনী বন্দ্যোপাধ্যায়ের (পরবর্তীকালে মৃণালিনী এমারসন) দাদাকে লেখা একগুচ্ছ চিঠি।

লেখাপড়ার জগতে সহপাঠিনী মৃণালিনী যে দাদাকে তখনকার ধ্যানধাবণাব জন্যে কিছু মূল্য দিতেন চিঠিপত্রে তার আভাস পেয়েছিলাম।

লেখালেখির জগৎ

ইন্টাবমিডিয়েট কলেজে যখন বিজ্ঞান নিয়ে পড়ছি তখনই কিন্তু লেখালেখিব সূত্রপাত। স্কুলজীবনে নবম-দশম শ্রেণীতে যখন পড়ি তখন থেকেই হাতে লেখা ম্যাগাজিন সম্পাদনা করতে শুরু কবি। আবমানিটোলা স্কুলে আমার সহপাঠী ছিলেন শঙ্খ চৌধুরী, এখনকার দিনের যিনি একজন প্রখ্যাত ভাস্কব, 'আগন্তুক' নামে পত্রিকার লেটারিং করে দিয়েছিলেন। শঙ্খ চৌধুরী কবি মনীশ ঘটকের শ্যালক এবং ওদের জিন্দাবাহাব লেনেব বাড়িতে আসা-যাওয়া করতেন লেখাপড়ার জগতেব অনেকেই এবং ওর কাছেই অজিত চক্রবর্তী, মনীশ ঘটক, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্তপ্রভৃতির লেখালেখির ব্যাপাবটা প্রথম জানতে পেরেছিলাম। আমার দাদা মহাশয় মনস্বী বজনীকান্ত গুপ্তকে আমি দেখি নি কেননা তাঁর মৃত্যুর আঠারো বছব বাদে আমার জন্ম। শঙ্খর মা একবাব কোনো উপলক্ষে আমার দাদা মহাশযকে দেখেছিলেন এবং রজনীকান্ত গুপ্তব চেহারা ও পোশাকের যে-বর্ণনা তিনি আমাকে দিয়েছিলেন এখন পর্যন্ত তা' আমাব মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। ম্যাট্রিক পাস করার পর শঙ্খ শান্তিনিকেতনে চলে যায় পড়বার জন্যে আর আমি ঢাকায় কলেজে ভর্তি হয়ে যাই। ছুটিতে শঙ্খ ঢাকায় এলে তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হতো এবং ওই সময়ই প্রথম মনীশ ঘটককে ঢাকায় দেখি এবং পরিচয় হয়। বড়ো হয়ে মাঝে বহু বছর মণীশদাকে দেখি নি। পরে ইনকাম ট্যাক্স অফিসারের চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি যখন বহরমপুরে স্থায়ীভাবে প্র্যাকটিস শুরু করলেন তখন আবার তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে যায়।

এখনকাব দিনের মতো আমাদের সময় শিক্ষক ও ছাত্রদের লেখা ছেপে স্কুল ম্যাগাজিন

বার করার কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। দশম শ্রেণীতে আমাদের বাংলা পড়াতেন প্রাণবল্লভবাবু, মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী নেপাল বসাকের কাকা। সাহিত্যচর্চা ও সঙ্গীতচর্চার ব্যাপারে তিনি ছাত্রদের যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন কিন্তু ম্যাগাজিন মুদ্রণের ব্যাপারে তাঁর প্রচেষ্টাও সফল হলো না। এদিকে প্রাণবল্লভবাবুদেরই একটি পুস্তক বিক্রয় ও পুস্তক প্রকাশনা সংস্থা ছিল তাঁদের নবাবপুর রোডের বসতবাড়ির বহির্বিভাগে। সংস্থার নাম অ্যালবার্ট লাইব্রেরি এবং তিরিশেব দশকে এখানে পাওয়া যেতো স্কুল ও কলেজেব অজস্র বই। ওই সময়েই আমার পিতৃদেবের দু'টি স্কুলপাঠ্য ভূগোলের বইও ওরা প্রকাশ করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার আগেই এই অ্যালবার্ট লাইব্রেরিতেই শেক্সপীয়ব বার্নাড শ অলডুস হাক্সলির বইগুলো নাড়াচাড়া করবার প্রথম সুযোগ পেযেছিলাম। সব বই-ই গ্রেট বৃটেনে ছাপা, হার্ড কভার জ্যাকেট সজ্জিত। নাকের কাছে বইগুলো ধরলে কি রকম যেন গন্ধ, ভালোই লাগতো। ঢাকাব প্রকাশকদের মধ্যে বৃন্দাবন ধর ছাড়া আব সবাই সাধারণত পাঠ্যবই-ই ছাপতেন, কদাচিৎ একটি-দু'টি ভিন্ন ধবনেব বই। কবি মোহিতলাল মজুমদাব যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তখন তাঁব আধুনিক বাংলা সাহিত্য গ্রন্থটি প্রকাশ কবেছিলেন অ্যালবার্ট লাইব্রেবি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েব জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষেও তাঁবা অপব একটি সঙ্কলন গ্রন্থ ছেপেছিলেন। তিবিশ দশকেব মাঝামাঝি সময থেকে বিপ্লবী অনিলচন্দ্র ঘোষ জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তাঁদের পুস্তক-প্রকাশনা সংস্থা প্রেসিডেন্সি লাইব্রেবির হাল ধবলেন এবং নানা ধরনেব বই প্রকাশে সচেষ্ট হন। ছোট ছোট ছেলেমেযেদের চরিত্র গঠনের উপযোগী বেশ কিছু বই তিনি নিজেও লিখেছিলেন, ব্যায়ামে বাঙালি বীবত্বে বাঙালি বিজ্ঞানে বাঙালি যে-বইগুলোর অন্যতম। শ্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যানের জন্যে অনিলচন্দ্রের পিতা জগদীশচন্দ্রের নাম আজ সুপরিচিত, অনিলবাবুদের গড়িয়াহাট রোডের বাড়িতে পঞ্চাশ দশকের প্রথম দিকে আমি মনস্বী জগদীশচন্দ্রকে শেষ দেখেছিলাম। ঐ সময়েই প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি থেকে আমাব প্রথম গদ্য সমালোচনাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। পবে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীব সময প্রেমেনদা (প্রেমেন্দ্র মিত্র) ও আমার সম্পাদনায় শতাব্দী শতক নামের যে কাব্য সঙ্কলনটি প্রকাশিত হয তারও প্রকাশক ছিলেন প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি।

কাগজের আপিসের বিভাগীয় সম্পাদক অথবা পুস্তক প্রকাশক সংস্থার কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে লেখালেখি বা বই প্রকাশেব সূত্রে আলাপ-পরিচযের উদ্যোগ আমার কখনো ছিল না। প্রথম যৌবনকাল পর্যন্ত ছিলাম ঢাকায়, দেশ বিভাগের পব পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে যখন পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ীভাবে চলে এসেছিলাম তখন আমার বয়স তিরিশ পেরিয়েছে। ঢাকায় থাকাকালীন আমাব একটি মাত্র কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছিল, স্বপ্ন-কামনা, যাব ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন কবি জীবনানন্দ দাশ। আমি তখন ঢাকায় বি.এ পরীক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছি এবং জীবনানন্দ ছিলেন বরিশালে, তাঁদের বাড়ি সর্বানন্দ ভবন-এ। সম্ভবত অধ্যাপনা করতেন কলেজে। আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখে দেবার অনুবোধ জানাতেই তিনি রাজি হলেন। সমস্ত ছাপা ফর্মা তাঁকে পাঠালাম, তিনি দেখেশুনে ফেরত পাঠালেন তাঁর ভূমিকাসহ। বই বেরিয়ে গেল ১৯৩৮-এর ডিসেম্বর মাসে আর বি.এ পরীক্ষা

দিলাম ১৯৩৯–এর ফেব্রুয়ারি মাসে। আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থের একটি মাত্র শতচ্ছিন্ন কপি এখনও আমার কাছে আছে। সত্তর দশকে মার্কিন দেশ থেকে এসেছিলেন ক্লিন্টন সিলি, কবি জীবনানন্দ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ কবতে। কি একটা সূত্রে খবর পেয়ে আমার নাকতলার বাড়িতেও তিন–চারদিন এসেছিলেন তিনি, আমার কাব্যগ্রন্থের জীবনানন্দের ভূমিকা থেকে কিছু–কিছু কপিও করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

১৯৩৬-এ বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত ত্রৈমাসিক কবিতা পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিলো আমার দু'টি কবিতা 'শত্রু' আর 'দৃষ্টান্ত'। ছাপাব অক্ষরে এই প্রথম প্রকাশিত কবিতা। ওই বছরেই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত পরিচয় পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় বেরুলো আমার তৃতীয কবিতা 'অধ্যায়'। হঠাৎ যেন গণ্যমান্যদের মাঝে ঠাঁই পেয়ে গেলাম। কেননা এই দু'টি পত্রিকায় তখন যাঁরা লিখতেন তাঁদেব অন্যতম ছিলেন ববীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব, অজিত দত্ত, মনীশ ঘটক, প্রেমেন্দ্র মিত্র। আনন্দবাজার, দেশ ও যুগান্তরের শারদীয় সংখ্যায় প্রথম কবিতা বেরুলো ১৯৪২–এব আশ্বিনে। তাবপর থেকে বেশ কিছুকাল এই পত্রিকাগুলোতে এবং অন্যান্য অনেক সাহিত্যপত্রে কবিতা প্রকাশিত হযেছে, হিসেব করলে সংখ্যায বড়ো অল্প নয়। তখনকার দিনে আধুনিক বাংলা কবিতার সঙ্কলন তেমন ছিল না। হীবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও আবু সযীদ আইয়ুব সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' বেরুলো ১৯৪০–এ এবং আমার 'হে ললিতা ফেবাও নয়ন' কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত হলো এই সঙ্কলনগ্রন্থে। জীবনানন্দ এই কবিতাটি পড়েই লিখেছিলেন : 'মনে হয় মাটির নিচে থেকে মদ পেকে গেছে।' একালে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত আধুনিক বাংলা কবিতা সঙ্কলনে ওই কবিতাটি রযেছে।

চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকে ব্যক্তিগত কিংবা গোষ্ঠীগত প্রচেষ্টায় কিছু ভালো পত্রিকা প্রকাশিত হযেছিলো। কবিতা (বুদ্ধদেব বসু) পরিচয় (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং পরে হিরণ সান্যাল গোপাল হালদার প্রমুখ) পূর্বাশা (সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত)। প্রাণতোষ ঘটক সম্পাদিত মাসিক বসুমতী তখন বহুল প্রচারিত। কথাশিল্পী সরোজ রায়চৌধুরী বের কবেছিলেন স্বল্পায়ু বর্তমান এবং বিষ্ণু দে-কে সম্পাদক করে প্রকাশিত হযেছিলো সাহিত্যপত্র। এইসব পত্রপত্রিকায এক সময় বেশ কিছু কবিতা লিখেছিলাম এবং লিখে ভালোও লাগতো কেননা সম্পাদকরা নিজেরাও ছিলেন কবি বা কথাশিল্পী; দক্ষিণা তেমন কিছু দিতে না পারলেও লেখকের মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকতো।

লেখকের মর্যাদা সম্পর্কে একটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করছি। বোধ হয সময়টা ১৯৩৬। ঢাকা থেকে তখন বেরুতো একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা যার সম্পাদক ছিলেন নলিনীকিশোর গুহ। ঢাকা থেকে বেরুলেও বাংলাদেশের নামকরা লেখকরা তখন লিখতেন এই পত্রিকায়। সম্পাদক নলিনীকিশোর গুহ–র বাংলায় বিপ্লববাদ বইটি আগেই পড়েছিলাম, আধুনিক বাংলা গদ্য কবিতা সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ লিখে স্থির করলাম সোনার বাংলার অফিসে দিয়ে আসব। আগে কখনো সম্পাদককে দেখি নি, এই প্রথম ওই কাগজের অফিসে ঢুকবো, বয়স আঠারো কি উনিশ তখন, সুতরাং মনের মধ্যে ছিল দারুণ গোপন উত্তেজনা। সন্ধ্যার দিকে দোতলায় উঠে বারান্দা থেকে দেখলাম আলো জ্বলছে, সম্পাদক

ঘরে একা বসে কাগজপত্র দেখছেন। বারান্দায় দাঁড়িযে কিছুক্ষণ ইতস্তত করবার পর ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে ঢুকে পড়লাম। ঘরে একটা ছায়া পড়তেই নলিনীবাবু ফিরে তাকালেন। জানালাম একটি লেখা নিযে এসেছি 'সোনার বাংলা'য প্রকাশের জন্যে। প্রবন্ধটি তিনি হাতে নিয়ে দেখলেন এবং রেখে দিয়ে জানালেন মনোনীত হলে ছাপা হবে। তখনকার দিনে আধুনিক বাংলা কবিতাব সমর্থনে অজ্ঞাতনামা তরুণের প্রবন্ধ একটি জাতীয়তাবাদী পত্রিকায় ছাপা হওয়া সহজ ব্যাপার ছিলো না। তিনটি সংখ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করবাব পর দেখলাম আমার প্রবন্ধটি সুন্দরভাবে ছাপা হয়েছে। এরপবে যখনই গিয়েছি নলিনীবাবুর কাছ থেকে পেয়েছি স্নেহ ও প্রীতি এবং প্রচুব উৎসাহ। পবে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেছিলেন কযেক বছর, দেখা হলেই কি লিখছি খোঁজখবর নিতেন।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বুদ্ধদেব বসুব সঙ্গে কবিতা লেখাব সূত্রে তরুণ বযসেই পবিচয় হযেছিলো। লেখালেখির প্রথম বযসটা ঢাকায ছিলাম বলে আমাব সমকালেব কবিবন্ধুদেব সঙ্গে ব্যক্তিগত পবিচয ঘটতে দেরি হযেছে, যদিও চিঠিপত্রে আলাপ অনেকেব সঙ্গে আগেই হযেছিলো। তরুণ বয়সে কলকাতায় এসে যে ক'জন বন্ধুর সঙ্গে প্রায়ই দেখা করতাম তাঁদেব মধ্যে ছিলেন কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় গোপাল ভৌমিক নাবায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নবেন্দু ঘোষ বীরেন দাশ বণজিৎকুমাব সেন বিনয় ঘোষ বিমলচন্দ্র ঘোষ মনীন্দ্র বায় শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায সুশীল বায। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' কবিতাটি 'কবিতা' পত্রিকায় যে-বছর প্রথম বেরুলো সম্ভবত সে বছবেই কলকাতায় তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ হযেছিলো।

১৯৩৮ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত ঢাকায় প্রগতি লেখক সংঘেব প্রতিষ্ঠা ও সংগঠনের কাজে আমি সোমেন চন্দ অচ্যুত গোস্বামী অমৃতকুমাব দত্ত ও বণেশ দাশগুপ্তর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলাম। সবলানন্দ সেন (পরে যুগান্তবের সাংবাদিক) এবং আরো কেউ কেউ অল্পকাল বাদেই আমাদের মিলিত উদ্যোগের সঙ্গে তাঁদেব প্রয়াসকে যুক্ত কবেন। আমাদের মধ্যে তরুণতম ছিলেন সোমেন চন্দ। প্রগতি লেখক সংঘেব প্রথম অধিবেশন তাঁর বাড়িতেই হযেছিলো। পরে স্থির হয় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সাপ্তাহিক অধিবেশন হবে। অচ্যুত গোস্বামী তখন ঢাকায এসে একা থাকতেন তাঁব নারিন্দার ভাড়াবাড়িতে, বাড়ির অন্য সবাই ছিলেন ফবিদপুরে। অচ্যুত তাঁব বাড়িতেই প্রগতি লেখক সংঘের সাপ্তাহিক সভার আযোজন কবেন। ঘবটা ছিল সুন্দর, দোতলায, আলোহাওয়া ছিল। সবাই সেখানে খুব উৎসাহের সঙ্গে প্রগতি সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করতাম। লেখার দিক থেকে সোমেন চন্দের গল্প এবং অচ্যুত গোস্বামীব প্রবন্ধ আমাদের বিশেষ আকর্ষণের বিষয় ছিলো। এই সময় দু'টি বিদেশি সঙ্কলনগ্রন্থ আমাদের বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলো। একটি আমেরিকা থেকে প্রকাশিত গল্প কবিতা প্রবন্ধ ও রিপোর্টাজ-এর সঙ্কলন 'লেফট রিভিয়্যু' এবং অপরটি জন লেমান সম্পাদিত গ্রেট বৃটেনে ছাপা 'পেনগুইন নিউ রাইটিং ইন ইউরোপ'। প্রগতি লেখক হিসেবে আমরা যে-ধরনের লিখতে চেষ্টা করছিলাম এই দু'টি সঙ্কলনগ্রন্থের অনেক রচনায় তার যেন একটি সুষ্ঠু শিল্পসম্মত রূপের আভাস পাওয়া গেল।

এই সঙ্কলন দু'টির মধ্য দিয়ে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, পশ্চিম ইউরোপ, সোভিয়েত রাশিয়া, চীন প্রভৃতি অনেক দেশের প্রবীণ ও নবীন লেখক আমাদের আপনজন হয়ে উঠলেন। দেশবিদেশের লেখকের স্বাধীন সমাজচিন্তার বৃহত্তর পরিধিতে আমরা এই প্রথম মনেপ্রাণে একটি আন্তর্জাতিক ঐক্য অনুভব করলাম। এর আগেই অবশ্য স্পেনের গৃহযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। স্পেনে গণতন্ত্রীদের পতন হওয়ায় এবং হিটলার মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট তাণ্ডব অনেক পরিমাণে সম্প্রসাবিত হওয়ায় আশঙ্কা হলো অচিরেই যুদ্ধ বেঁধে উঠবে। ইউরোপে যুদ্ধ বাঁধলে ক্রমশ তা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়তে পারে এই আশঙ্কা দেশবিদেশের মনীষীরা প্রকাশ করলেন। রোলা ও রবীন্দ্রনাথের ফ্যাসিস্টবিরোধী উচ্চারণে আমরা তখন দারুণভাবে অভিভূত হয়েছিলাম।

ঢাকা প্রগতি লেখক সঙ্ঘের বন্ধুদের মধ্যে অচ্যুত গোস্বামী ছিলেন সবচাইতে আপনভোলা ব্যক্তি, কিছুটা অগোছালো অথচ প্রত্যয়দৃঢ়। ফরিদপুব থেকে তিনি ঢাকায় এলেন কুড়ি-একুশ বছব বয়সে এবং অচিরেই প্রগতি লেখক সংঘের উৎসাহী কর্মীতে পবিণত হলেন। ব্যবসা তাঁব স্বভাবধর্ম নয় অথচ কাপড়েব এবং মৎস্যচাষেব একাধিক প্রকল্পে যুদ্ধেব সময মাতৃদত্ত অর্থ বিনিযোগ করে তিনি বেশ কিছু টাকাকড়ি নষ্ট করেছিলেন। সোমেন চন্দের মৃত্যুর পরবর্তীকালে অচ্যুত ২০ নম্বর কোর্ট হাউস স্ট্রিটেব একটি দ্বিতল বাড়িতে বাস কবতেন একাই একটি ঘব নিযে। ওই ঘরটিই ছিল সাপ্তাহিক প্রতিরোধ পত্রিকাব অফিস, আমি এবং অচ্যুতই ছিলাম পত্রিকাটিব যুগ্ম সম্পাদক। সত্তর দশকে সোভিযেত লেখক মিট্রখিনেব (Mitrokhin) 'সোভিযেট ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ' নামের বইটিতে পত্রিকাটির নাম এবং সম্পাদকদ্বয়েব নামের উল্লেখ থাকায বোঝা যায় চল্লিশ দশকের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সঙ্কটের পটভূমিকায় সংস্কৃতি আন্দোলনে প্রতিরোধ পত্রিকার প্রকাশও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলেই গ্রন্থকারেব কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। সে যাই হোক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে, সোভিয়েত রাশিয়া ফ্যাসিস্ট নাজি বাহিনীর বিরুদ্ধে দারুণ রক্তক্ষযী প্রতিরোধ সংগ্রামে নিরত এবং আমাদের দেশেও বৃটিশ শাসনের শৃঙ্খলমোচনের জন্যে শুরু হয়েছে মরণপণ প্রবল আন্দোলন, ঠিক তখনই প্রকাশিত হযেছিলো প্রতিরোধ পত্রিকা। ছিল তরুণ বয়স, পত্রিকাটিকে ঘিরে আমাদের ছিল প্রবল উদ্দীপনা। প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রতিরোধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বন্ধুরা মিলিত হতাম অচ্যুতব ঘরে এবং কে কোন্ বিষয়ে লিখবেন, সম্পাদকীয় কি হবে, কলকাতার বিখ্যাত লেখকদের কাছ থেকে লেখা সংগ্রহের দায়িত্ব কখন কাকে দেয়া হবে এইসব বিষয়ে আলোচনা হতো। প্রতিরোধ পত্রিকার কোনো আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না, চাঁদা তুলে এবং সামান্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে চলতো।

দেশবিভাগের আগের তিনটি বছর আমার লেখায় জোয়ার এসেছিলো। এই সময় সোনার বাংলার সম্পাদক আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করলে প্রফুল্লকুমার গুহ পত্রিকার সব কাজকর্ম দেখাশোনা করছিলেন। ওই সময় আমার বেশ কিছু গদ্যরচনা নিয়মিত বেরোয়, পরে তার কিছু কিছু আমার সময় ও সাহিত্য (১৯৫১) গদ্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রফুল্লবাবু ছিলেন মার্জিত রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি এবং মনেপ্রাণে সাংস্কৃতিক কর্মী।

সোনার বাংলার সীমিত ভাণ্ডার থেকে আমার মতো অতি তরুণ লেখককেও সাধ্যমত দক্ষিণা দিয়ে লেখায় উৎসাহ দিতেন। কলকাতায় থাকতেন অনিলচন্দ্র ঘোষ, এখন যিনি কলকাতায় প্রচার সমবায় নামের প্রচার প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা। অনিলবাবু সে সময় কলকাতার প্রতিনিধি হিসেবে সোনার বাংলা পত্রিকার প্রচার ও প্রসারে সাহায্য করেছিলেন। সম্ভবত চল্লিশ দশকের শেষের দিকে কলকাতায় অনিলবাবুব সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। পবে সে পরিচয় হৃদ্য সম্পর্কে পরিণত হয়ে অদ্যাবধি অক্ষুণ্ন আছে। ১৯৪৮–এ দেশবিভাগের পরে কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঢাকায় এলে সোনার বাংলা অফিস প্রাঙ্গণে তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয় তারাশঙ্করের পঞ্চাশ বছর বয়সপূর্তি উপলক্ষে। পূর্ব পাকিস্তানেব মন্ত্রীদেব মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাবিবুল্লাহ্ বাহার। ঢাকার লেখক ও সাংবাদিকদেব মধ্যে ছিলেন আবু জাফর শামসুদ্দীন, মনোরম গুহঠাকুবতা, ত্রিপুরাশঙ্কব সেনশাস্ত্রী, রণেশ দাশগুপ্ত, অশোকমোহন রায় এবং আরো কেউ কেউ। পঞ্চাশ বছর বয়সপূর্তি উপলক্ষে ওই সময় তারাশঙ্করকে যে চিঠি পাঠিয়েছিলাম তার উত্তরে উনি একটি সুন্দর চিঠি আমাকে লিখেছিলেন।

যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি (১৯৩৭–১৯৪১) তখন অনুভব করা গেল রাজনীতির ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রবাদী চিন্তাধারা ছাত্রদের মধ্যে ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ছে। কযেকটি রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠন নতুন চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি সামনে রেখে কাজ শুরু করেছে। ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা খুব তরুণ বযসেই রাজবন্দী হযেছিলেন তাঁদের অনেকেই তিরিশ দশকেব মাঝামাঝি জেল থেকে ছাড়া পেযে নতুন ছাত্র আন্দোলনে শরিক হয়েছিলেন। প্রগতিশীল ছাত্র–আন্দোলনে কালীপদ গাঙ্গুলী, অজিত রায় বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতেই বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৯৩৭–এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা কী একটা দাবির ভিত্তিতে সঙ্ঘবদ্ধভাবে ধর্মঘট ঘোষণা করেছিলো। মনে পড়ে অন্য বহু ছাত্রের সঙ্গে একটি মিছিল কবে সমস্ত ঢাকা শহরে পথপরিক্রমা সাঙ্গ কবেছিলাম। আমি এই সময়ে লিখতে শুরু করেছি এবং ঢাকা ও কলকাতার বেশ কিছু পত্রপত্রিকায় আমার কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। রাজনীতি নিয়ে আমি খুব মাথা ঘামাই নি কেননা বাজনীতিব মঞ্চ থেকে বক্তৃতা দেয়া এবং খুব অ্যাজিটেশনাল কথাবার্তা বলা আমার স্বভাবের সঙ্গে মিলতো না। তাছাড়া ববাবরই ভেবে এসেছি নিজে একজন ভালো লেখক হবাব চেষ্টা কববো, রাজনৈতিক কর্মী হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি তখন রাজনৈতিক দলের দাদাদের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় চুকে গিয়েছে, হঠাৎ কোথাও দেখা–সাক্ষাৎ হলে ভদ্রতা–বিনিময় ছাড়া অন্য কোনো কাজের কথাবার্তা হয় নি। ঢাকার দীর্ঘকালীন সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক আন্দোলনের পরিসমাপ্তির পর তখন গণমুখী রাজনীতির নতুন চেতনা ছাত্রসমাজে ও রাজনৈতিক দলের কর্মীদের কর্মভাবনাকে প্রভাবিত করেছে। সুতরাং কে কোন্ পথে পা বাড়াবেন তাই নিয়ে নতুন করে যুক্তি–তর্ক–গল্পের মহড়া চলছিলো। ১৯৩৭–৩৮–এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েব তিনটি আবাসিক হল ছিল যেখানে ছাত্ররা থাকতেন। হল বা ছাত্রাবাস তিনটিতে থাকা–খাওয়ার ব্যাপারে ছাত্রপ্রতিনিধিরাই সব কিছু স্থির করতেন। ঢাকা হল ও জগন্নাথ হলে থাকতেন হিন্দু ছাত্ররা এবং সলিমুল্লাহ হলে

থাকতেন মুসলিম ছাত্ররা। যে সব ছাত্রের পরিবারের লোকরা ঢাকায় থাকতেন না সেইসব বহিরাগত ছাত্ররাই এইসব হলে থাকতেন। ঢাকায় বাড়িঘর থাকলেও অনেক সময় পড়াশোনা ও গবেষণার সুবিধের জন্যে কেউ কেউ হলেই বসবাস করতেন। বিনয়রঞ্জন গুপ্ত (পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব) এবং সমর গুহ (পরবর্তীকালে সংসদ সদস্য) তখন ঢাকা হলের ছাত্র এবং আমার সঙ্গে ওই সময় থেকেই তাঁদের পরিচয়। আমি ঢাকা হলের সদস্য ছিলাম কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্রকেই কোনো না কোনো হলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে এটাই নিয়ম ছিলো। হলগুলোতে প্রতি বছর ভোটের মাধ্যমে কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হতো গণতান্ত্রিক নিয়মে। তারপর নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে খেলাধুলো, নাট্যানুষ্ঠান, পত্রিকা সম্পাদনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিভিন্ন দপ্তর বণ্টন করে দেয়া হতো। ১৯৩৮-এ যখন বি.এ ক্লাসেব ছাত্র তখন ঢাকা হলের শতদল পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়। তখন প্রভোস্ট ছিলেন ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ। বার্ষিকীর মুখবন্ধটি ইনি লিখে দিয়েছিলেন। ঐ বছরই তিনি উচ্চতর দায়িত্বভার নিয়ে বাঙ্গালোরে চলে যান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রজীবনে কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে আমাব আলাপ অল্প কিছুকালের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হয়েছিলো। এঁদেব মধ্যে দিলীপকুমার সেনগুপ্ত কুমিল্লা থেকে ঢাকায় এসে এম.এ পড়ছিলেন। বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, পবিমার্জিত রুচি। এম.এ পাস করবার কযেক বছর পর সম্ভবত ১৯৪৪-এ তিনি ঢাকা রেডিয়োতে যোগদান কবেন। এছাড়া তখন ওখানে ছিলেন সরল গুহ এবং উমা মজুমদার, উভয়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও ছাত্রী। আমার ডাক পড়েছিল রেডিয়োর পাক্ষিক সাহিত্যবাসরে অংশগ্রহণ করবার জন্যে। আর যাঁরা অংশগ্রহণ কবেছিলেন তাঁদের মধ্যে ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী কাজি মোতাহার হোসেন বজলুর রশিদের নাম মনে পড়ছে। বেশ কিছুকাল বেতারের ওই সাহিত্যবাসরের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। পরবর্তীকালে কলকাতায় যখন চলে আসি তখন আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রের বেতার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেও কোনো না কোনো সময়ে পুরনো বন্ধুদের রেডিয়োর কাজে নিযুক্ত থাকতে দেখেছি; সুকুমার রায় সরল গুহ দিলীপ সেনগুপ্ত যাঁদের অন্যতম। ঢাকা রেডিয়োতে অনুষ্ঠানসূচিতে অংশগ্রহণ করার সূত্রে আবো একজনকে খুব নিবিড়ভাবে কাছে পেয়েছিলাম, তিনি শিশু সাহিত্যের লেখক মনোরম গুহঠাকুরতা। ছেলেদের উপযোগী নানা ধরনের রচনায মনোরম বাবুর বেশ দক্ষতা ছিলো এবং তখনকার শিশুসাথী পত্রিকার তিনি একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও মনোরম বাবুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক সখ্যে পরিণত হয়েছিলো। সোনার বাংলা পত্রিকায়ও তিনি লিখতেন এবং ওই পত্রিকার অফিসে সকালে বা বিকেলের দিকে আমরা প্রায়ই মিলিত হতাম, সাহিত্য নিয়ে ও লেখালেখির বিষয়ে আলাপ করতাম। সোনার বাংলার কর্মাধ্যক্ষ প্রফুল্লকুমার গুহ ওই সময় উপস্থিত থাকতেন এবং আলোচনায় অংশ নিতেন, চায়েরও ব্যবস্থা রাখতেন। সোমেন চন্দের মৃত্যুর পর প্রতিরোধ ও ক্রান্তি প্রকাশের সময় মনোরম বাবু প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সঙ্গে রীতিমতো জড়িয়ে পড়েন এবং নিজ আচরণের গুণে আমাকে এবং আমার তরুণ লেখক বন্ধুদের আপনার করে

নিয়েছিলেন। ১৯৪৭-এর ক্রান্তি সঙ্কলনে কৃষণচন্দরের 'তিন গুণ্ডা'র তিনি অনুবাদ করেছিলেন। পরবর্তীকালে পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে যখন পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মে লিপ্ত ছিলাম তখন মনোরমবাবু মাসিক ও বার্ষিক শিশুসাথীর কাজকর্ম দেখছিলেন। ওই সময় তিনি ছোটদের জন্যে লিখতে আমাকে অনুরোধ করেন এবং ছোটদের জন্যে লেখা আমার প্রথম কবিতা 'রাজাব অসুখ' বার্ষিক শিশুসাথীতে প্রকাশিত হয়। তারপর কয়েক বছব বার্ষিক শিশুসাথীতে ছোটদেব জন্যে লিখেছি। ইন্দিরা দেবী সম্পাদিত ছোটদের বার্ষিকী 'সাত সমুদ্দুর'-এ ওই সময় থেকে বেশ কয়েক বছর লিখেছিলাম।

চল্লিশ দশকে কলকাতায় প্রায়ই আসতাম। ওই সময় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নবেন্দু ঘোষ এবং রণজিৎ কুমার সেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া সম্ভব হয়েছিলো। এরা তিনজনই তখন কথাসাহিত্যিক হিসেবে বেশ পবিচিত হযে উঠেছিলেন। ঢাকা থেকে প্রকাশিত ক্রান্তি সঙ্কলনগ্রন্থে এঁদেব সকলের লেখাই ছাপা সম্ভব হয়েছিলো। ঢাকা থেকে এসে এই সময় মাসিক বসুমতীর বৌবাজারস্থিত অফিসেও যেতাম, ওই সময প্রাবন্ধিক বিনয় ঘোষ ও কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ মাসিক বসুমতীতে কাজ করতেন। বিনয ঘোষ দৈনিক বসুমতীর সম্পাদকীয়ও লিখতেন। ছেলেবেলা থেকেই মাসিক বসুমতীকে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের কাগজ বলে জানতাম। কিন্তু বিনয়বাবুরা বসুমতীতে যোগদান করবার পর পত্রিকার চেহারা কিছুটা বদলায এবং আমার অনেক কবিতাও এই সময মাসিকে প্রকাশিত হযেছিল। বিনয়বাবু বা বিমলবাবু বেশি দিন বসুমতীতে ছিলেন না, পরবর্তীকালে প্রাণতোষ ঘটক পত্রিকার দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। বয়সে তরুণ হলেও তখনকার দিনে প্রাণতোষের রুচিজ্ঞান ও সজাগ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। সে কারণেই বসুমতীতে, মাসিক ও শারদীয়তে দীর্ঘকাল লেখালেখিতে যুক্ত থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হযেছিলো। মাসিক ও শারদীয় দৈনিক বসুমতীতে কবিতা ছাড়াও যেসব সাহিত্য বিষয়ক গদ্যবচনা প্রকাশিত হয়েছিলো সেগুলোর কিছু কিছু আমাব দু'টি প্রবন্ধ গ্রন্থে (সময় ও সাহিত্য; প্রকাশকাল ১৯৫১ এবং মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরকাল; প্রকাশকাল: ১৯৬৪) অন্তর্ভুক্ত করা হযেছিলো।

সংস্কৃতিকেন্দ্র : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছিলাম ১৯৩৭-এ এবং বেরিয়ে এলাম ১৯৪১-এ ঠিক নয়, ১৯৪২-এ, কেননা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্যে ঐ বছর আমাদেব পরীক্ষা অনেকটাই পিছিয়ে গিয়েছিলো। যেমন তখনকার যে-কোনো ছাত্র, তেমনি আমিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়ায় নিজের প্রথম যৌবনের সুস্থ অনুভূতিগুলোকে লালনের সুযোগ পেয়েছিলাম চার বছরের সময়সীমার মধ্যে। এরপরেও বেশ কয়েকবার ঢুকেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে। কিন্তু তখন আমি আমন্ত্রিত অভ্যাগতদের অনেকজনের একজন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বুদ্ধ ছাত্রসমাজের কাছে একজন প্রাক্তন ছাত্র মাত্র।

তখনই ছোঁয়া লেগেছে বয়স্কমন্যতার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযে ভর্তি হবার আগে থেকেই কিঞ্চিৎ লেখালেখির ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলাম। খেলাধুলো, নাটক, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি বিষয়ে নানা চর্চার আগ্রহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের ছাত্রসমাজের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপকতা লাভ করেছিলো। আমি এসব বিষয়ে আগ্রহী ছিলাম কিন্তু এসব বিষয়ে অংশগ্রহণের কোনো প্রবণতা আমার মধ্যে ছিলো না। অর্থাৎ, আমি আরো বহু ছাত্রেব মতোই শ্রোতা বা দর্শক হিসেবেই থাকতে পছন্দ করতাম এবং যেসব ছাত্রবন্ধু খেলাধুলো নাটক অভিনয় বিতর্ক বা আবৃত্তি বিষযে পারদর্শিতা দেখাতে পেবেছিলেন তাঁদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে কখনো কুণ্ঠাবোধ করি নি।

কিন্তু সাহিত্যের ব্যাপাবে আমার নিজের একটা জায়গা আছে বলে আমি বিশ্বাস করতাম। এইদিক থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযেব পবিবেশ চার বছর আমার সাহিত্যচর্চার খুব সহায়ক হয়েছিলো। বিশ্ববিদ্যালযেব তৎকালীন উপাচার্য শ্রদ্ধেয় রমেশচন্দ্র মজুমদারের নামেব সঙ্গে ইতিহাসপাঠের সূত্রে ছেলেবেলা থেকেই পরিচিত ছিলাম; কিন্তু অন্য কযেকটি নামেব সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটেছিলো সাহিত্যচর্চার সূত্রেই। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু (আমাদেব বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁকে সচরাচব উল্লেখ করা হতো প্রফেসর বোস বলে) বিশ্বনন্দিত বিজ্ঞানী এই খবরটা সকলেরই জানা ছিলো; কিন্তু তখনকার দিনে হয়তো এটা সকলের জানা ছিলো না যে তিনি একজন সাহিত্যরসিক এবং কাব্যপ্রেমিক। আমি এই খববটা প্রথম জানতে পাবি অন্যসূত্রে। কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'অর্কেস্ট্রা' উৎসর্গ কবেছিলেন 'সত্যেন্দ্রনাথ বসুব করকমলে'। সেই থেকেই আমার ধারণা হযেছিলো এই মনীষী যেমন বিজ্ঞানেব ছাত্র তেমনি সাহিত্যেরও ছাত্র। পববর্তীকালে আমাদের আযোজিত দু'একটি সাহিত্যসভায় তাঁকে সভাপতি করে নিযে আসতে পেরেছিলাম। সাহিত্য-বিষযক বক্তৃতায তাঁর কাছে যা শুনেছি তাতে সাহিত্যের বিষযে এই বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানীর অধিকারের ব্যাপ্তি উপলব্ধি করে বিস্মিত হয়েছিলাম।

স্পেশাল বাংলা ক্লাসে প্রথম বছরেই যাঁর মুখোমুখি হলাম তিনি আজকেব বাংলা সাহিত্যের একজন ব্যক্তিত্ব—মোহিতলাল মজুমদার। সাহিত্যেব একজন জিজ্ঞাসু ছাত্র হিসেবে আমি দু'বছর তাঁর কাছে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম এবং এই দু'বছরের মধ্যেই প্রধানত তাঁর বক্তৃতা ও আলোচনা আমাব সাহিত্যবিচারের পরিধি ও রসবোধকে ব্যাপকতর কবতে যথেষ্ট সাহায্য কবেছিলো। বস্তুত সৎসাহিত্যের এই স্রষ্টার কাছেই মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে গভীরভাবে পড়বাব ও ভাবিত হবার প্রেরণা প্রথম লাভ করেছিলাম। মোহিতলাল যখন ক্লাসে পড়াতেন তখন ছাত্রছাত্রীরা একাগ্রচিত্তে শুনতেন, বেলাইনের ছাত্ররাও অর্থাৎ কমার্স-এর ছাত্র বিজ্ঞানের ছাত্ররাও অনেক সময় এসে বসতেন নিঃশব্দে পেছনের বেঞ্চিতে, তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্যে। তিনি বলে যেতেন, মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমরা শুনতাম। কিন্তু অনেক সময় এই মুগ্ধ হওয়ার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উবে যেত যখন তিনি চটে যেতেন এবং গালাগাল করতেন। ভদ্র ভাষায় যে কতো তীব্র ও তীক্ষ্ণ ভঙ্গিতে আক্রমণ করা যায় এই বিদগ্ধ কবি সমালোচকের রসনানিঃসৃত উক্তিসমূহ থেকেই তা বিলক্ষণ উপলব্ধি করা যেত। ১৯৩৭-এ পাটনায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে মোহিতলাল সাহিত্য শাখার

সভাপতিরূপে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার সমালোচনা করে আমি ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক 'শান্তি' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। ঘটনাক্রমে ঐ রচনাটি মোহিতলালের নজরে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো তাঁর গালাগাল ও আক্রমণ। এই সময় আমার বেশ কিছু কবিতা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত মাসিক 'পরিচয়' এবং বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'কবিতা'য় প্রকাশিত হয়েছিলো। বুদ্ধদেব গোষ্ঠীর সাহিত্যকে মোহিতলাল সর্বদাই উল্লেখ করতেন 'অতি–আধুনিক সাহিত্য' বলে এবং অত্যন্ত জোরালো ভাষায় এই সাহিত্যকে নস্যাৎ করবাব ব্যাপারে তিনি কখনো ক্লান্তি অনুভব করেন নি। আমি তখন ছিলাম তাঁব প্রত্যক্ষ ছাত্র, প্রতিদিন তাঁব ক্লাস করছি, বক্তৃতা শুনছি, অথচ আমি যে আবার ছাপার অক্ষবে স্বনামে পাটনা সাহিত্য সম্মেলনে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতার সমালোচনা লিখব এটা তাঁর কল্পনাব বাইরে ছিলো। কিন্তু ক্রোধান্ধ হলেও মোহিতলালের রুচিজ্ঞান ছিলো, আমাকে ক্লাসে বা ক্লাসেব বাইরে নাম ধবে তিনি কখনো গালাগাল করেন নি; তাঁর আক্রমণটা ছিলো মূলত 'অতি আধুনিক' (তাঁব ভাষায) সাহিত্যের বিরুদ্ধে। ঢাকা ইন্টারমিডিযেট কলেজে যখন পড়তাম তখন কাজি আবদুল ওদুদ আমাদের বাংলা পড়াতেন। পাটনা সম্মেলন সংক্রান্ত আমার লেখাটি তিনিও দেখেছিলেন। আমার সঙ্গে দেখা হতেই বললেন : 'কিরণশঙ্কর, একি ব্যাপার কবেছ। জানো, মোহিতবাবু তোমাকে বাংলায় ফেল করিয়ে দিতে পারেন?' আমি তখন তাঁকে জানিযেছিলাম, এই ধরনেব সঙ্কীর্ণতা মোহিতলালের নেই বলেই আমাব বিশ্বাস, কেননা, সাহিত্য–বিচাবেব ক্ষেত্রে অধ্যাপক ও ছাত্রের দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন হলেও ছাত্র হিসেবে আমি তাঁর স্নেহভাজন, তিনি কখনোই আমার ক্ষতি করবেন না। আমার এই ধারণা যে ঠিক তার পরিচয় পেযেছিলাম স্বল্পকাল পরেই। মাসিক 'পরিচয' পত্রিকায আমার 'গলিতনখ' নামের একটি কবিতা পড়ে আমার কবিশক্তি সম্পর্কে তাঁব আস্থা জেগেছিল, পরে আমাকে ডেকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। তখন থেকেই যাতায়াত শুরু কবে দিলাম তাঁব নীলক্ষেতের বাসভবনে। প্রায়ই দেখতাম তিনি বাগানে গোলাপফুলের পবিচর্যায ব্যস্ত। সামনেব ঘবে বসে থাকতাম, কাজ শেষ করে কবি এসে আসন গ্রহণ করতেন অল্পক্ষণ বাদেই। একজন ডাক্তারকেও দেখতাম মাঝে–মাঝে, মোহিতলালকে তিনি ইনজেকশন দিয়ে যেতেন। অনেক রাত পর্যন্ত আমি এবং আরো অনেকেই মোহিতলালের সাহিত্য আলোচনায় আবিষ্ট হয়ে থাকতাম, তারপর নির্জন রমনার বৃক্ষশোভিত পিচঢালা পথ দিয়ে এক ধরনের সজীব অনুভবকে হৃদযে বহন কবে বাড়িতে ফিরতাম। ১৯৩৮–এ ঢাকা হল বার্ষিকী 'শতদল' পত্রিকার সম্পাদনার দাযিত্ব আমাকে দেয়া হল। মোহিতলাল ছিলেন উপদেষ্টামণ্ডলীর একজন। আমি তাঁর কাছ থেকে উপদেশ ইত্যাদি গ্রহণের পরিবর্তে 'শতদল' পত্রিকা ছাপিয়ে বের করে একখণ্ড নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। আমার মতো উঠতি তরুণ কবির এই ঔদ্ধত্যে মোহিতলাল বিলক্ষণ কুপিত হয়েছিলেন, কিন্তু পরে বইটির বৃহৎ সম্পাদকীয় পড়ে সম্ভবত আমার কিঞ্চিৎ ভাষাজ্ঞান যে আয়ত্তাধীন হয়েছে এটা লক্ষ্য করে আমার আচরণকে ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখতে রাজি হয়েছিলেন। মোহিতলালের কাছে ভর্ৎসনা যা পেয়েছি তা সামান্য, এখন তার কিছুই মনে নেই, কিন্তু সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে যে শিক্ষালাভ করেছি তা অসামান্য।

ঢাকা ছাড়বার পর একবারমাত্র তাঁকে দেখেছিলাম। ১৯৫০-এ কোনো এক সময় আকাশবাণীর সাহিত্যবাসরে কবিতাপাঠের জন্য আমন্ত্রিত হয়ে রেডিও অফিসে গিয়ে দেখি মোহিতলাল ফিরে যাচ্ছেন। দূর থেকে দেখলাম, কোনো কথা হলো না। তখন ভাবতেও পারি নি এই-ই শেষ দেখা। ১৯৫২-এ উদরান্নের সংস্থানে আমি যখন কোচবিহারে সবকারি কাজে লিপ্ত সেই সময় তাঁর মৃত্যুসংবাদ খবর কাগজে পড়লাম। মনে পড়ছে ১৯৫৩-এ কবি অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যেব উদ্যোগে বঙ্গবাসী কলেজ হোস্টেলে অনুষ্ঠিত মোহিতলালের স্মরণসভায় আমি তাঁর 'মোহ মুদ্‌গর' কবিতাটি পাঠ করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলাম।

সুশীলকুমার দে অল্পদিন আমাদের বাংলা পড়িয়েছিলেন। তিনি ছিলেন তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েব সংস্কৃত বিভাগের প্রধান, অল্পদিনের জন্যে কেন তিনি আমাদেব ক্লাস নিতে এসেছিলেন এখন মনেও পড়ে না। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলা ছন্দ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ কবেছিলাম তাঁর কাছ থেকে। 'অমাযামিনীর গভীব আঁধারে চুপি চুপি এলো প্রিয়া'—কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীব এই পঙ্‌ক্তিটি ব্ল্যাকবোর্ড-এ লিখে তিনি বারবার পড়ে আমাদের ছন্দশাস্ত্র সম্পর্কে যেভাবে বুঝিযে দিযেছিলেন তা এখনও মনে আছে। সুশীলকুমার শুধু গবেষকই ছিলেন না, নিজে একজন কবিও ছিলেন। চলনে-বলনে তিনি ছিলেন অ্যাবিস্টক্র্যাট, পরিণত বয়সেও যেন প্রেমিকের মতো ছিলো তাঁব চোখের দৃষ্টি। অত্যন্ত পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন তিনি, তাঁর ইংবেজিগ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যের মূল ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস নিযে অনার্স-এব ছাত্রদের নাড়া-চাড়া কবতেও দেখেছি। কিন্তু আমি চুপি চুপি পড়েছিলাম তাঁর কাব্যগ্রন্থ দু'টি—'প্রাক্তনী' ও 'লীলায়িত'; সনেট রচনায তাঁর দক্ষতা আমার মনে গভীর বেখাপাত করেছিল। সে-কাবণেই আমার ছাত্রাবস্থায় ১৯৩৮-এর ডিসেম্বরে কবি জীবনানন্দ দাশের ভূমিকা সম্বলিত হয়ে যখন আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্বপ্ন-কামনা' প্রকাশিত হলো তখন এক কপি বই নিয়ে দুরু-দুরু বক্ষে উপস্থিত হলাম তাঁর সমীপে। বইটি তাঁর হাতে দিয়ে অনুবোধ করলাম তিনি যেন সময় করে অনুগ্রহ করে একবার পড়েন এবং কী রকম লাগলো জানান। বইটি হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে সুশীল দে বললেন : তোমরা নবীনবা তো আমাদেব পিঁজরাপোলে পাঠাতে চাও, আমাদের মতামতের আবার মূল্য কি। আমি তখন সবিনয়ে জানিয়েছিলাম যে প্রবীণ-নবীনের চিন্তাধারার সংঘাত চিরকালীন ব্যাপাব, কিন্তু সংস্কৃতির যা-কিছু শ্রেষ্ঠ জিনিস থাকে তা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রবীণদের হাত থেকে নবীনদের হাতে আসে, কখনো পুরোপুরি বর্জিত বা বিনষ্ট হয় না। আমি যে তাঁর কাব্যগ্রন্থ দু'টি পড়েছি একথা জানাতে তিনি খুশি হযেছিলেন। আমার কবিতার বইটি তাঁকে দেবার পর অনেকদিন তাঁর কাছে আর যেতে পাবি নি। একদিন সংস্কৃত অনার্স ক্লাসের আমার একজন ছাত্রবন্ধু এসে জানালেন তাঁদের ক্লাসে আমার কাব্যগ্রন্থ থেকে অধ্যাপক সুশীল দে মহাশয় 'হে ললিতা, ফেরাও নয়ন' কবিতাটি ছাত্রদের পড়ে শুনিয়েছেন। বলা বাহুল্য, এই ঘটনাটি আমার মনে গভীর রেখাপাত করে। সুশীল দে মহাশয় যে অত্যন্ত সুপণ্ডিত ও কৃতী অধ্যাপকই শুধু ছিলেন না, তিনি যে একজন উদারহৃদয় রসগ্রাহীও ছিলেন এই ঘটনাটি থেকেই আমি তা উপলব্ধি

করেছিলাম।

আমি যখন আরমানিটোলা গভর্নমেন্ট স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র তখন আমাদের ইংরেজি শিক্ষক মন্মথবাবু একদিন একটি যুবককে নিয়ে ক্লাসে ঢুকলেন ও পরিচয় করিয়ে দিলেন: ইনি পল্লীকবি জসিমউদ্‌দীন। 'কবর' কবিতাটি সেই বছর আমাদের পাঠ্য ছিল, সুতরাং তার রচয়িতাকে হঠাৎ সামনে দেখে কিশোরসুলভ বিস্ময় জেগেছিলো। অনেক পরে যখন বি.এ ক্লাসে পড়ি তখন আবার দেখলাম জসিমউদ্‌দীন এসেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক হয়ে। বাংলা ক্লাসের ছাত্রদের আয়ত্তে রাখা তাঁর পক্ষে প্রায়ই মুশকিলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতো; পল্লীকবি হিসেবে চিহ্নিত করে শহুরে ছাত্ররা তাঁকে যেন তেমন আমল দিতে চাইতো না। নানা সৃষ্টিছাড়া প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ তুলে দুষ্টু ছাত্ররা প্রায়ই মজা করতো, আসল পড়া তেমন অগ্রসর হতে পারতো না। বিশ্ববিদ্যালযেব বাইরে আমি জসিমউদ্‌দীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিলাম কেননা তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় রূপলাল হাউস থেকে প্রকাশিত মাসিক শান্তি পত্রিকার সহ–সম্পাদকের দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়েছিলো এবং পল্লীকবিব বেশ কয়েকটি কবিতা তখন শান্তিতে ছাপা হয়েছিলো। এই সময় কবি থাকতেন ধানমন্ডিতে, পায়ে হেঁটে প্রায় চার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে মাঝে–মাঝে যেতাম তাঁব বাসায়। তখন বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত কবিতা ত্রৈমাসিকের কয়েকটি সংখ্যায় আমার কবিতা প্রকাশিত হওয়ায় আধুনিক কবি হিসেবে পরিচিত ঘটেছিলো। জসিমউদ্‌দীনেব সঙ্গে যখন কবিতা নিয়ে কথাবার্তা হতো তখন তিনি আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করতেন যে বুদ্ধদেব বসুদের কবিতা খাঁটি বাংলা কবিতা নয়, কেননা সেগুলো পাশ্চাত্য প্রভাবে দুষ্ট এবং তাঁর নিজের লেখা কবিতাগুলোই গ্রামবাংলার জীবনকে রূপ দিয়েছে, অতএব তা খাঁটি বাংলা কবিতা। দেশবিভাগের পরবর্তীকালে লোকসংস্কৃতির একজন বার্তাবহরূপে কবি জসিমউদ্‌দীন যথেষ্ট মর্যাদা লাভ করে পূর্ববঙ্গে সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা সরকারি আসন অলঙ্কৃত কবেছেন। এই সূত্রে বিদেশ ভ্রমণও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো। ১৯৬৮–এ তিনি কলকাতায এলে তাঁকে সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে কলকাতা করপোরেশন যে জনসভাব আয়োজন করেন সেখানেই কবির সঙ্গে শেষ দেখা। কবি জসিমউদ্‌দীনের জন্ম সাল ১৯০১, তাঁব কাছেই জেনেছিলাম।

এম.এ ক্লাসে যখন ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়ছি তখন আমাদের পড়াতেন অধ্যাপক প্রফুল্লকুমার গুহ। ছাত্রজীবনে শেক্সপীয়র সম্পর্কে যতোটা জানতে পেবেছিলাম তার জন্য এই প্রখ্যাত অধ্যাপকেব কাছে আমাব মতো অনেক ছাত্রই ঋণী। শেক্সপীয়রের কালজয়ী সাহিত্যকে প্রফুল্লকুমার যেন সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন, এমন ঘবোয়া পরিবেশ সৃষ্টি কবে তন্ময়ভাবে পড়াতেন যে ছাত্রদের আর অমনোযোগী হবার উপায় থাকতো না। সবচেয়ে ভালো লেগেছিল তিনি যখন পড়িয়েছিলেন 'এ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা' নাটকটি। তার পড়াবার গুণে এই নাটকটির প্রতিটি অঙ্ক, প্রতিটি দৃশ্য, এমন কি প্রতিটি স্তবকের সাহিত্যরস আমাদের মতো অনেক অর্বাচীন ছাত্রেরই হৃদয়ের গভীরে সঞ্চারিত হয়েছিল। আর ছাত্রছাত্রীদের জন্যে গভীর স্নেহ ও মমতা তাঁর হৃদয়ের মধ্যেই ছিল, প্রতিটি জিজ্ঞাসু ছাত্রকেই তিনি সযত্নে পড়াতেন, নানা নির্দেশ দিয়ে সাহায্য করতেন। প্রসঙ্গত একটি

পরবর্তীকালের ঘটনার উল্লেখ করি। আমার দুই ভগ্নী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ পাস করেছিলেন কিন্তু তখন তাদের আর এম.এ পড়ার সুযোগ হয় নি। পঞ্চাশ দশকে যখন পশ্চিমবঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন হলো এবং অধ্যাপক গুহ ইংরেজি বিভাগের দায়িত্ব নিলেন তখন তার কাছে এম.এ পড়বার জন্যই আমার ভগ্নীদ্বয় বহু বছর বাদে আবার ছাত্রী হলেন, যদিও তাব বহুকাল আগে থেকেই তারা পুরোপুরি সংসারী। পবে দু'জনেই দু'টি কলেজের অধ্যাপিকা নিযুক্ত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ট্যুটরিয়াল ক্লাস করতে হতো অধ্যাপক গুহর কাছে। এই সময বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে একটি ঘটনার কথা তাঁব কাছে শুনেছিলাম। বুদ্ধদেব বসু যেবার পরীক্ষা দেন সেবার একটি প্রশ্ন ছিল শেক্সপীয়রেব 'হেনরী দি ফোর্থ' থেকে ফলস্টাফ চবিত্রটির প্রত্যাখ্যান (Rejection of Falstaff) বিষয়ে। অধ্যাপক গুহ এই বিষযে যেভাবে ছাত্রদের পড়িয়ে দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব ফলস্টাফ চবিত্রটি সম্পর্কে প্রশ্নপত্রেব উত্তর লিখতে গিযে মোটেই সেই ব্যাখ্যা আরোপ কবেন নি, বুদ্ধদেব সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাখ্যায় প্রশ্নটির উত্তর দিযেছিলেন। অন্য অধ্যাপক হলে কী হতো জানি না, কিন্তু অধ্যাপক গুহ সেদিন ঐ প্রশ্নটাব জন্যে সর্বোচ্চ নম্বর কিন্তু বুদ্ধদেবকেই দিয়েছিলেন। আমাকে বলেছিলেন: 'এতো ভালো ইংবেজি, এতো সুন্দর যুক্তি যে, সর্বোচ্চ নম্বব না দিযে পারলাম না'। এই ঘটনাব কথা পরে আমি বুদ্ধদেব বসুব কাছেও উল্লেখ করেছিলাম। প্রাক্তন ছাত্রদের প্রতি অধ্যাপক গুহ যে কতটা স্নেহপ্রবণ ছিলেন তার সমর্থনে আর একটি ঘটনাব উল্লেখ করি। ১৯৬৫-এ আমাব দ্বিতীয় সমালোচনাগ্রন্থ 'মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তবকাল' রূপা অ্যান্ড কোম্পানি থেকে প্রকাশিত হয়। 'রবীন্দ্রভারতী' পত্রিকায় এই বইটির একটি দীর্ঘ সমালোচনা লিখেছিলেন ডক্টর অরবিন্দ পোদ্দার। সেটি অধ্যাপক গুহব নজরে পড়তেই আমার দিদির বাড়িতে ফোন করে তিনি আমার খোঁজখবর নিয়েছিলেন। আমার পক্ষে দুঃখের বিষয় এই যে তাঁর জীবদ্দশায় শেষের দিকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ বাখার আমি আর তেমন সুযোগ পাই নি। এমন কি ১৯৬৫-তে কলকাতার শিবানন্দ হলে রামকৃষ্ণ মিশন ইন্স্টিটিউট অব কালচার আয়োজিত তাঁর শেক্সপীয়ব বিষয়ক প্রদত্ত বক্তৃতাবলির অল্প কয়েকটি বক্তৃতাই শুনতে পেবেছিলাম, ইচ্ছা থাকলেও সময়াভাবে সব বক্তৃতা শুনতে যেতে পারি নি।

যখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, বুদ্ধদেব বসু কলকাতার রিপন কলেজে (পরে সুবেন্দ্রনাথ কলেজ) অধ্যাপনা কবেছেন এবং সেই সঙ্গে ত্রৈমাসিক 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদনাও চলছে। তিনি ছুটিতে আসতেন ঢাকায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনতিদূরে শ্রীযুক্তা প্রতিভা বসুর পিত্রালযে আমি এবং আরো কেউ-কেউ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতুম। তরুণ উদ্যোগী আমরা, তখন তাঁর সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকা নিযে আমাদের মতো স্বল্পসংখ্যক কবিতা অনুরাগীব মধ্যে চলতো কাব্যবিষয়ক আলোচনা, বিতর্ক, হৈহৈ ব্যাপার। তখন জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত, মনীশ ঘটক, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রভৃতির কবিতায় তাজা যৌবনের চিহ্ন সুস্পষ্ট : আমরা দারুণ অভিভূত ছিলাম। মনে পড়ছে তখন ঢাকায় বুড়িগঙ্গা তীরে বাকল্যাণ্ড বাঁধের ওপর নবাববাড়ির পেছনে অপেক্ষাকৃত নির্জন জায়গায় গোল হয়ে বসে গভীর রাত পর্যন্ত চলতো

আমাদের সাহিত্যেব আড্ডা, নবাববাড়ির ঘড়িতে ঢঙ ঢঙ করে রাত দশটা বাজতেই আমরা যেন অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাড়ি ফিরতে বাধ্য হতাম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে যে-সব অধ্যাপক আমাদের সময় কাজ করছিলেন উত্তরকালে তাঁরা অনেকেই বৃহত্তর ক্ষেত্রে সম্মান ও খ্যাতি অর্জন করেছেন। এঁদের মধ্যে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রফেসর হরিদাস ভট্টাচার্য, কালিকারঞ্জন কানুনগো, পরিমল রায় প্রভৃতিরা ছিলেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব আমাদের অল্প কিছুকাল বি.এ ক্লাসে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসটি পড়িয়েছিলেন। তখন বিশ্ববিদ্যালযে একমাত্র মহিলা অধ্যাপিকা ছিলেন শ্রীযুক্তা চারুপমা বসু। আমি তাঁর কাছে পড়ি নি কিন্তু তাঁব কিঞ্চিৎ সাহিত্যপ্রীতি আছে জেনে তাঁকে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকার গ্রাহক করে নিযেছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে সঙ্গতভাবেই অধ্যাপক সমাজের কথাই বেশি করে বলা হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের সমসামযিক কালের ছাত্রছাত্রীদেব অনেকেই উত্তরকালে সমাজজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হযেছেন একথাটাব উল্লেখও অনিবার্য। এঁদের মধ্যে আছেন বিনয়বঞ্জন গুপ্ত, সমববঞ্জন সেন, রণজিৎ গুপ্ত, দিলীপকুমার সেনগুপ্ত, সুকুমার রায়, গোসাইদাস সাহা, সন্তোষ রায়, সুধীর নাগবিশ্বাস, অববিন্দ দত্ত, সন্তোষ রায়, অনুপমা বসু, শান্তি বসু (দত্ত), শ্রীপতি বসু, সমব গুহ এবং আবো কেউ কেউ। এমন কেউ কেউ নিশ্চয এখনও বযেছেন আমার স্মৃতিতে যাঁবা এই মুহূর্তে হাজির হতে পারছেন না অথচ স্বখ্যাত বা সুপ্রতিষ্ঠিত। বিশ্ববিদ্যালযে পড়বার সময আমি সর্বদাই একটু আড়ালে থাকতে ভালবাসতাম, কোনো কোনো ছাত্রবন্ধু আমাকে অত্যন্ত মবালিস্ট মনে কবে আমার সামনে বিশেষ ধরনেব খোলামেলা কথাবার্তা বলতে ইতস্তত করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অল্পদিনেব অন্তরঙ্গতার ফলেই 'আপনি' সম্বোধন 'তুমি'-তে এবং অচিরেই 'তুই'-তে রূপান্তরিত হয়ে যেত। ব্যাপারটা এতো স্বাভাবিক অথচ আমি অধিকাংশ ছাত্রবন্ধুকেই 'আপনি' সম্বোধন করেছি, খুব অল্প কযেকজনকে 'তুমি' এবং কাউকেই 'তুই' কখনো নয়। এব ফলে কোনো ছাত্রগোষ্ঠীর সঙ্গেই আমার তেমন ঘনিষ্ঠতা হয নি যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা হলের নির্বাচনে ছাত্রছাত্রীদের ভোটে বেশ ভালোভাবেই নির্বাচিত হয়ে হল বার্ষিকী 'শতদল'--এর সম্পাদক হয়েছিলাম। এযাবৎকাল যাঁরা সম্পাদক হতেন তাঁরা আসতেন স্নাতকোত্তব বিভাগ থেকে, সম্ভবত আমি-ই প্রথম বি.এ পাস করবার আগেই সম্পাদক হবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

আমবা যেবাব হল নির্বাচনে জয়লাভ কবি সেবার নাট্যবিভাগের সম্পাদক মণি সেন হল রি-ইউনিয়নের সময় একটি ছোট নাটক নির্বাচনের দায়িত্ব দিলে বুদ্ধদেব বসুর নাটক 'এক ঘণ্টার জন্য' মঞ্চস্থ করতে অনুরোধ জানাই এবং সে নাটকটি সাফল্যের সঙ্গেই মঞ্চস্থ করা হয়। ঢাকা হলের এই অনুষ্ঠানেই প্রথম একসঙ্গে দেখলাম শচীন্দ্র দেববর্মন ও জ্ঞানচন্দ্র গোস্বামীকে। খুব কাছে থেকেই সেই প্রথম তাঁদের গান শোনা আমার ছাত্রজীবনের একটি স্মবণীয় ঘটনা। শচীন দেবের 'প্রাণের বন্ধু রহে প্রাণে' কিংবা 'নিশীথে যাইও ফুলবনে' এবং জ্ঞানচন্দ্র গোস্বামীর 'শূন্য এ বুকে পাখি মোর' গানগুলোর রেশ বহকাল পর্যন্ত যেন আমাদের যৌবনস্বপ্নকে বিশ্বের আকাশে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছিলো। আমরা অনেকেই

আসতুম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরনো ঢাকা শহরের কোনো অঞ্চল থেকে। তিন চার মাইল পথ সাইকেলে আসা-যাওয়া করতে হতো। রমনার নির্জনতায় সাইকেলে বাড়ি ফেরার সময় অনেক ছাত্রবন্ধুকেই এই সব গান গাইতে গাইতে যেতে দেখেছি। এদিকে আমাদের সঙ্গে যে ছাত্রীরা পড়তেন তাদের সঙ্গে পরিচিত হবার তেমন সুযোগ আমাদের ছিলো না। ছাত্রীদের সঙ্গে প্রেম করা তো দূরের কথা সৌজন্যমূলক আলাপের পথেও প্রবল অন্তবায় ছিলো। তখনকার দিনে আমাদেব বিশ্ববিদ্যালযে 'প্রকটর' নামক একজন শালীনতারক্ষক অধ্যাপকের অনুমতি নিয়ে তবেই ছাত্রীদের সঙ্গে আলাপ অর্থাৎ দু'চারটি ছোটখাটো কথাবার্তা বলা যেতে পারতো এবং ছাত্রছাত্রীর কথোপকথনের সময় 'প্রকটর' মহাশয় কাছেই দাঁড়িযে থাকতেন। আমাব এক ক্লাস নিচে পড়ছে এমন একজন ছাত্রীর প্রতি আমার এক সময পক্ষপাত ছিল কিন্তু 'প্রকটর'-শোভিত এই দারুণ ব্যূহ ভেদ করে তার সঙ্গে আলাপ কববাব স্পৃহায বাধা পড়েছিল। কেবল দূব থেকে তাকে দেখেই সুখী হবার চেষ্টা কবতাম। এদিক থেকে বিশ্ববিদ্যালযের তরুণ অধ্যাপকদের আমরা অনেকেই কিছুটা ঈর্ষাব দৃষ্টিতে দেখতাম। কেননা তাঁরা ছাত্রীসমাজের সঙ্গে ইচ্ছে করলেই ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেতেন। এম.এ যখন পড়ছি তখন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা এক ইংবেজ ললনা এলেন আমাদের পড়াবাব জন্যে। তিনি পড়াতেন কিড-এর 'স্প্যানিশ ট্রাজেডি'। ভদ্রমহিলা দেখতে শুনতে সুশ্রী ছিলেন এবং সাতাশ-আটাশ বয়সের পূর্ণাঙ্গ যুবতী। অন্য ক্লাস-এ হাজিবা যাই হোক না কেন, তাঁব ক্লাস-এ কিন্তু উপস্থিতিটা ছিল যাকে বলা যেতে পাবে সেন্ট পার্সেন্ট। খুব ভাল পড়াতেন মিস ম্যাকাই। ছাত্র হিসেবে আমরা উপকৃত হযেছিলাম। কিন্তু তাঁব সুশ্রী চেহাবা এবং বয়সটাই কোনো কোনো ছাত্রের মাথাটাকে গোলমাল কবে দিত এবং হবেক রকমেব দুষ্টুমির চেষ্টা চলতো। হাসিমুখে আমাদের এই বিদেশিনী শিক্ষিকা সব উপদ্রব সহ্য করতেন এবং ক্লাস চালিয়ে যেতেন এমন সুদৃঢ় ভঙ্গিতে যে শেষ পর্যন্ত আমাদের ক্লাসের দুবন্ততম ছাত্রটিও পরাভূত হযে যেতো। জানি না তিনি এখন কোথায় আছেন।

বেস্তবাঁ বা গাছতলায আড্ডা জমতো ছাত্রদেব। আমার নিজের আশ্রয় ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের লাইব্রেরি, সেখানে নিবিড় এক সর্বব্যাপ্ত স্তব্ধতার মাঝে ছাত্রছাত্রীরা নোট টুকছেন। টেবিলের ওপর ছড়ানো বহু পত্র-পত্রিকার অধিকাংশই ইংরেজি ও বাংলা, ঝকঝকে তকতকে। কোনো কোনোটি বিদেশ থেকে সদ্যপ্রেবিত। সাহিত্য ভালোবাসতুম বলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েব এই নিবিড় পরিবেশে আমি মগ্ন হয়ে যেতাম, ডুবে যেতাম এক এক সময়। মনে পড়ছে টি.এস.এলিয়ট তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হন নি; এই লাইব্রেরিতে এসেই তখন তাঁর জটিল কবিতার সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটেছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সে সময় অনেকেই রাজনীতিসচেতন হয়ে পড়েছিলেন। সেই সময় সমাজতন্ত্র সম্পর্কিত অনেক বই একদল ছাত্রের হাতে এই প্রথম আমি দেখতে পেয়েছিলাম। সমসাময়িক ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা বাজনীতি নিয়ে আলোচনা বা সভা করতেন তাঁদের মধ্যে কালীপদ গাঙ্গুলী, অজিত রায়, চিন্ময় বসুর নাম বিশেষভাবে মনে পড়ছে। আরেকজন ছিলেন অমূল্য চন্দ। যখন বি.এ পড়ছি তখন আন্তর্জাতিক আকাশে উদ্বেগের

কালো ছায়া। হিটলার ও মুসোলিনী তখন শক্তি সঞ্চয় করেছেন, স্পেনে গণতন্ত্রীদের পতন হযেছে। এম.এ ক্লাসে যখন ভর্তি হলাম হিটলার একে একে পশ্চিম ইউরোপের ছোট দেশগুলোকে গ্রাস করে নিয়েছে, আর অন্যত্র এশিয়ায় চীনের ক্রমবর্ধমান সঙ্কট এবং ক্ষমতামত্ত জাপানের রণহুঙ্কার। স্বদেশেও তখন সঙ্কট ক্রমবর্ধমান। সুভাষচন্দ্র ত্রিপুরী অধিবেশনের পর কংগ্রেস ছেড়ে ফরোয়ার্ড ব্লক সংগঠিত কবেছেন। সারাদেশে স্বদেশী আন্দোলনেব আবহাওয়া। হিটলাব যখন রাশিয়া আক্রমণ করলো তখন আমাদের এম.এ ক্লাস চলছে, আমাদের বিভাগীয প্রধান হাসান সাহেব আন্তর্জাতিক এই সঙ্কটজনক পবিস্থিতির উল্লেখ কবেছিলেন আমাদের ক্লাসে ২৩ জুনের সকালে, ১৯৪১-এ। আমবা যখন পাস কবে বেরুলাম তখন সঙ্কট আবো ঘনীভূত, জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করে যুদ্ধে নেমে পড়েছে, দেশের সর্বত্র ব্ল্যাক আউটের মহড়া।

ঢাকার দু'টি সাহিত্যপত্র : 'শান্তি' ও 'সোনার বাংলা'

তিবিশ দশকেব মাঝামাঝি থেকে চল্লিশ দশকেব সমাপ্তিকাল পর্যন্ত ঢাকা শহরে বেশ কযেকটি পত্রিকা প্রকাশিত হলেও শিক্ষিত মনেব উপযোগী এবং আধুনিককালেব চিন্তাধাবায চিহ্নিত রচনাবলি অধিকাংশ পত্রপত্রিকায় পাওয়া যেতো না। সাহিত্যেব সাধারণ পাঠক গতানুগতিক সাহিত্যের সঙ্গেই পরিচিত হয়ে উঠছিলেন এবং আধুনিক সাহিত্য-আন্দোলনেব তেমন খবরও রাখতেন না। এই সময ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তার অন্তর্ভুক্ত তিনটি আবাসিক ছাত্রনিবাসের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিযেই আধুনিক চিন্তাভাবনাব নতুন পবিবেশ গড়ে উঠেছিলো। ছাত্রদের পক্ষ থেকে যেসব আবাসিক বার্ষিক মুখপত্র প্রকাশিত হতো তাতে লিখতেন বিশ্ববিদ্যালযের বিশিষ্ট অধ্যাপকবৃন্দ এবং ছাত্রসমাজ, যাঁবা আধুনিক ধ্যানধারণার প্রসারে সাহায্য কবেছিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে এই আধুনিকতার প্রভাব তেমন বিস্তৃত হয় নি যদিও স্বদেশী আন্দোলনেব ক্ষেত্রে ঢাকা শহর তখন সংবাদপত্রেব শিরোনাম। আমাদেব ছাত্রাবস্থায় যে দু'টি পত্রিকা ঢাকা থেকে প্রকাশিত হযে আমাদেব আকর্ষণ কবেছিলো সে দু'টি পত্রিকা : 'শান্তি' ও 'সোনার বাংলা'।

এই দু'টি পত্রিকাব সঙ্গে যুক্ত হবাব আগ্রহ ছিলো আমাব অল্প বযস থেকেই। তখন পর্যন্ত পড়াশোনা ছিলো সীমিত, সবে কলেজের পড়াশোনা চলছে। ঢাকা থেকে তখন নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে 'শান্তি' পত্রিকা। মাসিক পত্র। ঢাকাব অনেক তরুণ লেখক ও অধ্যাপকবৃন্দ এই পত্রিকায় লিখতেন। পত্রিকাটি বেরুতো তখনকার জমিদারকুঠি 'রূপলাল হাউস' থেকে। এই প্রাসাদতুল্য সুবিস্তৃত দালানটির অবস্থান ছিলো ফবাশগঞ্জ এলাকায়। মাসিক শান্তি পত্রিকার স্বত্বাধিকারী যোগেশচন্দ্র দাশ ছিলেন জমিদার এবং আধুনিককালের প্রগতিশীল চিন্তাধারার অনুবর্তী। সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে তাঁর ব্যুৎপত্তির জন্যে সে-সময তিনি ঢাকা শহরের শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। আমি যখন প্রথম তাঁকে দেখি সে-সময় সম্ভবত তাঁর বয়স চল্লিশ অতিক্রম করেছে। লেখাপড়া ছাড়াও নিজে

শরীরচর্চায় ব্যাপৃত থেকে পাড়ার ছেলেদেরও নিয়মিত ব্যায়াম ও ব্রহ্মচর্য্য পালনে উৎসাহ দিতেন। তাঁর বিশাল বাড়ির একদিকে ব্যায়ামাগার ছিলো যেখানে তরুণরা শরীরচর্চায় সকালে কি সন্ধ্যায় অনেকটা সময় কাটিয়ে যেতো।

রূপলাল হাউসের প্রতি আমার তরুণ বয়সের আকর্ষণের কারণ ছিলো দু'টি। এক. এখানে ছিলো একটি লাইব্রেরি এবং প্রাসাদের বাইরে অপব অংশে ছিলো আকর্ষণযোগ্য একটি পাঠাগার। দুই. এই বাড়ি থেকেই বেরুতো মাসিক 'শান্তি' পত্রিকা, যে-পত্রিকায় লেখালেখির সূত্রে জড়িত হতে আমার আগ্রহ ছিলো। তখন সেই তিরিশ দশকের শেষের দিকে কলকাতা ও অন্যান্য জায়গা থেকে প্রকাশিত নানা সাহিত্যপত্র রূপলাল হাউস সংলগ্ন পাঠাগারটিতে দেখতে পাওয়া যেতো। সাহিত্যপত্র ছাড়াও ইংরেজি ও বাংলা নানা পত্রপত্রিকাও নানা জায়গা থেকে আসতো। তখন কিছু কিছু লিখতে শুরু করেছি এবং নানা সাপ্তাহিক পাক্ষিক বা মাসিক পত্রিকার খবর নেবাব জন্যে এক সময় প্রায় নিয়মিত ওই পাঠাগাবটিতে সন্ধ্যার দিকে যেতাম। 'দেশ', 'দীপালী', 'খেয়ালী', 'চিত্রপঞ্জী', 'সচিত্র ভারত', 'শনিবাবের চিঠি', 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী', 'উত্তরা', 'অগ্রগতি', 'বাতায়ন' ইত্যাদি কাগজ কলকাতা থেকে যেতো। এছাড়া পাটনা থেকে আসতো মনীন্দ্র সমাদ্দার সম্পাদিক ইংবেজি সাপ্তাহিক 'বিহাব হেবাল্ড' এবং বাংলা মাসিক 'প্রভাতী'। শ্রীহট্ট থেকে পাওয়া যেতো কালীপ্রসন্ন দাশ সম্পাদিক 'বলাকা' এবং চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'পাঞ্চজন্য'। 'জয়শ্রী' এবং 'সোনার বাংলা' পত্রিকাও এই সময় আমাকে আকর্ষণ করেছিলো।

রূপলাল হাউসেব 'শান্তি' পত্রিকার দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন যোগেশবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র তারকনাথ দাশ। সেখানকাব পাঠাগার ও রিডিং রুমটিও তাঁর পরিচালনাধীনে ছিলো। তাবকনাথ ছিলেন আমাব চেয়ে বয়সে বড়ো, বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে এক সময় এক শ্রেণীতে কিছুকাল পড়েছিলেন। রূপলাল হাউসের লাইব্রেরির বইপত্র পড়তে হলে টাকা জমা দিয়ে এবং মাসিক চাঁদা অব্যাহত রেখে তবেই বই বাড়িতে এনে পড়া যেতো। এই সূত্রেই তারক দাশের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। তারকবাবু ঢাকা শহরের ভিক্টোরিয়া পার্ক সংলগ্ন এলাকায় 'ঢাকা মিউজিক্যাল মার্ট' নামের রেডিয়ো, গ্রামোফোন, গীটার ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের একটি সুন্দর সুসজ্জিত দোকানের স্বত্বাধিকারী ছিলেন। সিনেমা ও রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কেও তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিলো। আমিও চলচ্চিত্র সম্পর্কে উৎসাহী লক্ষ্য করে তিনি শান্তি পত্রিকায় চলচ্চিত্র সম্পর্কে লিখতে বললেন। আমি তখন বয়সে তরুণ, ছাপার হরফে লেখা দেখার জন্যে যে-কোনো নবাগতের মতোই উদগ্রীব, সুতরাং রাজি হয়ে গেলাম। কিন্তু চলচ্চিত্র সম্পর্কিত আমার লেখাগুলো ছিলো ইংরেজি থেকে অনুবাদ কেননা ওই সময় থেকে কবিতা লেখাও শুরু করেছি এবং লেখাটাই যে আমার প্রধান অবলম্বন হবে একথাটাও যেন মনের ভেতর দানা বেঁধে উঠেছিলো। এছাড়া 'শান্তি' পত্রিকাটি কীভাবে কলকাতার সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে উন্নতমানের হতে পারে সে বিষয়েও নানা চিন্তাভাবনা মাথায় ছিলো। কলকাতার উল্লেখ্য সাহিত্যপত্রে তখন নিয়মিত লিখতে শুরু করেছি এবং 'শান্তি' পত্রিকাটিকেও কীভাবে নানা দিক থেকে আকর্ষণীয় করা যায় সে

বিষয়ে পত্রিকার প্রধান সম্পাদক যোগেশ দাশের সঙ্গে আলাপের সুযোগ খুঁজছিলাম।

একদিন কী একটা প্রয়োজনে সকালের দিকে গিয়েছিলাম রূপলাল হাউস–এ। সেদিন তারকবাবু জানতে চাইলেন যে, 'শান্তি' পত্রিকাটির পরিচালনার ব্যাপারে আমি আরো কিছুটা দায়িত্ব নিতে পারব কি না। অর্থাৎ নিছক লেখকরূপে নয়, পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বও নিজের কাঁধে নিতে পারব কিনা। আমি সানন্দে রাজি হলাম। তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ ক্লাসে পড়ছি, সুতরাং সহযোগী সম্পাদকরূপে ছাপার অক্ষরে শান্তি পত্রিকাব প্রচ্ছদে নিজের নাম দেখে খুশি হবো এটা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিলো না।

'শান্তি' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদকের দায়িত্বভার নেবার অল্পকালের মধ্যেই রচনা নির্বাচন ও মুদ্রণের দিক থেকে বেশ কিছুটা পবিবর্তন সূচিত হলো। সম্পাদক যোগেশচন্দ্র দাশ এটা লক্ষ্য করেছিলেন এবং একদিন আমাকে খবর দিয়ে ডেকে নিয়ে তাঁর নিজস্ব পড়ার ঘবে বসে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ করলেন। আমার সম্পাদকীয় দক্ষতা সম্পর্কে তিনি যে আশান্বিত এটা জানতে পেরে সেদিন খুব প্রীত হয়ে আমি বাড়িতে ফিবে এসেছিলাম। 'শান্তি' পত্রিকাকে নতুন রূপ দেবার জন্যে সমসাময়িককালের আধুনিক সাহিত্য–আন্দোলনেব সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন এমন বেশ কিছু লেখক ও কবিকে আমন্ত্রণ জানাতেই উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া গেল। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব আমি সানন্দে নিয়েছিলাম। এই সময়সীমায় যাঁরা শান্তি পত্রিকাব জন্য কবিতা বা অন্য রচনা প্রেবণ কবেছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন জীবনানন্দ দাশ। এছাড়া ছিলেন বিমলচন্দ্র ঘোষ, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মনীশ ঘটক, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হবপ্রসাদ মিত্র, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক, গোবিন্দ চক্রবর্তী, মন্মথকুমাব চৌধুরী, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, সুধীবঞ্জন মুখোপাধ্যায়, জীবানন্দ ঘোষ, দ্বিজেন্দ্র মৈত্র।

বয়স্ক লেখকদের অন্যতম ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র যিনি কখনো কখনো স্মৃতিশেখর উপাধ্যায় নামেও কবিতা লিখতেন। অন্তত এই নামেই বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকাব প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় (১ম বর্ষ ১৩৪২ : আশ্বিন ও পৌষ) তাঁর একাধিক কবিতা প্রকাশিত হয়েছিলো। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের 'ব্রাউনিং পঞ্চাশিকা'র (কবি ব্রাউনিং–এর পঞ্চাশটি কবিতাব অনুবাদ সংগ্রহ) বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। বুদ্ধদেব বসু এই বইটির বিস্তাবিত সমালোচনা লিখেছিলেন 'কবিতা' পত্রিকায।

ব্রাউনিং এর অনুবাদ তখন পর্যন্ত বাংলা ভাষায তেমন হয় নি। পূর্বসূরি কৃতী লেখকদের কেউ কেউ দু'চারটি কবিতাব অনুবাদ পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন মাত্র। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রই সম্ভবত শেষ তিরিশ দশকে একটি দু'টি নয় একেবারে পঞ্চাশটি কবিতার অনুবাদ একটি বড়ো সঙ্কলনে প্রকাশ করে সমকালীন কাব্যপ্রিয় পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাসূচক মন্তব্যটি ছিলো তাঁর পরিশ্রমের পুরস্কাব।

বুদ্ধদেব বসু খুঁটিয়ে আলোচনা করলেন 'কবিতা' পত্রিকায় সম্ভবত তার অনতিকাল পরেই। সে–সমালোচনাটি পড়ে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ, 'কবিতা' পত্রিকায় তারপর থেকে আর তিনি কোনো লেখা পাঠান নি। ঘটনাটি আমি জেনেছিলাম বুদ্ধদেব বসুর

কাছেই। যাই হোক, 'শান্তি' পত্রিকায় সমালোচনা করবার অনুরোধ জানিয়ে (অনুরোধ না বলে নির্দেশ বলাই উচিত) অধ্যাপক মৈত্র আমাকেও পাঠালেন 'ব্রাউনিং পঞ্চাশিকা', আমার নামে আমার ঢাকার বাসস্থানের ঠিকানায়! তাঁর নির্দেশ ছিলো সমালোচনাটি যেন আমি নিজেই লিখি। আমার যখন অল্প বয়স তখন সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ছিলেন ঢাকা কলেজের প্রধান এবং পরবর্তীকালে বঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের উচ্চতর পদেও আসীন হয়েছিলেন, অধ্যাপক সমাজে নামডাকও বেশ ছিলো। যখন 'ব্রাউনিং পঞ্চাশিকা'ব একটি সমালোচনা লিখে দেবার নির্দেশ পেয়েছিলাম তখন ব্রাউনিং নিয়ে আলোচনা করার যোগ্যতা আমার যে খুব বেশি ছিলো না তা তো সঙ্গে সঙ্গেই উপলব্ধি করেছিলাম। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত 'শান্তি' পত্রিকায় সেই সমালোচনা বিস্তারিত আকারেই ছাপা হলো, শ্রীযুক্ত মৈত্র পড়ে খুশি হয়ে চিঠিতে জানালেন অল্পকালের মধ্যেই।

'শান্তি' পত্রিকা সম্পাদনাকালে অল্প বযস থেকেই সৎসাহিত্য সম্পর্কে ক্রমশ সচেতন হবার সুযোগ পেযেছিলাম। সিনেমা বিষয়ক লেখালেখি সম্পূর্ণ বর্জন কবে কবিতা ও কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধ রচনাকে অল্পকালের মধ্যেই প্রধান উপজীব্য করে তুলেছিলাম। 'শান্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত আমাব এই সমযকার কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধ দু'একটি পবে আমার প্রথম সমালোচনা গ্রন্থ 'সময় ও সাহিত্য'র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ঢাকায় তখন যাঁরা শক্তিমান বা প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন তরুণ লেখক ছিলেন তাঁবাও আমার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছিলেন, বণেশ দাশগুপ্ত, অচ্যুত গোস্বামী, সোমেন চন্দ, ভবানীপ্রসাদ দত্ত তাঁদের অন্যতম। মনে পড়ে ঢাকাব অধ্যাপকদের মধ্যে সেই সমযে 'শান্তি'তে লিখতেন মোহিতলাল মজুমদার, কাজি আবদুল ওদুদ, হরিদাস ভট্টাচার্য, আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং আরো কেউ কেউ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযে আমাদের বাংলা পড়াচ্ছেন এবং তাঁর বেশ বড়ো আকারের গ্রন্থ 'বাংলা মঙ্গলকাব্যেব ইতিহাস' সেই সময় সদ্য প্রকাশিত। উত্তরকালে এই গ্রন্থটির জন্য তিনি দেশ-বিদেশের শিক্ষিত সমাজে বাংলা লোকসাহিত্যের একজন প্রধান প্রবক্তা হিসেবে সম্মানিত হয়েছেন এ ঘটনা এখন অনেকের কাছেই সুবিদিত।

ঢাকায় যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি আসতেন তাঁদের রূপলাল হাউস ও 'শান্তি' পত্রিকার পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হতো। ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন, নজরুল ইসলামও পরে এসেছিলেন। সেই সময় আমার বয়স খুবই কম, কিছুই জানবার ও বুঝবার সুযোগ ছিলো না। কিন্তু তিরিশ দশকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা শিশির ভাদুড়ী যখন এসেছিলেন তখন 'শান্তি' পত্রিকার তরফ থেকে রূপলাল হাউস-এ তাঁদের সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিলো। পরবর্তীকালে কবি বুদ্ধদেব বসুকেও পত্রিকা কর্তৃপক্ষ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছিলেন। চল্লিশ দশকের শুরুতে ডঃ মেঘনাদ সাহাকেও স্বাগত জানানো হয়েছিলো। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সম্ভবত ১৩৩২-এর কোনো এক সময় শান্তি পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো। এই মাসিক পত্রেই পুরনো একটি সংখ্যায় আমি প্রথম পড়েছিলাম বুদ্ধদেব বসুর সেই কবিতাটি যার প্রথম দু'চারটি পঙ্ক্তি এই রকম : 'গা ঘেঁষে মেয়েরা চলে রেখে যায় গায়ের সুবাস/হাওয়ায় তাই ভুরভুর করে/গায়ের বাতাস।'

এবং তখনকার দিনে তরুণ বুদ্ধদেব বসুর নাম শুনলে বৃদ্ধ অভিভাবকদের দল যে নাসিকা কুঞ্চিত করতেন তার মূলে এই কবিতাটির কিছু অবদান ছিলো কিনা জানি না।

আমি 'শান্তি'র সহকারী সম্পাদক হবার আগে ঢাকারই কয়েকজন লেখক একটি গোষ্ঠী তৈরি করে 'শান্তি' পত্রিকা পরিচালনা সম্পর্কিত একটি ইতিবাচক প্রস্তাব কর্তৃপক্ষকে দিয়েছিলেন। এঁদের অন্যতম ছিলেন কানাইলাল মুখোপাধ্যায়, সন্তোষকুমাব মুখোপাধ্যায় ও সুকুমাব রায়। কানাইলাল মুখোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় বয়সে আমার পাঁচ–ছয় বছবের বড়ো ছিলেন এবং 'শান্তি'তে গল্প লিখতেন। কানাইলাল মুখোপাধ্যায় পরবর্তীকালে কলকাতায় এসে প্রকাশকরূপে এখনকার দিনে সুবিদিত ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায় নামের প্রকাশন সংস্থার কর্ণধাব হয়েছিলেন। সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় দেশ বিভাগেব পব অধ্যাপনাকেই বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সুকুমাব রায় (ইনি সঙ্গীতশাস্ত্রে অভিজ্ঞ আকাশবাণীর ভূতপূর্ব প্রোগ্রাম একসিকিউটিভ সুকুমার বায় নন) তিরিশেব শেষাশেষি নব প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় একাধিক ধারাবাহিক উপন্যাস লিখেছিলেন। কিন্তু আধুনিকতার তৎকালীন মানদণ্ডে তাঁর রচনার তেমন মূল্য না থাকায় এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নবেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি তরুণতব কযেকজন লেখকের উচ্চমানের গল্প 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকায় সুকুমাব ধীবে ধীবে 'দেশ' থেকে হাবিয়ে গেলেন। সম্ভবত বেল দপ্তরের কাজ কবতেন, পরে আব কোনো পত্রিকায় তাঁর লেখা দেখি নি।

বস্তুত শেষ তিরিশ থেকেই কলকাতার মতো ঢাকায়ও সাহিত্যে আধুনিকতার আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠেছিলো। ঢাকা থেকে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত সম্পাদিত 'প্রগতি' পত্রিকা আমার কিশোর বয়সেই প্রকাশিত হয়েছিলো। আমি পববর্তীকালে এই পত্রিকার দু'তিনটি সংখ্যা পড়েই সাহিত্যের আধুনিকতার সূত্রগুলো সম্পর্কে কিছুটা সচেতন হয়েছিলাম। কানাইলাল মুখোপাধ্যায় ও তাঁব বন্ধুগোষ্ঠী কেন শেষ পর্যন্ত 'শান্তি' মাসিক পত্রিকার দায়িত্ব নিলেন না তাব কারণ এখন আব মনে করতে পাবছি না। তবে একটি শর্ত ছিলো : লেখকদের টাকা দিতে হবে। বিভিন্ন ধরনের অসুবিধায় উল্লেখ করে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ সে প্রস্তাবে অসম্মতি জানিয়েছিলেন।

তিরিশ–চল্লিশ দশকে ঢাকা থেকে বেশ কিছু পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হলেও আধুনিককালের চিন্তাধাবার ছাপ সেগুলোতে তেমন দৃষ্টিগোচর নয়। তবে অন্তত দু'টি সাহিত্য পত্রিকায় নব্য চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছিলো। সেই দু'টি হলো 'শান্তি' ও সোনার বাংলা' পত্রিকা। 'শান্তি' পত্রিকাব প্রচাবসংখ্যা ছিলো সীমিত। সে তুলনায 'সোনার বাংলা' শুধু প্রচারের দিক থেকে নয় লেখার মানের দিক থেকেও বহু ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেছিলো। শেষ তিরিশে এবং চল্লিশ দশকে 'সোনার বাংলা' হুইলারের সমস্ত স্টলে পাওয়া যেতো। কবি শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে জানা যায় তিনি বারো–চোদ্দ বছর বয়সে বিহারের জামালপুর রেল স্টেশনের হুইলার স্টলে 'সোনাব বাংলা' প্রথম দেখেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেতা, লেখক ও চিন্তাবিদ নলিনীকিশোর গুহ ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক। একটি কম্পাউণ্ডযুক্ত বড়ো দ্বিতল বাড়িতে ছিলো 'সোনার বাংলা' পত্রিকার

অফিস। নিচের তলায় ছিলো সোনার বাংলা প্রেস। সেখান থেকেই পত্রিকা ছাপা হতো। নিজস্ব প্রেস থাকায় সঠিক সময়ে ও নির্ধারিত দিনে 'সোনার বাংলা' প্রকাশিত হতো এবং ঢাকা ও কলকাতার বিশিষ্ট লেখকরা এই কাগজে লিখতেন। ঢাকায় 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় প্রতিদিনের কাজ দেখাশোনা এবং কর্মাধ্যক্ষরূপে কাজ করতেন শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার গুহ এবং পত্রিকার কলকাতার প্রতিনিধি ছিলেন অনিলচন্দ্র ঘোষ, যিনি পববর্তীকালে কলকাতার 'প্রচার সমবায' নামেব বিশিষ্ট প্রচার সংস্থার প্রতিষ্ঠাতারূপে লেখক ও পত্রিকা মহলে জনপ্রিয় হয়েছিলেন।

আমি 'শান্তি' পত্রিকার সহকারী সম্পাদকরূপে যোগ দিয়েছিলাম ছাত্রাবস্থায় ১৯৩৭–এ। ১৯৪০–এ সম্পাদনার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হই। যুদ্ধ শুরু হওয়ায় এবং ছাপা ও কাগজের দাম বেড়ে যাওয়ায 'শান্তি' কর্তৃপক্ষ কাগজ বন্ধ করে দিলেন। আমি সম্পাদনার কাজে যুক্ত থাকাকালীন পত্রিকাটিকে আধুনিক সাহিত্যেব উপযোগী কবে গড়ে তুলবাব চেষ্টা করেছিলাম। সবসময ঢাকা থেকে চিঠিপত্র লিখে কলকাতার লেখকদের লেখা পাওয়া যেতো না। কলকাতায এসে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমেও লেখা সংগ্রহ করা হতো। 'শান্তি' পত্রিকা উঠে যাওয়ায় তখন সোনার বাংলা পত্রিকাই হযে উঠেছিলো আমাদের একমাত্র আকর্ষণ, কেননা ঢাকায় তখন এরকম নিটোল সুমুদ্রিত সাহিত্যপত্র আর একটিও ছিলো না। নলিনীকিশোর গুহ ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির রাশভারী সম্পাদক, আমাদের মতো তরুণ লেখকেরা তাঁর কাছে গিযে বসতে ইতস্তত করতাম। এই সময সোনার বাংলা পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক রণেশ দাশগুপ্ত কিছুকাল কাজ কবেছিলেন। তরুণ লেখকরা গিযে তাঁর সঙ্গেই যোগাযোগ রাখতেন। শক্তিমান প্রবন্ধকার প্রয়াত অচ্যুত গোস্বামীর সঙ্গে এই সোনার বাংলা পত্রিকার অফিসে রণেশ দাশগুপ্তের প্রথম পরিচয় হয়।

রণেশ দাশগুপ্ত অন্যত্র চাকরি পেযে চলে যাবার পর এবং নলিনীবাবু কলকাতায় আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে সম্পাদকীয় বিভাগে দায়িত্বভার গ্রহণ করলে সমগ্রভাবে পত্রিকার দেখাশোনার জন্যে রইলেন প্রফুল্লকুমার গুহ। কলকাতার ও ঢাকার লেখক সমাজে প্রফুল্লবাবুর সুনাম ছিলো, কেননা সাহিত্যের ভালোমন্দ তিনি কিছুটা বুঝতেন এবং লেখার জন্যে প্রবীণ ও নবীনদের পারিশ্রমিক দেবারও ব্যবস্থা করেছিলেন। সে সময় সোনার বাংলা পত্রিকা বহুপঠিত হওয়ায পত্রিকাটিব কাটতিও ছিলো। চল্লিশ দশকের প্রথম থেকেই এই পত্রিকায় লিখতে শুরু করি এবং প্রফুল্লবাবুর উৎসাহে শিল্পসাহিত্য নিয়ে ওই পত্রিকায় ধারাবাহিক ফিচার লিখতেও শুরু করি। নলিনীবাবু কলকাতায় গিয়েও সেখান থেকে প্রতি সপ্তাহে সম্পাদকীয় লিখে পাঠাতেন, কেননা সম্পাদকরূপে তাঁর নামটাই ব্যবহৃত হতো। 'সোনার বাংলা' ছিলো জাতীয়তাবাদী পত্রিকা অথচ চল্লিশ দশকের শুরুতে ঢাকায় প্রগতি লেখক সংঘ গঠিত হয়েছে এবং মোটামুটি সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় বিশ্বাসী কয়েকজন তরুণ লেখক ঢাকা ও কলকাতার নানা কাগজে উৎসাহের সঙ্গে লেখালেখি শুরু করেছেন। সোমেন চন্দ মাসিক 'শান্তি' পত্রিকায় অনেকগুলো গল্প প্রকাশের সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁর জীবদ্দশায়। এই গল্পগুলোর অন্যতম 'সত্যবতীর বিদায়', 'সিগারেট', 'পথবর্তী'। তরুণ

বয়সে লেখা তাঁর দু'টি একাঙ্কিকা 'বিপ্লব' ও 'প্রস্তাবনা' ওই পত্রিকায়ই প্রকাশিত হয়েছিলো কিন্তু 'সোনার বাংলা'র সম্পাদক নলিনীবাবুর কাছে লেখা পাঠাতে তাঁর সঙ্কোচ ছিলো। ফলে ভালো পত্রিকা হিসেবে 'সোনার বাংলা'র প্রতি তাঁর আকর্ষণ থাকলেও কোনো লেখা পাঠান নি।

চল্লিশ দশকের শুরু থেকেই 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় আমার অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছিলো। বোধ হয় এই দশকটি ছিলো এই পত্রিকার সবচেয়ে উজ্জ্বল অধ্যায়। শারদীয়া সংখ্যাগুলো কলকাতার বহু সুপরিচিত লেখকের প্রবন্ধ ও গল্পে এবং কবিতায় সমৃদ্ধ হতো। প্রবোধকুমার সান্যাল, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, বিমল মিত্রের নাম মনে পড়ছে। প্রাবন্ধিকদের পুরোভাগে ছিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রমেশ মজুমদার ও সুকুমার সেন প্রমুখ। প্রত্যেককেই লেখার জন্যে পত্রিকাব সাধ্যানুযায়ী দক্ষিণা দেয়া হতো, আমাব মতো তরুণ লেখকরাও বঞ্চিত হয় নি। আমার দু'টি উল্লেখ্য প্রবন্ধ 'আধুনিক কবিতার রূপ' এবং 'কাব্যনাট্যের সম্ভাবনা' এই পত্রিকায় প্রকাশিত হযেছিলো। এছাড়া ডি. এইচ. লরেন্স আলডুস হাক্সলি বিষযক লেখাও ছিলো। বৃটিশ আমলে ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'সোনাব বাংলা' সে সময় পূর্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে সমাদৃত হয়েছিলো। দেশবিভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানেও কিছুকাল 'সোনার বাংলা' টিকে ছিলো। পরে পরিবর্তিত অবস্থায় এই পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হযে যায়।

কবিতায় আধুনিকতার অভিঘাত

চল্লিশ দশকের ঢাকা শহর কোনো অপাঙক্তেয় নগরী ছিলো না। বিশের দশকের প্রথমদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয স্থাপিত হবার পর ঢাকা শহরের সাংস্কৃতিক জীবন ক্রমশই মূল্যবান ভাবনাচিন্তায় অলঙ্কৃত হতে থাকে। কলকাতার তুলনায় সামাজিক সংস্কাবের দিক থেকে ঢাকার শিক্ষিত সমাজ কিছুটা রক্ষণশীল হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েব অধ্যাপকদের অধিকাংশেবই ধ্যানধারণায মুক্তচিন্তা প্রবাহের প্রসার অব্যাহত ছিলো বলতে পারা যায়। কলকাতা ও ঢাকা শহবেব ভৌগোলিক দূরত্ব ছিলো সামান্যই। সুতরাং কলকাতাব সামাজিক বা রাজনৈতিক আন্দোলনেব খবরাখবর ঢাকায় পৌছে যেতো প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। বিশের দশকে দ্বিখণ্ডিত বাংলা বলে কিছু ছিলো না। ছিলো অখণ্ড বঙ্গদেশ, 'মহামান্য' বৃটিশরাজশাসিত বিশাল ভারতবর্ষের অন্যতম অঙ্গরাষ্ট্ররূপে ছিলো যার অস্তিত্ব। মোটামুটিভাবে বঙ্গদেশের ছিলো দু'টি ভাগ : পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ। কিন্তু চিন্তাভাবনার আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে এ-দু'টি অংশের কোনো বিভাজন কল্পনায়ও আনা সম্ভব ছিলো না।

১৯২৭-এ ঢাকা থেকে বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত সম্পাদিত 'প্রগতি' পত্রিকা প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত ঢাকার শিক্ষিত সমাজ সাহিত্যে আধুনিকতা সম্পর্কে খুব বেশি চিন্তাভাবনা করতেন এরকম প্রমাণ পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের রচনার আদর্শই তৎকালীন স্থানীয় লেখক ও পাঠকের কাছে সুস্থির ও মূল্যবান মনে হয়েছিলো। স্থিতাবস্থার প্রতি ছিলো সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্তের পক্ষপাত। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র প্রবর্তিত সাহিত্যধারাকে ভিন্ন

খাতে প্রবাহিত করার আদৌও কোনো প্রয়োজন আছে কিনা এ বিষয়ে কোনো প্রশ্নও তখন পর্যন্ত ওঠে নি। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা ছাত্রদের মধ্যে সাহিত্যানুরাগী এবং সাহিত্যচর্চায় ব্রতী একটি ছাত্রগোষ্ঠী একটু স্বতন্ত্রভাবেই নিজেদের উদ্যোগকে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতাকে বোঝাতে ইংরেজি 'মডার্ন' শব্দটাকে ব্যবহার করেছিলেন। নদী চলতে চলতে বাঁক ফেরে, সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার্ন এরকম উক্তি রবীন্দ্রনাথেরই। বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন, আধুনিক কবিতার অর্থ হালের কবিতা। প্রতি যুগেই এমন কিছু কবির অস্তিত্ব সম্ভব যাঁরা গতানুগতিক পদ্ধতিতে কাব্যচর্চায় উৎসাহ পান না বরং কাব্যচর্চার মাধ্যমে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত হতে চান। ফলে তাঁদের রচনায় নানাদিক থেকে নবত্ব প্রতিফলিত হবার সম্ভাবনা থেকে যায়।

বুদ্ধদেব বসুর 'প্রগতি' পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতায় আধুনিকতার এমন লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যাবে না যা অতিমাত্রায় স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। শব্দ নির্বাচনে ও উচ্চারণে তখন পর্যন্ত তরুণ কবিরা ছিলেন রোমান্টিক কবিতারই অনুগামী এবং ইতিপূর্বে কাব্যসাহিত্যে বারবার ব্যবহৃত অনেক শব্দ এই সময়ে তরুণ কবিরা ব্যবহার করতে ইতস্তত করেন নি। 'প্রগতি' পত্রিকার প্রথম বর্ষেব ১২শ সংখ্যাটি (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫) যদি একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা যায় তাহলে একথাই মনে হতে পারে যে অনুভবে ও কবি কল্পনায় কিছুটা স্বাতন্ত্র্য এই সংখ্যার কোনো কোনো কবিতায় প্রকাশ পেলেও শব্দায়নে, বাকভঙ্গিতে ও উচ্চারণে কবিতাগুলো ঐতিহ্যনির্ভরতা থেকে মুক্ত হতে পারে নি। যে ক'জন কবির কবিতা 'প্রগতি' পত্রিকার প্রথম বছরে প্রকাশিত হয়েছিলো তাঁদের অন্যতম ছিলেন জীবনানন্দ দাশ (সে সময়ে দাশগুপ্ত), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত,অজিত দত্ত ও বুদ্ধদেব বসু। এঁরা সকলেই ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা অল্পবয়সী যুবক, সাহিত্যের জগতে গতানুগতিটাকে ভেঙে নতুন কিছু করতে হবে এই মনোভাবের প্রবক্তা। কিন্তু প্রগতি পত্রিকা প্রকাশের পাঁচ–ছয় বছর আগেই তো কলকাতা থেকে 'কল্লোল' মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়েছে এবং আধুনিকতার মুখপত্র হিসেবে বেশ একটি নতুন আন্দোলনের মূর্তিতে বাংলা সাহিত্যেব পাঠককে আকর্ষণ করেছে। ঢাকার তরুণ লেখকদের সঙ্গে এই পত্রিকার সম্পর্কও লেখালেখির মাধ্যমে গড়ে উঠতে সময় লাগে নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা ও ইউরোপের নানা দেশের সাহিত্য সংবাদ সদ্য প্রকাশিত বইগুলোতে পেয়ে যেমন কলকাতার তেমনি ঢাকার তরুণ লেখকরাও বেশ কিছুটা প্রেরণা পেয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃত আধুনিকতার সংজ্ঞা কি এবং তখনকার কবিতায় কীভাবে তার প্রতিফলন ঘটবে এ নিয়ে সম্ভবত চুলচেরা বিচারের সময় ছিলো না।

অজিত দত্তর 'মালতী' এবং বুদ্ধদেববাবুর 'স্বপ্ন' কবিতা দু'টি ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রগতিতে যখন বেরোয় তখন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। দু'টি কবিতাই সুদীর্ঘ এবং স্পেন্সরীয় স্তবকে রচিত। ইতিপূর্বে মোহিতলাল মজুমদার এই স্পেন্সরীয় স্তবকেই লিখেছিলেন তাঁর 'পান্থ' নামের বিখ্যাত চিত্তহারী কবিতা। কিন্তু এই দু'টি কবিতায় আধুনিকতার কি কি শর্ত পালিত হয়েছে তা অনুধাবন করা কঠিন। শুধুমাত্র রোমান্টিক কবিতা হিসেবেই এই দু'টি কবিতার সার্থকতা। ইতিপূর্বে বহু ব্যবহৃত শব্দ অনেক

পরিমাণেই স্থান পেয়েছে এবং রোমান্টিক উন্মাদনার পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে।

'মধুসূদন দত্ত যখন কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হন তখন সাহিত্যের একটি বিশেষ রূপ তার কল্পনায় ফুটে উঠেছিলো আমি যখন লিখতে আরম্ভ করি। তখন আমার সাহিত্য-প্রেরণাতেও একটি নবতররূপের ব্যঞ্জনা ছিলো। তোমরা, যারা বলছো যে সাহিত্যে একটা নবযুগ এসেছে, তোমাদের এই নবত্ব কোনো বিশেষ রূপটি ধারণ করেছে, বলতে পারো? কোথায় তোমাদের সেই নবপ্রতিমা? কোথায় তার রূপের বৈশিষ্ট্য?'

ঢাকায় সেসময়ে প্রগতি পত্রিকায় কবিতার আধুনিকতা নিয়ে আলোচনা কখনো প্রকাশিত হয় নি। তবে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো যে ঢাকার তৎকালীন তরুণ কাব্যগোষ্ঠী সমকালীন ও সদ্য অতীত আন্তর্জাতিক সাহিত্যের, বিশেষ করে মার্কিন, সোভিয়েত, ইংরেজি ও স্ক্যানডেনেভিয়ান লেখকদের চিন্তাভাবনায় এক ধরনের নবত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পরেও যে সাহিত্যকে ভিন্ন বিষয়মুখী করা সম্ভব এই ধারণাকে কেন্দ্র করেই 'প্রগতি' পত্রিকায় গল্প, উপন্যাস ও কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে। দুঃখের বিষয় কবিতার আধুনিকতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র চিন্তাভাবনার সময় এই সময়ের শিক্ষিত পাঠকেরও ছিলো না এবং কী কারণে বলা যায় না আধুনিকতা ও অশ্লীলতাকে তারা প্রায় সমার্থবাচক বলে ধরে নিয়েছিলেন। এই সময়ে ঢাকায় আরো দু'টি উল্লেখযোগ্য সাহিত্য পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছিলো, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা ও মাসিক শান্তি পত্রিকা। দেশনেত্রী লীলা রায় (সে সময়ে লীলা নাগ) সম্পাদিক মাসিকপত্রের কয়েকটি সংখ্যা ঢাকা থেকে এই সময়েই প্রকাশিত হয়। পরে অবশ্য এই পত্রিকার কার্যালয় কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়েছিলো। সেসব কবিতা, গল্প ও উপন্যাস এই তিনটি পত্রিকায় প্রকাশিত হতো তা ছিলো পুরোপুরি ঐতিহ্যনির্ভর এবং আধুনিকতার সংজ্ঞা সমন্বিত কোনো বিতর্কমূলক রচনা ছাপার সম্ভাবনা ছিলো না। সোনার বাংলার সম্পাদক নলিনীকিশোর গুহ ছিলেন সেকালের স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবশালী নেতা ও ভাবুক, একজন তরুণ লেখকের সৎচিন্তাজাত গল্প বা কবিতাকে তিনি তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায় স্থান দিতে আগ্রহী ছিলেন। বুদ্ধদেব বসু বা অজিত দত্তর কবিতা সম্পর্কে তাঁর যে তথ্য জানা ছিলো তা সম্ভবত শোনা কথা মাত্র। শক্তিমান হলেও এই দুই আধুনিক কবিতার স্রষ্টাদের সম্পর্কে তাঁর কোনো উৎসাহ ছিলো না। কিছু পরের একটি ঘটনার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। ১৯৩৮-এর কোনো সময় গল্পকার ও সমালোচক অচ্যুত গোস্বামী বুদ্ধদেব বসু ও তাঁর সাহিত্য বিষয়ক একটি প্রবন্ধ প্রকাশের আশায় সোনার বাংলা কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে লেখাটি সোনার বাংলা সম্পাদক নলিনীকিশোর গুহ-র হাতে দিয়ে আসেন। মতামত পরে জানানো হবে বলা হলেও অচ্যুতবাবু প্রস্থান করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রচনাটি সম্পাদক বাজে কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষেপ করেন। দেশনেত্রী লীলা রায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে পাস করেছিলেন। সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ধ্যানধারণা যথেষ্ট ব্যাপক ও সঞ্চরণশীল ছিলো। নতুন লেখকদের তিনি লেখার জন্যে আমন্ত্রণ জানাতেন। কিন্তু জয়শ্রী নিছক সাহিত্যপত্র ছিলো না, তিনি যে স্বদেশী আন্দোলন ও স্বদেশ চিন্তাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন তাকে অক্ষুণ্ন রাখার প্রযোজন থাকায় একজন তরুণ লেখকের আধুনিক কাব্য

আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করা তাঁর পক্ষেও সম্ভব ছিলো না। সেই তুলনায় বরং মাসিক 'শান্তি' পত্রিকায় বড়ো অদ্ভুতভাবে প্রাচীন ও আধুনিক ভাবধারার প্রবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই পত্রিকার সম্পাদক যোগেশচন্দ্র দাশ ছিলেন তৎকালীন ঢাকার বিখ্যাত জমিদার সম্প্রদায়ের একজন এবং ব্রাহ্ম ভাবধারায় দীক্ষিত। তাঁর নামই পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে মুদ্রিত হলেও আরো কেউ কেউ পত্রিকার পক্ষে গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা ইত্যাদি সংগ্রহ করতেন। তিরিশ দশকের প্রথমদিকে এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে ওই দশকের সমাপ্তিকাল পর্যন্ত পৌছে বন্ধ হয়ে যায়। যে সময়ে ঢাকায় বুদ্ধদেব বসুর বচনাকে অশ্লীলতার অপবাদে চিহ্নিত কবাব চেষ্টা চলেছিলো সে সময়েই 'শান্তি' পত্রিকায় তাঁর কবিতা ছাপা হয়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ঢাকায় প্রধানত প্রগতি পত্রিকাকে ঘিরে আধুনিক কবিতার যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিলো তাতে কোনো স্থানীয় বা আঞ্চলিক বিশেষত্ব ছিলো না। সে সময়কার কবিতায় কিছু কিছু বিদেশী কবিতার প্রভাবকেই আধুনিকতা বলে চিহ্নিত কবা যেতো। প্রেম-বিরহ, নরনারীর দেহজ সম্পর্ক, সংশয় ও নৈরাশ্য, বিরূপ পরিবেশে আত্মহননেব আভাস—এই সবের যেকোনো একটি বা একাধিক বিষয়ের প্রতিফলনের ভিত্তিতেই অনেক সময় কবিতার আধুনিকতা চিহ্নিত হতো। খুব ভালো লাগতো যদি কোনো একটি লক্ষণ দিয়েই কবিতার আধুনিকতাকে সনাক্ত করা যেতো। কিন্তু তা হবাব নয়। অথচ সাহিত্যেব শুচিতারক্ষাকারীর দল বুদ্ধদেব বসুর কবিতাকে এক সময় যৌনগন্ধী এবং সুস্থ রুচির পক্ষে অবমাননার এই অভিযোগে বাতিল করে দিতে কুণ্ঠিত ছিলো না। চল্লিশ দশকের পূর্বকাল পর্যন্ত ঢাকা শহরে এরকম অবস্থাই সাহিত্যচিন্তায় বর্তমান ছিলো বলতে পারা যায়।

চল্লিশ দশকের ঢাকায় বুদ্ধদেব বসুদের পরে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিলো ঢাকার প্রগতি লেখক সঙ্ঘকে ঘিরে। এই সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছে।

চল্লিশ দশকে পৌছে ঢাকার তৎকালীন তরুণ কবিদের কবিতায় আধুনিকতা একটা নতুন মাত্রা পায়। ঢাকা প্রগতি লেখক সঙ্ঘের অনেকেই হয়ে উঠেছিলেন সাম্যবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় তরুণ লেখক আকৃষ্ট হওয়ায় নতুন লেখা কবিতায়ও তার প্রতিফলন ঘটলো। যে তরুণ কবি প্রেমের কবিতা দিয়ে শুরু করেছিলেন তার কবিতায় ক্রমশ দেখা গেলো সমাজচিন্তার প্রাধান্য। প্রগতি পত্রিকার সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরবর্তীকালের তরুণ কবিদের দৃষ্টিভঙ্গিব বেশ কিছুটা পার্থক্য অনুভব করা গেলো। সোভিয়েত বিপ্লবের ফলে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা তরুণ বাঙালি কবির ভাবলোকে যে প্রভাব বিস্তার করে তার ফলে কবিতায়ও আধুনিকতার সংজ্ঞা বেশ কিছুটা বিস্তৃত হয়। এই সময়ে আলেকজান্ডার ব্লক, মায়াকোভস্কির কবিতায় তরুণ কবি নিবিষ্টচিত্ত হন। বস্তুত শেষ তিরিশ থেকেই এই নতুন আধুনিকতা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং চল্লিশ দশকে সামগ্রিকরূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই দশকের শুরুতেই ঢাকার তরুণ কবিসমাজ যখন কবিতা লিখেছেন তখন ইংলন্ডের অডেনগোষ্ঠীর রচনার সঙ্গেও তাঁরা একাত্মতা অনুভব করেন। একদিকে বিষ্ণু দে ও সমর সেনের কবিতায় ঢাকার কবিরা এলিয়ট প্রবর্তিত কাব্যের আধুনিকতার সন্ধান পেলেন, অন্যদিকে তেমনই

সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা কবিতাকেই পুরোপুরি আধুনিকতার মর্যাদা দেয়া হয়েছিলো। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য বেশ আলোচ্য হয়ে উঠেছিলো। ফলে তিরিশের যুগের কবিতার আধুনিকতার সঙ্গে চল্লিশ দশকের কবিতার আধুনিকতার পার্থক্য সেই সময়ে স্পষ্ট হযে উঠতে দেরি হয় নি।

একথা সত্য যে প্রতিনিধিস্থানীয় প্রায় সব লেখকের রচনাই তাদের নিজেদের কালে আধুনিক বলে বিবেচিত হযে থাকে। ঢাকা থেকে তিরিশের প্রথমদিকে যখন 'প্রগতি' বেরুলো তখন তার পাতায় যে সব কবির কবিতা প্রকাশিত হয়েছিলো তাঁদের অনেকেই পরবর্তীকালে আধুনিক কবি বলেই চিহ্নিত হয়েছিলেন। কিন্তু চল্লিশ দশকে দায়বদ্ধতা কবিতার একটি প্রধান শর্ত হওয়ায় কবিতার আধুনিকতা একটি বিশেষ মাত্রা পায়। ঢাকায় চল্লিশ দশকের শুরুতেই প্রগতি লেখক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা দৃঢ়মূল হওয়ায় নতুনতর দর্শন ও সমাজচিন্তাব পরিবেশে তরুণতর কবিদের বচনায়ও ধীবে ধীরে রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তন ঢাকা থেকে ১৯৪০-এ সোমেন চন্দ কর্তৃক প্রকাশিত 'ক্রান্তি' সঙ্কলনে যে ক'টি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিলো সেগুলো লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। উল্লেখ্য, তিরিশ দশকে ঢাকা থেকে পুবোপুবি লিরিকধর্মী কবিতা যে-কবি লিখেছিলেন সেই কবির চল্লিশ দশকের কবিতায় পাওযা গেলো সমাজচিন্তার নতুন পরিবেশে বিষয়বস্তু আঙ্গিকের দ্রুত পবিবর্তন। জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, সমর সেন প্রভৃতি এই সময়কার কবিতার দৃষ্টান্ত ঢাকার প্রগতিপরায়ণ কবিদেব সামনে ছিলো একথার উল্লেখ এ প্রসঙ্গে অপরিহার্য।

শেষ তিরিশ এবং চল্লিশ দশকেব শুরুতেই এক ধরনের দুর্বোধ্যতা কবিতায সংক্রামিত হযেছিলো। কিন্তু চল্লিশ দশকেব ঢাকায কবিতায় দায়বদ্ধতা স্বীকাব করে নিয়েছিলেন তরুণ প্রগতিশীল কবিসমাজ, ফলে এই দুর্বোধ্যতা তৎকালীন কবিতায় তেমন প্রশ্রয় পায় নি। স্বীকাব কবে নেওয়া হয়েছিলো কবিতার সৃজনশীলতার সার্থকতা পাঠকেব সঙ্গে অন্তরঙ্গতায়। তিরিশেব দশকে মোহিতলাল ও নজরুলের কবিতা ঢাকার কাব্যপাঠকেব প্রিয় ছিলো। চল্লিশ দশকে দেখা গেলো ঢাকার ছাত্রসমাজ ও অধ্যাপকরা জীবনানন্দ সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে-ব কবিতার আধুনিকতা সম্পর্কে আলোচনা করছেন। ঢাকায় একটি বিতর্কের সূচনা হয়েছিলো কবি জসিমউদ্‌দীনের নকশী কাঁথার মাঠ-এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের পর। জসিমউদ্‌দীন গ্রামবাংলার কবি, যথেষ্ট আধুনিক নন এরকম একটা মনোভাব কেউ কেউ ব্যক্ত করায়, উত্তরে জসিমউদ্‌দীন জানিয়েছিলেন যে তাঁর কবিতাই প্রকৃত আধুনিক কবিতা যেহেতু ছন্দে ও ভাষায় তা সমকালীন গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও জীবনধারাকে রূপ দিয়েছে। কিন্তু এই অভিমত মেনে নেয়া সে সময়ে সহজ ছিলো না। কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া তরুণ কবিরা বৃহত্তর পটভূমিতে কবিতার আধুনিকতাকে বিস্তৃত করতে চেয়েছিলেন। ইংরেজ, মার্কিন ও ইউরোপীয় কবিদের কবিতা সম্পর্কে তাঁদের আগ্রহ যথেষ্টই ছিলো এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সে সময়কার ইংরেজি সাহিত্যের সিলেবাস-এ চসর থেকে ভিক্টোরীয় যুগের কবিদের কবিতা অন্তর্ভুক্ত থাকলেও সিলেবাসের বাইরের কবিদেব বহু কবিতার আলোচনা ছাত্রসমাজে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছিলো।

দুঃসময়ের মুখোমুখি

ঢাকা শহরে বৈকালিক ভ্রমণের উপযুক্ত জায়গা ছিল বুড়িগঙ্গা নদী তীরবর্তী বাকল্যাণ্ড বাঁধ। নদীতীর বরাবর প্রায় দু'কিলোমিটার দীর্ঘ শানবাঁধানো এই বাঁধের কিছুটা অংশ ছিল সবুজ ঘাসে আবৃত। ভ্রমণ করতে করতে ক্লান্তি বোধ করলে মসৃণ ঘাসের ওপর বসে জিরিয়ে নেওয়া যেতো যেকোনো জায়গায়। ১৯৩৭–৩৯–এ আমাদের এই বাকল্যাণ্ড বাঁধের ধারেই সান্ধ্য আড্ডা চলতো। তখন কলকাতা থেকে কবিতা পত্রিকা বেরুচ্ছে, পরিচয় ত্রৈমাসিক থেকে মাসিকে রূপান্তরিত হয়েছে; সাপ্তাহিক দেশ এবং সিনেমাঘেঁষা সাপ্তাহিক খেয়ালি দীপালি স্বদেশ ইত্যাদি নিয়মিত বেরুচ্ছে। আমাদের লেখার জায়গার অভাব ছিলো না, এইসব পত্রপত্রিকায় ইচ্ছেমতো লেখার সুযোগ পেয়েছি। কলকাতার বহু মাসিক সাপ্তাহিক পত্রিকা ঢাকায় তখন প্রেরিত হতো। সদরঘাটে একটি স্টলে এইসব পত্রপত্রিকা ছাড়া খুব হালেব কাগজও পাওয়া যেত। প্রতিদিনই আমাদের কাজ ছিল সদবঘাটে সেই স্টলে এসে নতুন পত্রপত্রিকাব সন্ধান করা। সচিত্র ভারত সাহানা অগ্রগতি ইত্যাদি পত্রিকা হাতে তুলে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতাম। আশু চট্টোপাধ্যায় বিরাম মুখোপাধ্যায় নির্মল ঘোষ তখন অগ্রগতি চালাচ্ছেন। মণি বাগচি, এখনকার দিনে যিনি বহু জীবনীগ্রন্থের লেখক হিসেবে পরিচিত, ঘনিষ্ঠভাবেই যুক্ত ছিলেন এই পত্রিকার সঙ্গে। অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল সম্পাদিত বাতায়ন সাপ্তাহিক পত্রও নিযমিত ঢাকায় আসতো। তখন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে প্রবাসী ভাবতবর্ষ মাসিক বসুমতী জোর কদমে চলেছে; রবীন্দ্রনাথ জীবিত এবং সক্রিয়, কবিতা ত্রৈমাসিকে তাঁব আফ্রিকা কবিতাটি আমাদের মতো তরুণ সদ্য–লেখকদের আকর্ষণ করেছে এবং কল্লোল যুগের পাশাপাশি বেশ কযেকজন নতুন শক্তিমান লেখকের আবির্ভাবও সম্ভব হযেছে।

নবাববাড়িব পেছন দিকে বাকল্যাণ্ড বাঁধের তৃণাচ্ছাদিত মাটিতে সন্ধ্যার দিকে আমরা, তরুণ লেখকরা মিলিত হতাম। কলকাতা থেকে সদ্যপ্রেরিত সব পত্রপত্রিকাকে কেন্দ্র কবে যুক্তি তর্ক গল্প। ১৯৩৯ পর্যন্ত এই অবস্থা অব্যাহত ছিলো। প্রধানত জীবনানন্দ বিষ্ণু দে সুধীন্দ্রনাথ দত্তেব কবিতা নিয়ে আলোচনা চলতো। যেমন উঠতি লেখকের বেলায হযে থাকে, তখন গল্প কবিতা প্রবন্ধ সবই লিখছি। অগ্রগতিতে বেরুলো প্রথম একটি গল্প এবং পরে ধারাবাহিক বড়ো গল্প 'নিরুদ্দেশ মেঘ'। কৃষ্ণেন্দু ভৌমিকের সাপ্তাহিকে রহস্যগল্প 'করবীর ইঙ্গিত', সেই প্রথম আগাথা ক্রিস্টির প্লট থেকে ধারকরা, প্রকাশিত হয়েছিলো। অন্য সব পত্রিকায় কবিতা লিখতাম কিন্তু স্বদেশ পত্রিকায় এই সময় ও পরে বেশ কয়েকটি গল্পও আমার বেবিয়েছিলো। কোনো গল্পকেই আমি এখন স্বীকার করি না, বলা বাহুল্য। 'হে ললিতা ফেরাও নয়ন' (বুদ্ধদেব বসুর আধুনিক বাংলা কবিতায় সঙ্কলিত) 'আমি নহি স্বর্গের দেবতা' (যে কবিতাটি কবিতা ত্রৈমাসিকে ছাপতে গিয়ে সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুকে বিলক্ষণ অসুবিধায় পড়তে হয়েছিলো) এই সময়েই লেখা। তখন পর্যন্ত কমিটেট লেখক বলে যে কেউ থাকতে পারে ভাবতে পারতুম না।

১৯৩৯–এ ঢাকায় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের কাজ শুরু হওয়ার সময় থেকে আমার চিন্তা

ও ভাবনায়ও যেন নতুন কিছু যোগ হলো। বাকল্যাণ্ড বাঁধের ধারে সান্ধ্য ভ্রমণের সময় একদিন সোমেন চন্দ জানালো যে ঢাকায় প্রগতি লেখক সঙ্ঘ সংগঠিত হচ্ছে এবং আমাকে যোগ দিতে ও সাহায্য করতে অনুরোধ জানালে আমি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলাম। সন্ত্রাসবাদী দল থেকে বিযুক্ত হবাব পর কিছুকাল দায়মুক্ত ছিলাম, সোমেনের অনুরোধে আবার দায়বদ্ধ হতে চললাম একথা তখন একবারও মনে জাগে নি। প্রগতি লেখক সঙ্ঘেব প্রথম সভায় যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের প্রায় সকলকেই ভালো লাগলো তাঁদের কথাবার্তা ও আলোচনা শুনবার পর। রণেশ দাশগুপ্ত, সরলানন্দ সেন, অমৃত দত্ত, অচ্যুত গোস্বামী, সোমেন চন্দ ছাড়াও আরো কেউ কেউ ছিলেন। এক বছরের মধ্যেই ঢাকা প্রগতি লেখক সঙ্ঘ দস্তুরমতো একটি প্রভাবশালী সংগঠনে পরিণত হয়েছিলো। সোমেনকে আমি জানতাম ছেলেবেলা থেকেই কেননা ১৯৩০ পর্যন্ত একই পাড়ায় আমবা বসবাস করতাম। বড়ো হয়ে দু'জনেই লিখতে শুরু করি এবং ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। দেশ পত্রিকায় সোমেনের প্রথম ছোট গল্প প্রকাশিত হযেছিলো ১৯৩৭-এ, তখন তার বয়স ১৭ বছরের বেশি নয়। ১৯৪০-এ যখন পশ্চিম ইউরোপে যুদ্ধ শুরু হয়েছে এবং হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া ও অন্যান্য দেশ পদানত করেছে সেই সময় বাকল্যাণ্ড বাঁধের পরিবর্তে আমাদের সান্ধ্য আড্ডা বসতে শুরু করেছে ভিক্টোবিয়া পার্কে, অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি এলাকায। তখন ঢাকা শহরে বাস চলাচলের ব্যবস্থা ছিলো না, অধিকাংশ জায়গায পায়ে হেঁটে কিংবা সাইকেলে যাতায়াত করতে হতো। ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জের দূরত্ব ছিল দশ মাইল, সেখানে যেতে হলে অবশ্য বাসে যেতে হতো; ভিক্টোরিযা পার্কের কাছ থেকে বাসগুলো ছাড়তো। ভিক্টোরিয়া পার্কে আমরা যখন বসতাম তখন থেকেই বয়স্কমন্যতাব চিহ্ন আমাদেব মুখেচোখে, দেশ-বিদেশের আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি বেশ গভীরভাবেই আমাদের মনকে নাড়া দিতে শুরু কবেছিলো। এই সময আমি ও সোমেন ঢাকা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত সাহিত্যানুষ্ঠানে যোগ দিযেছিলাম, পুলিশের বিরূপ রিপোর্ট থাকায় দু'তিনটে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ কবার পর আমাদের উভয়ের সঙ্গে ঢাকা বেতারের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। সোমেনের মৃত্যুর অনেক পবে অবশ্য ১৯৪৪-এ ঢাকা রেডিয়ো কর্তৃপক্ষ আমাকে পুনরায় আহ্বান জানান এবং দেশ বিভাগেব পরেও ১৯৪৯ পর্যন্ত ঢাকা বেতারের সঙ্গে সম্পর্ক সম্মানজনকভাবেই বজায় ছিলো। প্রবন্ধ ও কবিতাপাঠ ছাড়াও রেডিয়োর সাপ্তাহিক সাহিত্যবাসরেও বেশ কিছুকাল অংশগ্রহণ করেছিলাম। বেতার জগতেও কযেকটি বেতারস্থ লেখা প্রকাশিত হয়েছিলো।

১৯৩৯ সনে কলকাতা থেকে 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘে'র উদ্যোগে 'প্রগতি' নামের সঙ্কলন গ্রন্থ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিলো। রণেশবাবু প্রস্তাব করলেন ঐ ধরনের একটি সঙ্কলন যেন আমরা ঢাকা থেকে প্রকাশ করি। আরো স্থির হলো যে ঢাকা জেলা 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘে'র লেখকরাই শুধু ঐ সঙ্কলনে লিখবেন। তদনুযায়ী ১৯৪০ সালে বেরুলো 'ক্রান্তি' নামের ১৬০ পাতার একটি সঙ্কলন। লেখকসূচির অন্যতম ছিলেন রণেশকুমার দাশগুপ্ত, সোমেন চন্দ, অচ্যুত গোস্বামী, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, সরলানন্দ সেন এবং আরো কেউ কেউ। প্রগতিশীল চিন্তাধারার

পরিপোষক এরূপ একটি সাহিত্য সঙ্কলন প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশ সাড়া পড়ে যায় এবং কলকাতার লেখক সমাজও এই লেখক গোষ্ঠীকে স্বাগত জানান। ঢাকা 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘে'র পক্ষ থেকে সোমেন চন্দ এই গ্রন্থেব প্রকাশক হয়েছিলেন। তাঁর অন্যতম বিখ্যাত গল্প 'বনস্পতি' এই সঙ্কলনেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো। এই সঙ্কলনটি বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ কয়েকজন নতুন লেখককে আমরা সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলাম। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জীবন চক্রবর্তী ও বণেন মজুমদার। এঁরা দু'জনেই দু'চারটি গদ্য রচনায় অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিযেছিলেন। জীবন চক্রবর্তী দেশ বিভাগের কিছু আগে বিমানে বর্মা যাবার পথে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন। রণেন মজুমদার ঠিক ঐ সময়েই কলকাতায় চলে আসেন এবং বস্তিতে বসবাস করতে শুরু করেন শ্রমজীবী জনসাধারণের জীবন সংগ্রাম সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানবার আশায। সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুশিক্ষিত এই যুবক আত্মীযস্বজনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না বেখে দারিদ্র ও ক্ষুধাব বিরুদ্ধে সংগ্রাম কবে গিযেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণও কবেছিলেন। মার্কসবাদে বিশ্বাসী চিন্তার জগতে পবিশুদ্ধ এই যুবক যেন দিশেহাবা হয়ে পড়েছিলেন; তাঁব এ ধরনের মৃত্যুবরণের তাৎপর্য তাঁব বন্ধুদের অনেকেই হৃদয়ঙ্গম কবতে পারেন নি। 'ক্রান্তি' সঙ্কলন প্রকাশেব পর থেকে ঢাকা 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘে'র আসর জমজমাট হয়ে উঠেছিলো। এই সময থেকে তরুণ মুসলমান লেখকবাও কেউ কেউ যাতায়াত শুরু করেন। ১৯৪১ সনের জুন মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন হিটলার বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হবার পবে 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘ' 'ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘে' রূপান্তরিত হলে ঢাকা 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘে'র উদ্যোগে ঢাকায 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' সংগঠিত হয়। এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন বর্তমান প্রবন্ধকার এবং দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই একজন কৃতী ছাত্র।

জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবাব জন্যে এবং সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নেব নতুন সমাজ ও সভ্যতার বহুমুখী অগ্রগতির বিষয়টি তুলে ধরবার জন্যে ঢাকা শহরের সদরঘাটের সন্নিকট ব্যাপটিস্ট মিশন হলে একটি সপ্তাহব্যাপী চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। আজ শুনতে অবাক লাগবে যে তখনকার দিনে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজজীবন সম্পর্কিত চিত্রাবলী সংগ্রহ সহজসাধ্য ব্যাপার ছিলো না। অল্প সময়ের মধ্যে যেসব বই দ্রুত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিলো তা থেকেই বিভিন্ন ছবি ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে স্থানীয় চিত্রশিল্পীদের সাহায্যে বড়ো আকাবের প্রায় শ' খানিক ছবির এই প্রদর্শনী যথাসময়ে উদ্বোধন করা হয়েছিলো। ঢাকা শহরে এই ধরনেব একটি ব্যাপার তখনকার দিনে একেবারেই নতুন। লক্ষ্য করা গেল, প্রতিদিন সন্ধ্যায় চিত্রপ্রদর্শনী গৃহে অজস্র লোকের সমাবেশ। অধ্যাপক, লেখক, সঙ্গীতশিল্পী, ক্রীড়াবিদ, বিজ্ঞানী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ পর্যন্ত সকলেই উৎসাহের সঙ্গে এই চিত্র প্রদর্শনী দেখতে ভিড় করেছিলো। হল ঘরের প্রবেশপথে একটি টেবিলের ওপর ন্যস্ত খাতায় ফিরে যাবার সময় অনেক দর্শকই তাঁদের মন্তব্যও লিখে রেখে যেতে ভোলেন নি। মনে পড়ে সেই প্রিয়দর্শিনী কাজলরেখা সেনগুপ্তার কথা যিনি জানিয়েছিলেন,

এ রকম একটা অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে আগে আর হয় নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন এবং নাম দিয়েছিলেন 'সোভিয়েত মেলা'। তরুণ লেখক সোমেন চন্দ ছিলেন এই প্রদর্শনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের মধ্যে সবচাইতে প্রাণবান ও উৎসাহী। প্রদর্শনী গৃহে দিনের পর দিন ভিড় বেড়েই চলেছিলো অথচ চিত্রগুলোর পটভূমি ও তাৎপর্য দর্শকদের বুঝিয়ে দেবার মতো অভিজ্ঞ স্বেচ্ছাসেবক বা সংস্কৃতি কর্মীর সংখ্যা তেমন বেশি ছিলো না। সোমেন ছিলেন চিত্রব্যাখ্যাতাদের পুরোভাগে এবং দেখা গেল যেখানেই সোমেন ছবি সম্পর্কে কিছু বলছেন সেখানেই দর্শকরা এসে জড়ো হচ্ছেন, ভিড় বাড়ছে। ব্যাপটিস্ট মিশন হলে সোভিয়েত চিত্র প্রদর্শনীর অসামান্য সাফল্যের পব ঢাকার বাইবে অন্যান্য স্থানেও এই ধরনের কযেকটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিলো। স্থির হয়েছিলো সোভিয়েত সুহৃদ সমিতিব পক্ষ থেকে ঢাকায একটি ফ্যাসিবাদবিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৪২ সনের ৮ মার্চ এই সভায় যোগদানের পথে সোমেন চন্দ নৃশংসভাবে খুন হন।

সোমেন চন্দের অকালমৃত্যু আমার সাহিত্যচেতনাকে গভীরভাবে নাড়া দিযে গিয়েছিলো। প্রগতি লেখক সঙ্ঘেব অন্য তরুণ বন্ধুরাও নতুন কবে ভাবতে শুরু করেছিলেন। ১৯৪২-এ দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক পবিস্থিতি অত্যন্ত জটিল। ইউবোপের যুদ্ধ আফ্রিকায ও সুদূর প্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়েছে; স্বদেশেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের ছাযা ক্রমবর্ধমান। ১৯৪০-এ আমাদের সাংস্কৃতিক ভাবনাকে রূপ দিতে চেয়েছিলাম ক্রান্তি নামের সঙ্কলন গ্রন্থটিতে। সোমেনের তিরোধান আমাদেব হতম্লান করার পরিবর্তে আরো প্রত্যয়দৃঢ় করলো, সবাই মিলেমিশে প্রকাশ করলাম ঢাকা থেকে প্রতিবোধ পত্রিকা।

সোমেনেব মৃত্যুর অল্প কিছুকাল পরেই ঢাকা জেলা প্রগতি লেখক সঙ্ঘের মুখপত্ররূপে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও অচ্যুত গোস্বামীর সম্পাদনায় 'প্রতিবোধ' পাক্ষিক পত্র আত্মপ্রকাশ করে। ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিলো ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯। এই সময় সত্যেন সেন, অজিতকুমার গুহ, সরলানন্দ সেন, অসিত সেন, রণেশ দাশগুপ্ত, মুনীর চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম, সানাউল হক, সৈয়দ নূরুদ্দিন, রণেন মজুমদার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযেব কযেকজন অধ্যাপক 'প্রতিবোধ' প্রকাশেব ব্যাপারে নানা দায়িত্ব গ্রহণ করে এই পত্রিকার প্রকাশ অন্তত কযেকটি বছর অব্যাহত রাখতে সাহায্য কবেছিলেন।

ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলন যখন দানা বেঁধে উঠেছে তখন বোঝা গেলো সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করতে হলে কিছু সময়োচিত গণসঙ্গীত বচনা করা দরকার। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ-নজরুল যেমন এখন, তেমনি তখনকার দুর্যোগপূর্ণ সময়েও ছিলেন মুখ্য অবলম্বন। কিন্তু গণসঙ্গীতের প্রবর্তনও দরকার হয়ে পড়েছিলো। মনে পড়ছে, এই সময় এগিয়ে এসেছিলেন একজন তরুণ, সাধন দাশগুপ্ত। তিনি নিজে গান লিখতেন এবং গাইতেন। মাত্র দু-চার জন সঙ্গী নিয়ে তিনি সে সময় পূর্ববঙ্গের নানা সভায় লোকসঙ্গীতের সুরে নানা গান পরিবেশন করেন। গ্রামের বিভিন্ন স্তরের লোকের কাছে ফ্যাসিস্টবিরোধী ও স্বদেশপ্রেমে অনুরণিত এই গানগুলো একসময় খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিলো। লোকসঙ্গীতের সুরে তিনি শহীদ সোমেন চন্দকে নিয়ে স্মরণীয় একটি গান লিখেছিলেন। এছাড়া ঢাকায়

মুসলিম ওস্তাগরদের ছাদ–পিটানো গানের সুরের অনুসরণে তাঁর 'দে দে স্ট্যালিন ভাই, পায়ে পড়ি ছাইড়া দে, আর্য হিটলার মরি লাজেতে' গানটি সে সময় খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলো। সত্যেন সেন এই সময়ই তাঁর গণসঙ্গীতগুলো লেখা শুরু করেছিলেন।

সমগ্র বাংলায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্যাসিস্টবিরোধী প্রগতিশীল পত্র–পত্রিকার সংখ্যা খুব বেশি ছিলো না। কোলকাতা থেকে প্রকাশিত 'পরিচয়' ও 'অগ্রণী' এবং 'অরণি' পত্রিকার ভূমিকা এ সময় সুস্থ চিন্তাব সহায়ক ছিলো। এছাড়া ছিলো হাওড়া থেকে প্রকাশিত সাহিত্যপত্র 'অভিবাদন' এবং ঢাকার 'প্রতিরোধ'। ১৩৪৯–এ প্রকাশিত হয়েছিলো 'প্রতিরোধ'–এর শারদীয় সংখ্যাটি। এই সংখ্যায় ফ্যাসিস্টবিবোধী শিল্পসুষমাযুক্ত যে কয়েকটি কবিতা ছাপা হয়েছিলো সম্পূর্ণ আলাদা করে তাদের উল্লেখ অনিবার্য। কবিতাগুলো লিখেছিলেন বিমলচন্দ্র ঘোষ ('শ্বাপদ') জ্যোতিবিন্দ্র মৈত্র ('শ্লিট ট্রেনচ'), মনীন্দ্র রায় ('সূর্যের মুক্তি'), সমর সেন ('দুর্দিন'), এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায় ('স্টালিনগ্রাদ')। ঐ বছবেই শারদীয় 'অভিবাদন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো আমাব ফ্যাসিস্টবিরোধী দীর্ঘ কবিতা : 'সাম্রাজ্যভস্মেব পূর্বে'। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শান্তিবঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

দুর্ভিক্ষের বছর ঢাকা শহরে নতুন করে দেখা দিলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ফ্যাসিস্টবিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেসব হিন্দু–মুসলিম তরুণ ছাত্র ও লেখক একাত্ম হয়েছিলেন এবাব তারাই বিভিন্ন এলাকায় ছড়িযে পড়লেন দাঙ্গাব ক্ষয়কারী আবহাওযাকে প্রতিবোধ করবাব জন্যে। এ প্রসঙ্গে 'প্রতিরোধ' পত্রিকার ১লা শ্রাবণ ১৩৪৯–এর 'নানা প্রসঙ্গে' লেখা হয়েছিলো : "... যারা সম্প্রদায় ছাড়া সমাজের বড় কোনো রূপ কল্পনা করতে পারে না, তারাও জানে না, তাদের নিজ সম্প্রদাযের কারা সর্বস্ব হারালো। ...এই সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ধোঁকাবাজ ছাড়া আর কি হতে পারে?...ঢাকা শহরের দুর্ভাগ্য যে, সাধারণ লোকের কাছে এখনও এবা প্রতিপত্তিশালী। এইজন্যই, বেছে বেছে ঢাকা শহরটাকে গুণ্ডারা তাদের হত্যাব্যবসায়ের রাজধানী করে তুলেছে। সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা জনসাধারণের চিন্তাস্রোতকে ঘোলা করে রাখে জেনেই, গুণ্ডারা জনসাধারণকে নাচাবার সাহস পায়।...আমাদেব চিন্তাকে নির্মল করতে হবে। আমাদের চিন্তাকে মুষ্টিমেয় স্বার্থপব লোক যাতে ঘোলা করে না রাখতে পারে, সে ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।' দাঙ্গার ব্যাপারটা উল্লেখ করতে হলো এই জন্যে যে যুদ্ধ, দাঙ্গা ও দুর্ভিক্ষ এই তিনের সম্মিলিত কালো হাওয়ায় মুখ রেখেই বিবেকবান দেশপ্রেমিক শিল্পী–সাহিত্যিকদের সে সময় ফ্যাসিস্টবিরোধী সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছিলো। ১৯৪২–এর ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর কোলকাতায় যে নিখিল বঙ্গ ফ্যাসিস্টবিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে ঢাকা প্রগতি লেখক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে ডেলিগেট হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও অচ্যুত গোস্বামী। ২০ ডিসেম্বর রাত্রিতে আসন্ন ফ্যাসিস্ট আক্রমণ ও লেখক সঙ্ঘের সমকালীন দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা শেষ হবার পরেই মধ্য রাত্রিতে জাপানী বোমারু বিমান রাত্রির স্তব্ধতাকে ভঙ্গ করলো, দুশমনদের মুখোমুখি হবার সুযোগ মিলল কোলকাতার দেশপ্রেমিক সাহিত্যিক ও শিল্পীদের। 'ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলনের পরে' এই শিরোনামায় ১লা ফাল্গুন, ১৩৪৯–এর 'প্রতিরোধ' পত্রিকায় লেখা হয়েছিলো : 'কোলকাতার সম্মেলনের পর

ইতিমধ্যে দু'মাস কেটে গেছে, এই সময়ের মধ্যে সঙ্ঘের মুখপত্র প্রতিরোধ সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন স্থানের অধ্যাপক ছাত্র ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের কাছে স্থানীয় প্রগতি লেখকরা উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রগতি লেখকদের উদ্দেশ্য ও উপস্থিত কার্যসূচি সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে প্রগতি লেখক সঙ্ঘের যে সাপ্তাহিক বৈঠক প্রতি রবিবার বসে থাকে তার উপস্থিত অনুরাগীর সংখ্যাও ক্রমশই যে বেড়ে চলেছে এটাকে নিশ্চয় একটা শুভ লক্ষণ বলা যায়। ঢাকার মতো দাঙ্গাবিধ্বস্ত ও পঞ্চমবাহিনী কন্টকিত শহরে সাহিত্যিকদের আহ্বানে দেশপ্রেমিকবা যে সাড়া দিয়েছেন ও দিচ্ছেন তা স্মরণে রেখেই আমরা কোলকাতাব 'ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘকে' দস্যুর আক্রমণের প্রাক্কালে জানাতে চাই যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষাব দায়িত্ব তাঁদেব মতো আমরাও অক্ষরে অক্ষরে পালন কববো, সঙ্গে থাকবে আমাদের পাশাপাশি শ্রমজীবী, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী বিপ্লবী জনগণ।'

সাম্যবাদের আকর্ষণে

১৩৫০-এব মন্বন্তর শুরু হবাব পবেই সাবা বাংলাদেশেব জনগণের সঙ্গে আমবাও অভূতপূর্ব দুর্যোগেব মুখোমুখি হয়েছিলাম। চাল, তেল, নুন যেমন পাওয়া যায় না তেমনই দুষ্প্রাপ্য মুদ্রণেব কাগজ। 'প্রতিরোধ' পত্রিকাব প্রকাশ অনিয়মিত হযে পড়ল। শেষের দিকে মিলেব কাগজের অভাবে দেশি তুলোট কাগজেও দু'তিনটি সংখ্যা ছাপা হয়েছিলো। এই সময় প্রতিরোধ পাবলিশার্স নাম দিয়ে ঢাকায় জি. ঘোষ লেনে একটি পুস্তক প্রকাশক ও বিপণন কেন্দ্রও খোলা হয়। দেশি-বিদেশি প্রগতিশীল বই ও পত্র-পত্রিকা ছাড়াও ঢাকার লেখকদের কিছু কিছু বই ও পুস্তিকা প্রতিরোধ পাবলিশার্স-এব তরফ থেকে প্রকাশিত হয়েছিলো। উল্লেখ্য, এই ধরনের বইযের অন্যতম ছিলো অনিল মুখার্জির 'সাম্যবাদেব ভূমিকা', সরলানন্দ সেনের 'মাও সে তুং' এবং সোমেন চন্দেব 'সংকেত ও অন্যান্য গল্প'। এছাড়া সোমেনের স্মৃতিতে ঢাকা কোর্ট হাউস স্ট্রিটে সোমেন পাঠাগাব নাম দিয়ে একটি নতুন পাঠাগারও স্থাপিত হযেছিলো। জি. ঘোষেব গলিতে একটি ত্রিতল বাড়ির একতলায় ছিলো প্রতিরোধ পাবলিশার্স, দোতলায় ঢাকা প্রগতি লেখক সঙ্ঘেব ঘর যেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সাহিত্যসভা অনুষ্ঠিত হতো। ঐ সময় ঢাকাব লেখকদের উদ্যোগে বেশ কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিলো। বিভিন্ন সমযে যাঁরা কলকাতা থেকে এইসব অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ঢাকায় এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিনয় রায়, বিনয় ঘোষ, গোপাল হালদারের নাম মনে পড়ছে। এক সময় ঢাকা শহরের ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও অধ্যাপকদের 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘে'র তরুণ লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটেছিলো। এঁদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পরিমল রায়, অমিয়কুমার দাশগুপ্ত, পৃথ্বিশ চক্রবর্তীর নাম উল্লেখ্য। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং কাজী মোতাহার হোসেনের উৎসাহ থেকেও 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘ' বঞ্চিত হয় নি। এক সময় পুরানা পল্টনের একটি বাড়িতে প্রগতি লেখকদের উদ্যোগে একটি সাহিত্যের আলোচনাচক্রে সভাপতিত্ব করেছিলেন প্রফেসর সত্যেন্দ্রনাথ

বসু। সংস্কৃতি কেন্দ্র ঢাকা শহরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সমাজের এই সক্রিয় ভূমিকা পাকিস্তান হবার পরে আরো ব্যাপকতা লাভ করেছিলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো ছিলো ছাত্র সমাজের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মের ক্ষেত্র। ছাত্রজীবনে আড্ডার মৌতাত সেখানে অনেকের মতো আমিও উপভোগ করেছিলাম। কার্জন হলে হতো বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অনুষ্ঠান। প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের বাৎসরিক প্রীতি-সম্মেলন ছিলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম আকর্ষণ।

চল্লিশের যুগে ঢাকা জেলা কমিউনিষ্ট পার্টিব সদস্য ছিলাম কিছুকাল, সম্ভবত ১৯৪৩-৪৪-এ। প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি কখনো করি নি, দেয়ালে পোস্টার লাগাই নি কিংবা রাজনৈতিক সভার মঞ্চ থেকে কখনো বক্তৃতা করি নি। কিন্তু রাজনীতি ও সাহিত্যকে মিলিযে নিতে সচেষ্ট ছিলাম। গর্কি শলোকভ ব্যালফ ফক্স আঁন্দ্র মার্লো কডওয়েল কর্নফোর্ড ব্রেশ্‌ট তখনই আমার মতো তরুণ অনেক লেখককেই নতুন দিগন্তের সন্ধান দিযেছিলেন। রাজনীতি শিল্পসাহিত্যকে অনেক সময় পঙ্গু না কবে নতুন ও সজীব তাৎপর্যে চিহ্নিত করতে পারে এ সত্য হৃদয়ঙ্গম কবতে পেবেছিলাম। সোমেন চন্দেব বচনায়ও পেলাম এই পথের নিশানা। ১৯৪৪-এ শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত আমার দীর্ঘ কবিতাটি এই প্রত্যয় থেকেই লেখা। কবিতার নাম 'ভাবীকাল', গ্রন্থাকারে অদ্যাবধি অপ্রকাশিত।

পুলিশ রিপোর্ট বিরুদ্ধে ছিল বলে এম.এ পাস কবেও সরকারি চাকরি পাই নি। অথচ যুদ্ধেব সময় খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগে, ডেব্‌ট সেটেলমেন্ট বোর্ড-এ আমাব পরিচিত ছাত্রবন্ধুদের অনেকেই চাকবি পেয়ে গিযেছিলেন। ঢাকায় তখন বেসরকারি চাকরি বলতে ছিল স্কুল মাস্টারি, সদ্য গজিয়ে ওঠা নানা ব্যাঙ্কে কেরানির কাজ, কোনো বড়ো ঠিকাদাবের অধীনে সুপারভাইসরের কাজ। খুঁটির জোর থাকলে অবশ্য নানা ইন্সিওরেন্স কোম্পানিতেও ঢুকতে পাবা যেতো। আমার এক বন্ধু সরকারেব পরিচালনাধীন এআরপি, সিভিল ডিফেন্স, রিলিফ অফিসারের চাকরি ইত্যাদিতে আমি কেন কোথাও ঢুকি নি শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর কাছে পুলিশ রিপোর্টের কথা উল্লেখ করতেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

আমার পক্ষে তখন সবচেয়ে সহজ ছিল বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক হওয়া এবং ১৯৪৩-এ সামযিকভাবে একটি বেসরকারি স্কুলে কিছুকাল শিক্ষকতাও কবতে হয়েছিলো। স্কুলে কাজ করার সময় একজন তরুণ শিক্ষকের সঙ্গে আমার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল, তিনি অজিত গুহ। আদি নিবাস কুমিল্লায়, অজয় ভট্টাচার্য, সঞ্জয় ভট্টাচার্যদের সঙ্গে শামিল হয়েছিলেন যখন গোড়ার দিকে পূর্বাশা পত্রিকা কুমিল্লা থেকে বেরোয়। অজিত গুহ ভদ্র ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন, সাহিত্যের বিষয়ে তাঁর চিন্তাভাবনাও ছিল বেশ উন্নত মানের। তখন, সেই যুদ্ধের সময়, টি এক্সপানসন মার্কেট বোর্ড ঢাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে টিফিনের সময় শিক্ষকদের বিনামূল্যে চা পরিবেশন করতো। সেই চা খেতে খেতে আমি ও অজিত গুহ দেশকালপাত্র ও সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে আলাপ করতাম। অল্প কিছুকালের মধ্যে অজিত গুহ প্রগতি লেখক সঙ্ঘের একজন সক্রিয় কর্মী হয়ে উঠেছিলেন। সঙ্ঘ থেকে প্রকাশিত ক্রান্তির চতুর্থ সঙ্কলনের (আশ্বিন ১৩৫৪) তিনি অন্যতম সম্পাদক হয়েছিলেন। ঐ সঙ্কলনে ক্রিস্টফার কডওয়েলের মায়া ও বাস্তব (Illusion and Reality) গ্রন্থের একটি অংশেরও

অনুবাদ তিনি করেছিলেন। ১৯৫২ সালে যখন ঢাকায় ভাষা আন্দোলন বেশ জোরদার হয়ে ওঠে তখন অজিত গুহ ছিলেন অন্যতম প্রবক্তা এবং ঢাকা জগন্নাথ কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি বাংলা সাহিত্য পড়িয়েছিলেন। সত্তর দশকের শুরুতে তিনি হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

১৯৪৪–এর কোনো সময় একদিন ছোট কাকা এলেন আমাদের বাড়িতে বাবার সঙ্গে আলাপ করতে। তখন নারায়ণগঞ্জে তাঁর সিগারেটের ব্যবসা যুদ্ধের দৌলতে টাকার মুখ দেখেছে। কুর্মিটোলা ও তেজগাঁওতে তখন ইংরেজ ও মার্কিন সৈন্যদের ছাউনি। কাকা বড়ো সাহেবদের ধরে সাপ্লাইয়ের কাজ পেয়েছিলেন। নারায়ণগঞ্জে টানবাজারের এক অপরিসর গলিতে অপ্রশস্ত সামনের ঘরে অফিস, পেছনে গোডাউন। প্রায়ই সাহেবরা আসতো, মালপত্র নিয়ে চলে যেতো বিরাট বিরাট মিলিটারি ট্রাকে চড়ে। মিলিটারি সাহেব এবং নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গ সৈন্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার জন্যে একজন শিক্ষিত ব্যক্তির দরকার, বাবাকে বুঝিয়ে তাই কাকা আমাকে রাজি করিয়ে ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জে নিয়ে গেলেন। অথচ থাকতাম ঢাকায় তাঁতিবাজারের ৯১ নম্বর দ্বিতল বাড়িতে। সকাল আটটায় বাস ধরে নারায়ণগঞ্জের দোকানে পৌঁছাতাম। বারোটার পর থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত বন্ধ; চারটে থেকে রাত আটটা। বাসে বা ট্রেনে ঢাকার বাড়িতে পৌঁছাতে রাত সাড়ে ন'টা। কোনো কোনো দিন তেমন দরকার হলে দুপুরে দোকান বন্ধের সময় ঢাকায় এসে পড়তাম এবং চারটায় নারায়ণগঞ্জ। ফের রাত্তিরে প্রত্যাবর্তন। ১৯৪৬–এ ঢাকায় যখন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বেধে গেল তখন অবশ্য দুপুরে নারায়ণগঞ্জেই থেকে যেতাম, ঢাকায় ফিরতাম রাত্তিরে। এই অবস্থার মধ্যে প্রগতি লেখক সঙ্ঘের বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুণ্ন রেখেছি; অনেক কবিতা ও গদ্য লিখেছি নানা পত্রপত্রিকায়, প্রতি রবিবার ছুটির দিনটাকে যথাসম্ভব কাজে লাগিয়েছি। ঢাকায় যে বাড়িটাতে শেষের দিকে থাকতাম সেই বাড়িটা এখন আমার কাছে কিছুটা স্মৃতিবিজড়িত। অশোক মিত্র আই সি এস তখন ছিলেন মুন্সিগঞ্জের এসডিও। সরকারি কাজে ঢাকায় এলে তিনি আমার বাড়িতেও এসেছেন কয়েকবার। সাহিত্যই ছিল যোগসূত্র। মনে পড়ে এলিয়টের ইস্ট ককার ও ড্রাই স্যালভেজেস্ তাঁর বাড়ি থেকে নিয়ে এসেই পড়েছিলাম। তিরিশ দশকের শেষে এবং চল্লিশ দশকের শুরুতে এলিয়ট যে একাধিক শক্তিমান তরুণ বাঙালি কবিকে কিঞ্চিৎ প্রভাবিত করেছিলেন, বিষ্ণু দে ও সমর সেনের কিছু কিছু কবিতায় তার প্রমাণ মিলবে। ১৯৪০–এ এলিয়টের কোনো কোনো কবিতা সামনে রেখে লিখেছিলাম 'স্বর' নামের দীর্ঘ কবিতাটি। বুদ্ধদেব বসু প্রকাশ করলেন কবিতা পত্রিকায়, কলকাতা থেকে মণীন্দ্র রায় প্রশংসা করে চিঠি দিলেন। কবিতাটি প্রথমে আমার স্বর ও অন্যান্য কবিতা (১৯৫৩) এবং পরে তৃতীয় কবিতার বই দিনযাপন–এ (১৯৬২) সন্নিবেশিত হয়। চল্লিশ দশকে আমার ঢাকার বাসায় আসতেন শামসুর রাহমান, এখন বাংলাদেশের সবচাইতে জনপ্রিয় কবি। আসতেন অশোক মিত্র অর্থাৎ এখনকার ডঃ অশোক মিত্র, বামফ্রন্ট সরকারের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী। সাহিত্য ও শিল্পকলা বিষয়ে তাঁর উৎসাহ এখন পর্যন্ত অপরিসীম। কবিতা পত্রিকায় প্রকাশিত (১৯৪৬) আমার 'একচক্ষু' নামের দীর্ঘ কবিতাটির সপ্রশংস উল্লেখ উত্তরকালে তিনি একাধিকবার করেছিলেন। ১৯৪৮–এ আমার

ঢাকার বাড়িতে এসেছিলেন জয়নুল আবেদিন। তখনও তাঁর বয়স কম, একজন মানবপ্রেমিক শিল্পী হিসেবে তখনই তিনি আমাদের পরম প্রিয়। ১৩৫০–এর মন্বন্তরের পটভূমিকায় আঁকা তাঁর ছবিগুলো আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছিলো কবিতার দিক থেকেও কিছু করবার। অনুরোধ করতেই তিনি রাজি হয়ে গেলেন, আমার কাব্যগ্রন্থ 'স্বর ও অন্যান্য কবিতা'র প্রচ্ছদ তাঁরই আঁকা। আসতেন সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, 'লাল সালু' আর 'নয়নচারা' লিখে যিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন, ভদ্র আর অমায়িক। তাঁর তখনকাব পুরানা পল্টনের বাড়িতেও আমি যেতাম, ভালো লাগতো তাঁর সঙ্গ। ১৯৫০–এর শেষের দিকে পশ্চিমবঙ্গে চলে এলাম, আর দেখা–সাক্ষাৎ হয় নি। সত্তর দশকে কোনো এক সময় জানতে পেলাম সুদূর ফরাসি দেশে থাকাকালীন তাঁব আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ। ঐ বাড়িটাতে আসতেন ঢাকা জেলা কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরাও, পূর্ব পাকিস্তান হবার পর পুলিশ যাঁদের খোঁজ করছিলো। এক রাত্রি বাস করে তাঁরা উধাও হতেন। এঁদের মধ্যে ফণী গুহ এবং জিতেন ঘোষ ছিলেন, মনে পড়ছে। ফণী গুহ ধরা পড়ে পূর্ব পাকিস্তানে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে বন্দী হন। অনশন করেছিলেন অন্য রাজবন্দীদের সঙ্গে, জেল কর্তৃপক্ষ জোর করে খাওয়াতে গিয়ে তাঁর মৃত্যু ডেকে আনে। জিতেন ঘোষ কৃষক ফ্রন্টের দায়িত্বে ছিলেন এবং কারাবরণও করেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তান জেলে যখন ছিলেন তখন কিছু কিছু লেখার কাজ করেছিলেন। উত্তরকালে সত্তর দশকের প্রথমেই ঢাকা নওরোজ কিতাবিস্তান থেকে বেরিয়েছিলো তাঁর বই; 'গরাদের আড়াল থেকে'। চল্লিশ দশকেব শেষের দিকে আরো বেশ কয়েকজন তরুণ লেখক ও সাহিত্যপ্রয়াসীর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল। এঁদের মধ্যে কয়েকজন পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। প্রগতি লেখক সঙ্ঘের মাধ্যমে দেশ বিভাগের আগে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল মুনীর চৌধুরী, সানাউল হক, সরদার ফজলুল করিম, সৈয়দ নূরুদ্দিন প্রভৃতির সঙ্গে। পরে আলাপ হয়েছিল ফররুখ আহ্‌মদ, আবুল হোসেন, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আবু রুশদ্, সাবওয়ার মুর্শেদ এবং আরো কয়েকজনের সঙ্গে। সৈয়দ আলী আহসান ও তাঁর ভাই সৈয়দ আলী আশরাফ ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তাঁদের সঙ্গে পরিচয় চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে। এদের মধ্যেও কেউ কেউ আমার ঢাকার বাড়িতে আসতেন, এখন স্পষ্ট করে কিছু মনে পড়ে না।

আমাব স্কুল জীবনে ও পরবর্তীকালে আরমানিটোলায় যেতে–আসতে অনেক সময় একটি বিস্তীর্ণ দ্বিতল বাড়ির দিকে নজর পড়তো। বাড়ির নাম 'বান্ধব কুটির'। যখন লেখালেখি শুরু করি তখন জানতে পারি এক সময়ে ঢাকা থেকে প্রকাশিত বান্ধব পত্রিকা যিনি সম্পাদনা করতেন তিনি এই বাড়িতেই থাকতেন। বস্তুত কালীপ্রসন্ন ঘোষ ছিলেন একাধারে লেখক ও বাগ্মী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'বান্ধব' পত্রিকার খ্যাতিও তখন ছিল চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত। আমার মাতামহ রজনীকান্ত গুপ্তর সঙ্গেও চিঠিপত্রে কালীপ্রসন্ন ঘোষের যোগাযোগ ছিল, এসবই ১৯০০ সনের কয়েক বছর আগেরকার সময়ের ঘটনা। আমার অল্প বয়সে দেখেছি কালীপ্রসন্নর পুত্র কবি শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষের সঙ্গে আমার পিতৃদেবের আলাপ–পরিচয়। বাবাকে উপহার হিসেবে প্রদত্ত একটি ছোট আকারের কবিতার বইও দেখেছিলাম আমাদের বাড়িতে। বান্ধব কুটিরের ছেলেরা অনেকেই ছিলেন নামকরা

খেলোয়াড়; হকি ও ফুটবলে তাঁদের প্রতিষ্ঠা ছিলো। ঢাকা জিন্দাবাহার লেন থেকে 'শিক্ষা সমাচাব' নামের একটি মাসিক পত্রও দীর্ঘকাল প্রকাশিত হয়েছিলো। সম্ভবত তিরিশের দশকের শেষের দিকে বন্ধ হয়ে যায়। ঢাকার জেলখানা রোড উর্দু অঞ্চল থেকে 'পাপিয়া' নামের একটি ছোটদের মাসিক কাগজ বেরুতো, সম্পাদিকা ছিলেন শ্রীমতী বিভাবতী সেন, ডাক্তার ববদা সেনের সহধর্মিণী। এই বাড়ির ছেলে হিবন্ময় সেন ছিলেন আর্টিস্ট। আমার দাদার সহপাঠী। উত্তবকালে তিনি চিত্রপবিচালকও হযেছিলেন। 'বর্মার পথে' 'শহীদ ক্ষুদিরাম' ইত্যাদি চলচ্চিত্র তৈরি করেছিলেন। ঢাকা শহরের এই সাংস্কৃতিক পরিবেশ দেশবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো।

প্রগতি লেখকদের সঙ্ঘকথা

১৯৪১-এর ২২ জুন ১৫০০ মাইল বিস্তৃত বণাঙ্গন সৃষ্টি করে হিটলারের নাৎসী বাহিনী সোভিয়েত বাশিয়া আক্রমণ করলে আমরা প্রগতি লেখক সঙ্ঘের তরুণ লেখকরা স্থির করলাম আন্তর্জাতিক ঘটনাবলিকে সামনে রেখে কবি শিল্পী ও লেখকদের ইতিকর্তব্য স্থির কবতে হবে। ফলে, ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলনের একটি ছক স্থির হয়ে গেল। কিন্তু কাজটা সহজ ছিল না। কলকাতায় ফ্যাসিস্টবিবোধী আন্দোলন কয়েক বছর আগে থেকেই স্পষ্ট চেহারা নিয়েছিলো। সেখানকাব লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা ফ্যাসিস্ট আক্রমণেব বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিবাদের একটি মঞ্চও তৈরি করে ফেলেছিলেন। আমি যে-কোনো ছুটিতেই কলকাতায় যেতাম, কেননা কলকাতায় ছিল আমার মামাবাড়ি, তখনকার ৫৩ অখিল মিস্ত্রী লেনের 'রজনী-কুটির', অর্থাৎ আমার মাতামহ মনস্বী রজনীকান্ত গুপ্ত যে-বাড়ি কিনে স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৯৪০-এ কলকাতায় এসে ঘুরে গেলাম আমি ও সোমেন চন্দ। অনেকের সঙ্গেই দেখা হয়েছিল সেবার, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী যাঁদের অন্যতম। সোমেন গিয়েছিলো টালিগঞ্জেব দিগম্বরীতলায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হবার উদ্দেশে, কিন্তু দেখা হয় নি, মানিক তখন অন্য কোথায় চলে গিয়েছিলেন। সোমেনের মৃত্যুর পর ঢাকা প্রগতি লেখক সঙ্ঘের (তখন ফ্যাসিস্টবিবোধী লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘ) একটি বড় আকারের সম্মেলন হয়। এই উপলক্ষে ঢাকায় এসেছিলেন নাট্যাচার্য মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমেনের প্রসঙ্গ উঠতেই মানিক দুঃখ প্রকাশ কবেছিলেন কলকাতায় সোমেনের সঙ্গে তাঁর দেখা না হওয়ার জন্যে। ঢাকা মালিটোলা অঞ্চলে কারুর অতিথি হয়েছিলেন সে সময় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। একদিন সকালের দিকে আমাদের অনুবোধে ঘরোয়া একটি পরিবেশে তিনি প্রায় এক ঘণ্টা বললেন রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয়কলা প্রসঙ্গে। ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে এম.এ পড়বার সময় শেক্সপীয়র প্রসঙ্গে নাট্যচিন্তার নানা বই নাড়াচাড়া করতে হয়েছিলো, তখন পর্যন্ত গ্রান্ডভিলি বার্কারের বইটাই ছিলো সম্ভবত সাম্প্রতিক। কিন্তু বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয়কলার পটভূমিকায় মনোরঞ্জন বাবু সেদিন আমাদের অনেক নতুন কথা শুনিয়ে উৎকর্ণ ও মুগ্ধ করে রেখেছিলেন।

কলকাতা মহানগরী হওয়ায় সেখানে সাবা ভারতেরই নয়, সারাবিশ্বের নতুন চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ সহজেই ঘটে যায়। কিন্তু প্রাচীন ঢাকা শহরে এই ধরনের অনুপ্রবেশ সহজ ছিলো না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সমাজের অধিকাংশই ছিলেন আধুনিককালেব চিন্তাধারায় দীক্ষিত; ছাত্রসমাজেবও একটি অংশ ছিলো এই অগ্রগামী চিন্তাধারাব অংশীদার। কিন্তু সাধারণভাবে অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তি ও জনসাধাবণ স্থিতাবস্থার পক্ষপাতী বলে মনে হওয়া সে-সময় স্বাভাবিক ব্যাপার ছিলো। ১৯৩৯-৪০ দশকে প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সভায় সঙ্ঘের সদস্যরা ছাড়া অন্যান্য বেশ কিছু নতুন মুখ দেখা যেতো। এঁদেব অনেকেই আলোচনায় উৎসাহিত হতেন এবং অংশগ্রহণ করতেন। কিন্তু দেশেব ও আন্তর্জাতিক জগতের ক্রমবর্ধমান সঙ্কটের সময় দেখা গেল ধীরে ধীবে অনেকেই পিছু হটছেন; স্থিতাবস্থার মৌতাত তাঁদেব অগ্রগমনেব পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলকাতায ও ঢাকায় এবং দেশেব অন্যত্র প্রগতি লেখক সঙ্ঘেব প্রধান সংগঠকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন কমিউনিস্ট ভাবধাবাব সমর্থক কিন্তু জাতীয়তাবাদী চিন্তায় দীক্ষিত বেশ কিছু লেখক ও সাহিত্যপ্রিয় ব্যক্তিও সঙ্ঘের তখনকার কর্মকাণ্ডে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ১৯৪০-এ সোমেন চন্দ প্রকাশিত 'ক্রান্তি' সঙ্কলনগ্রন্থ ছিল অন্যতম আকর্ষণ। উদ্দেশ্য ও মতবাদের দিক থেকে লেখক সঙ্ঘের সবচেয়ে সক্রিয় সভ্য ছিলেন সোমেন চন্দ ও রণেশ দাশগুপ্ত। রণেশবাবু ছিলেন আমাদেব মধ্যে বযোজ্যেষ্ঠ এবং সাহিত্য দর্শন রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর পড়াশোনা ছিল গভীর। তিনি সম্ভবত ১৯৩৮-এ সোনার বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে চাকবি করতেন। ঐ সময়ে থাকতেন আমাদেব পাড়ায, খুব কাছাকাছি। সাহিত্যসূত্রে তাঁব সঙ্গে আমাব পরিচয অল্প সময়ের মধ্যে গভীর বন্ধুত্বে পবিণত হয এবং প্রীতি, সৌহার্দ্য ও মতামতের ক্ষেত্রে অদ্যাবধি তা অটুট রয়েছে। অল্প বয়সে ঘরোয়া সভায যা লিখেছি ও পড়েছি রণেশবাবু খুব বিস্তাবিত আলোচনা করে লেখার গুণাগুণ আমাদের দেখিযে দিতে পাবতেন। তখন পর্যন্ত প্রগতিশীল বইপত্র ঢাকায় কমই পাওয়া যেতো এবং প্রধানত রণেশবাবুর কাছ থেকেই আমবা পড়বার জন্যে কিছু কিছু হালের বইপত্র পেতাম। আমাদের সভায় যে-সব গল্প প্রবন্ধ কবিতা পড়া হতো সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হতো, প্রতিটি লেখাই খুঁটিযে খুঁটিযে দেখে বিচার করা হতো। বণেশ দাশগুপ্ত এবং অচ্যুত গোস্বামী উপস্থিত থাকলে একটু মজা করাও যেতো মাঝে-মাঝে কেননা রণেশবাবুর দীর্ঘ সমালোচনার পরেও দেখা যেতো অচ্যুতবাবু তাঁর বিতর্কের স্থান থেকে মোটেই চ্যুত হতে কিংবা সরে আসতে চাইছেন না। বিতর্কিত বিষয় নিযে আলোচনা-প্রতি সমালোচনা একাবণেই উপস্থিত সকলের কাছেই উপভোগ্য হতো। অচ্যুতকে স্বভাবের দিক থেকে খুবই আপনভোলা লোক মনে হতো। কিন্তু সাহিত্য নিয়ে বিতর্কের ব্যাপারে তিনি বিনাযুদ্ধে একচুল জায়গাও ছেড়ে দিতে রাজি হতেন না। একজন মার্কসবাদী লেখক হয়েও মার্কসবাদী লেখক ও সমালোচকের নানা লেখা সম্পর্কেও তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত ঘোষণা করতে কখনো কুণ্ঠিত হতেন না এবং সে-কারণেই সবর্দা পার্টি লাইন অনুযায়ী সাহিত্য আলোচনার যুক্তিবিন্যাসের বিরোধিতা তিনি করতে ইতস্তত করতেন না। প্রথম যৌবন থেকে প্রৌঢ়কাল পর্যন্ত তাঁর এই স্বভাব অক্ষুণ্ন ছিল। প্রথম যৌবনে এবং পরেও মার্কসবাদী

সমালোচনা ও ব্যাখার ক্ষেত্রে আমবা প্রায় সকলেই রণেশবাবুর নেতৃত্বকে মেনে নিয়ে চলতাম কিন্তু মুশকিল হতো অচ্যুতকে নিয়ে। নানা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের উল্লেখ করে তিনি সম্পূর্ণ আলাদা একটি কেন্দ্রবিন্দুতে পৌছাতে চাইতেন। সুখের বিষয়, যতো মতান্তরই হোক প্রগতিবাদী লেখকদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বরাবরই অব্যাহত ছিল এবং প্রধানত সেই কাবণে তখনকার নানা প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে যৌথ উদ্যোগের কোনো অভাব ঘটে নি।

১৯৪০-এর সন্ধ্যায় ঢাকা জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অ্যাসেম্বলি হলে ঢাকা জেলা প্রগতি লেখক সঙ্ঘের বার্ষিক প্রীতি সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অনুষ্ঠানটি নানা কাবণে স্মরণীয়। তখন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জগতের সঙ্কট ক্রমবর্ধমান এবং আমরা প্রগতি লেখকরা, লেখক শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদেব মধ্যে চিন্তা ও ধ্যানধারণার দিক থেকে ব্যাপক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলাম। ১৯৪০-এব এই সভায় সভানেতৃত্ব পদ অলঙ্কৃত কবেছিলেন বুদ্ধদেব বসু, উদ্বোধনী সঙ্গীত গেযেছিলেন সুকুমাব বায় (পরবর্তীকালে আকাশবাণীর প্রগ্রাম এক্সিকিউটিভ এবং সঙ্গীতশাস্ত্রেব বই লিখে রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত) এবং বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ কবেছিলেন রণেশ দাশগুপ্ত। কবিতা গল্প ও প্রবন্ধ পাঠ কবেছিলেন কিরণশঙ্কব সেনগুপ্ত, ভবানীপ্রসাদ দত্ত (এখন সন্ন্যাসী ও দিল্লি বামকৃষ্ণ মিশনের উচ্চতব পদমর্যাদায প্রতিষ্ঠিত), নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য (দেশ বিভাগের পর কিছুকাল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালযেব কর্মী ছিলেন), অনিল চক্রবর্তী, অমৃতকুমাব দত্ত এবং সোমেন চন্দ। সমাগত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে যাঁরা আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক অমলেন্দু বসু (উত্তবকালে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্য-সমালোচক ও গ্রন্থকার), লক্ষ্ণৌ প্রবাসী নবেন্দু বসু (কবিতার প্রকৃতি গ্রন্থের রচয়িতা) এবং অধ্যাপক জুলফিকার আলি। এই সময় অচ্যুত গোস্বামী ছিলেন সঙ্ঘের সম্পাদক। তিনি এবং জ্যোতির্ময় দে এই সভায অভ্যাগতদের অভ্যর্থনায় নিযুক্ত ছিলেন। ইতিপূর্বেই অবশ্য ঢাকায প্রগতি লেখক সঙ্ঘের উদ্যোগে আবো দু'চারটি স্মবণযোগ্য সভা অনুষ্ঠিত হযেছিলো রমনা ও পুবানা পল্টন সংলগ্ন এলাকায়। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, অধ্যাপক অমিয়কুমার দাশগুপ্ত, অধ্যাপক পৃথ্বিশ চক্রবর্তী প্রভৃতি কোনো কোনো সভায উপস্থিত থেকে আমাদেব উৎসাহিত কবেছিলেন। এখন আমাব এই ভেবে অবাক লাগে যে সাম্প্রতিককালের কলকাতার কিছু লেখক প্রগতি সাহিত্যেব অন্দোলন সম্পূর্ণভাবে তাঁদেব কীর্তি হিসেবে প্রচাবে আগ্রহী, ঢাকাব প্রগতি লেখক সঙ্ঘের প্রায় দশ বছরেব নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন সম্পর্কে কোনো সুচিন্তিত বা বিস্তৃত আলোচনা তাঁদের কারুর কারুর প্রকাশিত গ্রন্থাদিতে পাওয়া যাচ্ছে না।

ঢাকায় যখন আমাদের সাহিত্য আন্দোলনের কাজকর্ম অত্যন্ত জীবন্ত ও সচল ছিল সে সময় কলকাতায় আমাদের একজন লেখক বন্ধুর সাহায্য নেয়া অনিবার্য হয়ে পড়েছিলো। আমরা ঢাকা থাকতুম, কলকাতায় থাকতেন বেশির ভাগ লেখক ও শিল্পীরা। কলকাতায় আমাদের পক্ষের হয়ে অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন এমন একজন ব্যক্তিকে ঐ সময়ে আমি খুঁজে পেযেছিলাম, তিনি গোপাল ভৌমিক। ইনি যে প্রগতি লেখক সঙ্ঘের কাজে খুব

সক্রিয় ছিলেন তা নয় কিন্তু আমার একজন অন্তরঙ্গ লেখক–বন্ধুরূপে তিনি সাহিত্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে কলকাতায় থেকে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। সর্বপ্রকার দলাদলি ও সঙ্কীর্ণতার বাইরে থেকে তিনি তাঁর সাহিত্যসাধনায় তৎপর ছিলেন। ১৯৪৩ থেকেই কলকাতায় তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ–পরিচয় প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয় এবং তা অদ্যাবধি অক্ষুণ্ন রয়েছে। প্রতিরোধ ও ক্রান্তিতে তিনি লিখেছেন, আমাদের বিশেষ করে আমার ঘনঘন পত্রালাপ, ফরমায়েশ ও উৎপাত তিনি হাসিমুখে সহ্য করেছেন একথার উল্লেখ অপবিহার্য। যখনই কোনো অনুবোধ করে চিঠি দিয়েছি, উনি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিটি চিঠির উত্তর দিয়েছেন। প্রতিবোধ ও ক্রান্তির প্রচাবের ক্ষেত্রে তিনি সাহায্য করেছেন, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিভিযুর ব্যবস্থা করে দিযেছিলেন, ঢাকায় বসে যা করানো আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য ছিলো না। রণজিৎকুমার সেন মন্মথকুমার চৌধুরী প্রজেশকুমার রায় গোবিন্দ চক্রবর্তী এই সময়ে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন।

আমার ছাত্রাবস্থায়, সম্ভবত তিরিশেব দশকের শেষার্ধে কলকাতা থেকে প্রকাশিত ছাত্রছাত্রীদের মুখপত্র শ্রীহর্ষ পত্রিকার পরিচালকদের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ক্রমে সখ্যে পবিণত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে আমি শ্রীহর্ষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলাম। কলকাতায় গেলেই বিজন মিত্র বিজয় চট্টোপাধ্যায প্রমুখ কর্মীদের সঙ্গে অবসর সময় আড্ডা দিয়ে কাটিয়ে দেযা যেতো শ্রীহর্ষর রমানাথ মজুমদার স্ট্রিটের অফিসে। যতোদূর মনে পড়ে শ্রীহর্ষ পত্রিকার সূত্রেই প্রথম আলাপ হয়েছিল সমর সেন প্রতাপচন্দ্র প্রবোধচন্দ্র ঘোষ নীবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতির সঙ্গে। সম্ভবত এঁরা সকলেই কোনো না কোনো সময শ্রীহর্ষ পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। খুব সম্ভব হরপ্রসাদ মিত্রেব সঙ্গেও এই সময়ে আলাপ হয়েছিলো, স্পষ্ট মনে পড়ে না। শেঠ ডালমিয়াব কাগজ দৈনিক সত্যযুগ চল্লিশ দশকের শেষের দিকে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিলো। ওই কাগজে লেখালেখির সূত্রে গৌরকিশোর ঘোষ ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল কেননা তখন ওঁরা দু'জনেই সত্যযুগ পত্রিকায় কাজ করতেন। কলকাতায় কবি কিশোর সুকান্ত ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা হযেছিলো মন্বন্তরের দিনগুলোর কিছু পরেই। ১৩৫০–এর দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় একটি কাব্যসঙ্কলন করবাব ইচ্ছে, আমার একটি কবিতা চাইলেন। তাঁর সম্পাদিত আকাল কাব্যসঙ্কলনে পবে সেটি অন্তর্ভুক্ত হলো। 'ক্রান্তি'র ১৯৪৬–এ প্রকাশিত সঙ্কলনে আমবা ছেপেছিলাম সুকান্তব দু'টি কবিতা 'অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি' এবং 'বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে'—যে দু'টি কবিতার পরবর্তীকালেব সঙ্গীতরূপ খুবই জনপ্রিয় হয়েছে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে। সুকান্তর একটি কবিতা প্রতিরোধেও ছাপা হয়েছিলো।

চল্লিশ দশকের শেষের দিকে দেশ বিভাগ হলো, ঢাকা শহর সমেত সারা পূর্ববঙ্গ নতুন একটি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হলো। তখন স্থির হলো আমার পরিবারের সবাই স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্যে পশ্চিমবঙ্গে যাবেন। বাবা সরকারি পেনসনভোগী, দাদা ও ছোট ভাই সরকারি চাকুরে, অপসন দিয়ে সবাই চলে গেলেন আমাদের ঢাকার বাড়ি ছেড়ে। মস্ত একটা হলদে রঙের দ্বিতল বাড়িতে একা রইলাম আমি, তখন নারায়ণগঞ্জে কাজ করছি।

নারায়ণগঞ্জে আর্মি অ্যান্ড নেভি স্টোর্সে–এব একটি বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান ছিলো; আমার কাকা যখন জানলেন মালিকপক্ষ তল্পিতল্পা গুটিয়ে নেবার চেষ্টায় আছে তখন স্থানীয় নারাযণগঞ্জ ক্লাবের লালমুখো সাহেবদের সঙ্গে ব্যবস্থা কবে এই সুন্দর দোকানটি আমার নামে অর্থাৎ আমাকে প্রপ্রাইটর করে নিয়ে নিয়েছিলেন। এটা সম্ভবত ১৯৪৬–এর নভেম্বর মাসের কথা। সুতরাং দেশ বিভাগের পরেও আমাকে থেকে যেতে হলো ঢাকায়। বেশ ছিলাম এই সময, ঢাকা–পয়সা রোজগার করতে শিখেছি, সিগাবেট ও মদ্যপানেব সুবর্ণ সুযোগ ছিলো; কিন্তু ঐ তাজা প্রথম যৌবনেও কোনো নেশাই আমাকে স্পর্শ করতে পারে নি। এব একটি কাবণ বোধ হয় আমার আদর্শবাদ যা তরুণ বয়সের বিপ্লবী ধ্যানধাবণার সমীপবর্তী। ঢাকায় থাকতেই ১৯৪৯–এর জানুযারি মাসে বিয়ে করে ফেললাম। এখন বিযে বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায কলকাতায়, তখন চার পাঁচজন বন্ধুব সাহায্য নিয়েও কলকাতায় বাড়ি পাওয়া গেল না, সর্বত্র পূর্ববঙ্গ থেকে সদ্য আগত উদ্বাস্তুদের ভিড়, পূর্ববঙ্গীয়দের মধ্যে বহু বছব ধবে যাঁবা কলকাতায বসবাস কবছেন আত্মীয়স্বজনের ভিড়েব চাপে তাঁরাও অতিষ্ঠ। বিয়েব পর হোটেল সিসিল–এ ছিলাম এক সপ্তাহ কি দশ দিন, আমার শিল্পীবন্ধু মনীন্দ্র মিত্র সব ব্যবস্থা তখন করে দিয়েছিলেন। কেননা বহু বছব তিনি ওই হোটেলেই ছিলেন। বিয়ের পব সস্ত্রীক ঢাকায ফিবে এসে জানলাম রণেশ দাশগুপ্ত কাবা–অন্তরালে, কমিউনিস্ট পার্টিব অনেক কর্মীব খোঁজ করছে পাকিস্তানি পুলিশ। ঐ সময় থেকেই ঢাকা প্রগতি লেখক সঙ্ঘের নিববচ্ছিন্ন আন্দোলনে ছেদ পড়লো বলা যেতে পাবে। পবে অবশ্য ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র কবে পূর্ববঙ্গে নতুন কর্মী ও নতুন যুবক সম্প্রদায নবীন যাত্রায যোগ দিয়েছিলো। কিন্তু তখন আমি পূর্ববঙ্গ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছি। ১৯৫০–এর এক সময় ঢাকা ছেড়ে চলে এলাম। কখনো ভাবি নি ঢাকা ছেড়ে চলে আসতে হবে। কলকাতায় এসে নতুন করে সবকারি কাজে ঢুকলাম, চললো বছরের পর বছর অস্তিত্ব বক্ষার সংগ্রাম: সাহিত্য–সংস্কৃতিব কেন্দ্রে পরিচয় হলো অজস্র নতুন মুখের সঙ্গে, সুন্দর ও কুৎসিত, সজ্জিত ও অসজ্জিত, ক্ষমতাবান ও ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যাঁবা পশ্চিমবঙ্গে বিরাজমান। কিন্তু তাঁদের সম্পর্কে কোনো স্মৃতিচাবণ বর্তমান প্রসঙ্গেব অন্তর্ভুক্ত নয়।

ঢাকার সঙ্গীত-সমাজ

সুকুমার রায়

রমনার মাঠ পেরিয়ে ঢাকার দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকা। একদিকে ঢাকেশ্বরী মন্দির, তার পূর্বদিকে পুকুর, দক্ষিণে রাস্তার ওপারের সারিতে কয়েকটি বাড়ির মধ্যে আমাদের একটি। এখানে দাঁড়িয়ে দেখেছি মাঠ গিয়ে ঠেকেছে রেলওয়ে লাইনে। তারপর ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, জগন্নাথ হল, পূর্বদিকে এগিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়, আর সেসব পেরিয়ে ঢাকা হল ও কার্জন হল। আমার ওপাড়ার স্মৃতি ১৯২১ সাল থেকে। এ সময়কালেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরু। বাড়ি থেকে বেরুলে চোখে পড়তো দূর-দূরান্তের নীলক্ষেতের সীমানা পর্যন্ত, একটু এগিয়ে গেলে গাছের ভেতর দিয়ে ধানমণ্ডি পর্যন্ত চোখে আসতো। আর ধানমণ্ডির দিক থেকেই না প্রচণ্ড কালবৈশাখী প্রতি বছর ছুটে আসতে দেখেছি। এরপর পরিবর্তনও দেখেছি— সলিমুল্লাহ্ হল তৈরি হলো। যুদ্ধের সময়ে মাঠগুলোতে বৃটিশ সৈন্যদের ছাউনি পড়লো। তবু ওই দিকটা মাঠ এলাকারই সীমা ছিলো। আমাদের পুরোনো কথা বলতে গেলে এই স্মৃতির সীমানা থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন।

এলাকাটি সব মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত পরবর্তীকালে বকশীবাজার নামে পরিচিত ছিলো। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংলগ্ন ছিলো বলে আমাদের ছিলো দোটানা জীবন। পেছনে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছি ঢাকার অনেক পাড়ার অনেক দল—তখনকার দিনের নানা রাজনীতির পার্টি রমনার মাঠের সঙ্গে বাঁধা। আমাদের তো কথাই নেই। নানা গোষ্ঠীর টানে যুব সম্প্রদায় মিশে যেতো বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশে। ওখানে ছিলো পল্টনের মেঠো খেলোযাড়ি আড্ডা, শহরের দু'একটি থিয়েটারি আড্ডার দল, সাহিত্যিক গোষ্ঠীর দল, বিশেষ করে অধ্যাপকদের কেন্দ্র করে। ব্যক্তিগতভাবে একটি সময়ের দ্বিমুখী স্মৃতিই মনে পড়ে— নানাভাবে ছড়ানো শহরের সঙ্গীত গোষ্ঠী আর সাহিত্যিক গোষ্ঠীর টান।

গান-বাজনার পথটা ঢাকায় তিরিশ দশকেও বড়ো হেয় বলে গণ্য করা হতো। কিন্তু সেই সঙ্গে একদিকে স্বদেশী-গানের রেয়াজ আর অন্যদিকে ছিলো ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রচলন। দেশাত্মবোধক নানা গানের প্রচলনের সঙ্গত কারণ ছিলো। মুকুন্দ দাসের যাত্রা ঘুরেফিরে পাড়ায় পাড়ায় চলতো। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের গানগুলোও প্রচলিত হয়েছিলো। বিপ্লবী

ভূপেন রক্ষিতের পিতা যোগেশ রক্ষিত, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলালের গান শেখাতেন। তখন বাড়ির মেয়েরা, যারা স্কুলে যেতো, তাদের মধ্যে হারমোনিয়াম বাজিয়ে সারেগামা সাধার প্রচলন হয়েছে। নিতান্ত ছেলেবেলায় স্কুলের প্রাইজ বিতরণী অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের গান করেছিলাম। সেই থেকে বাড়িতে বাধা সত্ত্বেও গানের টান থেকে গেল। পাড়ায় কিশোরদের থিয়েটারের জন্য দাদার (বিপ্লবী অনিল রায়) ডাক এলো। লীলাদির (তখনকাব লীলা নাগের) বাড়িতে থিয়েটাব। লীলা নাগকে কে না জানতো? বিশ্ববিদ্যালয়েব প্রথম সম্মানিত ছাত্রী। সেই থিয়েটারসূত্রে ঢুকে পড়লাম তরুণদলে। কুস্তি কবা, বই পড়া, শেষ বাতে উঠে মাঠে দৌড়ঝাঁপ, কুচকাওয়াজ, হাতে লেখা মাসিক পত্রিকা চালানো— এসবই হলো নিত্যকাব রুটিন। এর মধ্যেই চলতো গান শেখা, ঘুবে ঘুবে গান কবে চাঁদা আদায়, জনসভায় গান—এসব নিযে দিন কেটে গেছে। দল বা দলের কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার উপায ছিলো না সেদিন।

বাড়িব কাছাকাছি জগন্নাথ হল। ছেলেবেলা থেকেই আমবা কমনরুমে যাতায়াত কবি। পত্রিকা দেখা, বড়োদের সঙ্গে টেবিল টেনিস ও কেরাম খেলার সুযোগ পাওয়া যেতো। বড়োরা স্নেহের চোখে দেখতেন। জগন্নাথ হল আর ঢাকা হলের থিয়েটাব, বক্তৃতা, সবস্বতী পুজোয যাত্রা গান আর অন্যান্য উৎসবে কোনো না কোনোভাবে আমরা ঢুকে পড়তাম। ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথকে তো এখানেই দেখেছিলাম। মনে পড়ছে, রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় আসবেন। সাড়া পড়ে যায চাবদিকে। লাইন করে আমরা—স্কুলেব ছেলেরা—সদবঘাটেব নর্থব্রুক হলের সামনে দাঁড়িয়ে, নাবায়ণগঞ্জ থেকে তিনি আসছেন। ছেলের দলের মধ্যে আমাদের সৌভাগ্য হয়েছিলো ভালো করে দেখবার। এরপর আমবা দৌড়ে গিয়েছিলাম পিনিস্‌বোটের কাছে যেখানে কবিব প্রথমে থাকবাব ব্যবস্থা হয়েছিলো। এখানে ছাত্রীবা ও অনেকে সংবর্ধনা করেছিলো রবীন্দ্রনাথকে, মেয়ের দলসহ লীলাদিকে দেখেছিলাম মালা পরিযে দিতে। সদরঘাটের পার্কে যেখানে মঞ্চ তৈরি হয়েছিলো, সেখানে নদীর ওপার থেকে অস্তববিব সোনালি রশ্মি এসে কবির মুখে পড়েছিলো। রঙের অজস্র ধারায রঙিন রবীন্দ্রনাথ অস্তাচলগামী সূর্যেব মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে অপূর্ব বাণী বিস্তাব কবেছিলেন, আজও হযতো কারো কারো মনে থাকতে পারে। এরপর রমনায় রমেশচন্দ্র মজুমদাব মশাযের কুঠিতে ঘুরঘুর করে বারবাব কবিকে দেখে নিয়েছিলাম। সেদিনের কবি-দর্শন প্রথম প্রেমের মতো সজীব।

সে যুগে ছোরাখেলা, লাঠিখেলা, কুচকাওয়াজ আর অগ্নিদীক্ষায় দিন কেটে যাচ্ছিলো দ্রুতবেগে। আমাদের মধ্যে দু'একটি ধন্যি ছেলে আগ্নেয় অস্ত্র হাতড়াতো, তাদের মধ্যে ভীষণতম দায়িত্ব নিয়ে কেউবা কিছুদিনেব মধ্যেই চলে গেছে জেলে, কেউবা নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। এমনি কবেই ১৯২৯ সালেব পর থেকে দিনগুলো এসেছিলো অগ্নিস্ফূরণ নিয়ে। সতীর্থ, সহপাঠী, ভাই, দাদাদের অনেকে বন্দী হতে লাগলো। আগুনের খেলায় প্রাণ দিতে এগিযে গেলো অনেকে। মোটামুটি দুটো বছরের মধ্যে অনেকেই যখন রাজবন্দী, তখন কতকটা পালিয়ে ফিরছি। নেহাৎ ভালো মানুষটি সেজে সঙ্গীতেব আশ্রয় নিয়েছিলাম। ১৯৩১ সাল থেকে এস্রাজ যন্ত্রটি অবলম্বন করে সঙ্গীত শেখার শুরু। কতকটা

ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ না করলে এ সময়ের কথা লেখা যায় না, কারণ বিষয়বস্তুর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্কিত ছিলাম। গানের সঙ্গে তত্ত্ব শেখার চেষ্টা সেই সঙ্গীত শেখার সূত্রে। বীণামন্দির নামে সঙ্গীতযন্ত্রের ছোট একটি দোকানে বসে সঙ্গীতের আড্ডা মন্মথ রায় বা পিলু বাবুকে কেন্দ্র করে। এবারে পুলিশের নেক নজর থেকে মুক্ত হওয়া গেলো। পিলুবাবু সিলেট সুনামগঞ্জের জমিদার পরিবারের লোক, যদিও বাড়ি ছিলো ঢাকা মানিকগঞ্জে সুশিক্ষিত সংস্কৃতিসম্পন্ন এই পরিবারের কয়েকজনই অধ্যাপক ছিলেন। পিলুবাবু সেকালের গ্রাজুয়েট, প্রথম জীবনেই স্ত্রী বিয়োগের পর থেকে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নি। পাড়ায় হোমিওপ্যাথি ওষুধ বিতরণ, যন্ত্র তৈরি দেখাশোনা আর সারাদিন এস্রাজে রাগালাপ করে দিন কেটে যেতো। সখের বাদ্যযন্ত্র তৈরিব দোকান বললে ভুল কবা হবে। কারণ রাজেন্দ্র মিস্ত্রি নামে এক সুদক্ষ কারিগব এই দোকানটিব প্রাণকেন্দ্র ছিলো। রাজেন্দ্রের হাতে তৈরি যন্ত্রের নাম ছিলো খুবই, বহু সঙ্গীতজ্ঞ এসে উপস্থিত হতেন। এখানেই সুবেশচন্দ্র চক্রবর্তীব সঙ্গে প্রথম পবিচয়। ময়মনসিংহ থেকে তিনি এসেছিলেন যন্ত্র কেনার জন্য, আব তাঁব অধ্যাপক, পিলুবাবুব অনুজ ড. সত্যেন্দ্রনাথ বাযের সঙ্গে দেখা কববার জন্যে। পরে সত্যেন্দ্রনাথ রায় চারুচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন কিছুকাল। সুরেশবাবুব আলোচনা আমাদের অনুপ্রেবণা দিয়েছিলো। তিনি তখন পণ্ডিত ভাতখণ্ডের মতামতের সমালোচনা করছেন আর এস্রাজের চমকপ্রদ মসিদখানি গৎ শোনাচ্ছেন।

পিলুবাবু ছিলেন আলাপী। গতেব প্রস্তুতি তাঁব ছিলো না। কিন্তু গতে নোটবই পূর্ণ ছিলো। রাগের রঙ ও রূপের বৈশিষ্ট্য সন্ধানী তিনি আলাপেব সরল রূপ প্রকটিত করতেন। সৌন্দর্যতত্ত্বেব বোধ দিয়ে পিলুবাবুব সঙ্গীত আলোচনা ভালো লাগতো। পিলুবাবুর কাছে বাগালাপ শুনতেন প্রফেসর সত্যেন বোস। তাঁকে কখনো কখনো জগন্নাথ হলের আসরে আমন্ত্রণ করাও হতো।

তখন ঢাকায ছাত্রসমাজেব মধ্যে সঙ্গীতসচেতনতা ধীরে ধীবে জাগছে। কোথায় গান জমে? কোন্ এলাকায গান-বাজনা চলে? কোথায গানেব নিযমিত আসর আছে?—এ খবর জানতে আব বাকি নেই। ধ্রুপদে আর পাখওয়াজ বাদনে নবাবপুরে আসব জমে বেশি। এ এলাকায় সেকালেও হবি কর্মকাবেব সাগরেদ এমদাদ খাঁর পসাব কিছুটা ছিলো। কিন্তু বিষ্ণুপুরী ভঙ্গির গানের প্রতি সাধাবণের আকর্ষণ ছিলো না। ধ্রুপদের আসরে মারধর চলতো বেশি—গায়ক জেতে না বাদক জেতে। তবু অন্যান্যেব চেয়ে এমদাদ খাঁর প্রতিপত্তি কিছুটা বেশি ছিলো।

ঝুলনের রাত্রিতে এদিকে-ওদিকে বহু ঠাকুরবাড়িতে বসতো গানের আসর। নবাবপুর, বনগ্রাম, নারিন্দা, ফরাশগঞ্জ, তাঁতিবাজার—সর্বত্রই ঝুলনের গান। জাঁকিয়ে আসর জমে বহু রকমেব—গায়ক, বাইজী যন্ত্রী, কীর্তনীয়া প্রভৃতিদের নিয়ে। ছাত্রদল বেরিযে পড়ে গানের সন্ধানে ঝুলনের রাত্রিগুলোতে। হরি ওস্তাদ যে ধ্রুপদীয়া রেখে গিয়েছিলেন যুগরুচি সম্পন্ন যুবকেরা তা মোটেও গ্রাহ্য করেন নি। তাই ওঁরা বলতেন, এ পথে নয়। ধ্রুপদের মারধরের আসর থেকে বেরিয়ে খেয়ালের খোঁজ করে। সুরেলা কণ্ঠের অভাবে আর গায়কীর দুর্বলতার জন্যে ওরা তাল নিয়েই বেশি ব্যস্ত। ঢাকার বিখ্যাত তবলাবাদক প্রসন্ন বণিক

কলকাতায় তখন বেশি সময় থাকেন। প্রসন্ন বণিকের শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ তখন ভালো বাজিয়ে। কিন্তু প্রসন্ন বণিক তাঁর গ্রন্থ ও বাজনার দ্বারা যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন তা বজায় থাকে নি। ঢাকার তবলার খ্যাতি চারদিকে। প্রাচীন যুগে সাধু ওস্তাদ, সুর্পন খাঁ, দারিকা সফবদার ছিলেন নামজাদা তবলাবাদক। প্রসন্ন বণিক মশায় নাকি মুর্শিদাবাদের আতা হোসেনের সঙ্গে সম্পর্কিত।

বেবিয়ে পড়ি ঝুলনের রাত্রিতে। সারা শহবময় ঘুবতে ঘুবতে যেখানে মন বসবে সেখানেই বসে পড়বো। লক্ষ্মীনারায়ণজীর বিখ্যাত মন্দিবে দুই মহেন্দ্র বসাককে ঘিরে আসর জমেছে ধ্রুপদের—একজন গায়ক অন্যজন পাখওয়াজী। গান কিছুদূব এগিয়েছে। মাত্র গুটিকয় শ্রোতা। হঠাৎ গান পড়ে গেলো তালের গর্তে। গান মাঝামাঝি এসে মাবামারিতে সমাপ্ত হবার উপক্রম। সুবতো পালিয়েই ছিলো। আমাদেরও পলাযন। ঘুবে ঘুবে এলাম এবারে লালমোহন সাহাব বিবাট নাটমন্দিরে। এখানে বাইজীর আসর জমেছে। ঢাকা শহবেব নানা জায়গায় রাধাকৃষ্ণ মন্দিরেব ছড়াছড়ি। ঠাঁটারিবাজাব, বনগ্রাম, নবাবপুব, তাঁতিবাজার, লক্ষ্মীবাজাব, নারিন্দা—কোথায় নেই? অনুরূপ নাটমন্দির ছিলো নবাবগঞ্জ ও চৌধুরীবাজাবে। বিশিষ্ট জন্মাষ্টমী মিছিল হতো দুটো এলাকাকে কেন্দ্র কবে—নবাবপুব একদিকে, তাঁতিবাজাব, ইসলামপুর অন্যদিকে। সে কথা থাক। লালমোহন সাহাব ঠাকুরবাড়িতে ঢুকতে যাওয়া এক সমস্যা। হঠাৎ পথ পাওয়া গেলো। নিচেব চত্বরে বাশি রাশি আলোকমালা ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে। ঘিরে বসে দর্শকমণ্ডলী। পান, পানীয় ও আতবেব সুগন্ধ ছড়িয়ে গিয়েছে আসবে। তিন-চাবজন বযস্কা নাচনেওযালীব দিকে চেয়ে দেখি এখানে শ্রাব্য কোনো বিষয় নেই এখন, শুধুমাত্র গোলমাল আর তালগোলের দৃশ্য। কাছাকাছি দুটো লোক ঘুরে ঘুরে বাজাচ্ছে সাবিন্দা। বেশিক্ষণ দাঁড়ানো হলো না। বেবিয়ে পড়লাম অন্য সঙ্গীতের সন্ধানে। উত্তব মৈশুন্ডীর এক সাধাবণ মন্দিবে অসাধাবণ ভিড়। তখন চলেছে ভগবান সেতাবীর সেতার বাজনা আর গোলাপ তবলচিব সঙ্গত। ভগবান সেতারীব বাজনা সুত্রাপুবে গিয়ে কাছে বসেই শুনেছি, এখানে আর শোনা সম্ভব হলো না।

বনগ্রামের পথ দিযে ফিরে যাচ্ছিলাম। নবাবপুবেব শেষ মাথায় লালুপাল আর টোকানিপালের দুটো নাটমন্দির—এখানে পাল্লা দিয়ে ঢপকীর্তন চলে। কীর্তন শোনার মানসিকতা নেই। কাজেই যুগীনগবে গলির মধ্যে দিযে নিবিবিলি একটি আসবের দিকে এগিযে গেলাম। খেযাল গান চলেছে। টপ্পা হবে। ঠুমরিও হবে। ঢাকায় এককালে হস্নু মিযাব টপ্পা আর রোহিনী কর্মকাবেব ঠুমবিব সমধিক খ্যাতি ছিলো। হস্নু মিযা পশ্চিমাঞ্চল থেকে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। আগরতলা রাজবাড়িতে তার নিয়মিত মুজরা হতো। ইসলামপুরের বিশিষ্ট কযেকটি মুসলমান গায়কদলেব মধ্যে গজল এবং কাওয়ালিরও সমধিক প্রচার ছিলো। এখানেই হস্নু মিয়া বেশি সময কাটাতেন শুনেছি। যেখানে এলাম—খেয়াল গান চলেছে। গাইছে দু'জন তরুণ গায়ক হারমোনিয়াম বাজিয়ে। ভালো লেগে গেলো। মাথায় টুপি পরে মাঝখানে বসে আছেন ওস্তাদ হেকিম সাহেব—হেকিম মুহম্মদ হোসেন, ঢাকায় মামুদ হোসেন নামেও পরিচিত। এখানকার গান টেনে নিয়েছে তরুণদের। বসে পড়লাম।

তরুণ কণ্ঠের কায়দা আর ভঙ্গি আকর্ষণ করে নিয়েছিলো অনেককে। দু'জন গায়ক এক সঙ্গে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইছিলো। গান শেষ হলো। এবারে অনুরোধ হলো : 'হেকিম সাহেব গান করবেন'। সেকালে ঘোষণার রীতি ছিলো না মোটেও। হেকিম সাহেব তানপুরা মিলিয়ে নিলেন। গান করলেন মধ্যলয়ে কয়েকটি খেয়াল। গানগুলো দীর্ঘ নয়। তানও কয়েকটি মাত্র, কিন্তু গানের স্থায়ী অন্তরা শুনে ভালো লাগলো সকলের। এরপর অনুরোধ হলো ঠুমরি– টপ্পার। হাবমোনিযাম বাজাচ্ছিল সাগরেদ রাধাগোবিন্দ ঘোষ। আসব এখানেই সমাপ্ত।

হেকিম সাহেবের সঙ্গে কথা বলছিলাম। জিগ্যেস কবি তিনি কি কি গান কবলেন?

কানে কানে বললেন, বাগেশ্রীব প্রাচীন বন্দেশ, তারানা, কাশীর টপ্পা আর ঝুলন। আপনি কোথায় থাকেন?

উত্তব শুনেই বললেন, ও আমাদের ওদিকে? আমি নবাবগঞ্জ চৌধুবী বাজার যাবো। সেখানেই আমাব বাড়ি। ঘোড়াব গাড়ি দিচ্ছেন ওঁবা। চলুন আমাব সঙ্গে।

সেকালে ঢাকায গায়ককে এভাবে যত্ন করা সহজ ছিলো না। সঙ্গে জুটে গেলাম। হেকিম সাহেবেব চেহারাটি শান্ত, দীর্ঘদেহী, তীক্ষ্ণ নাক ও চাপা ঠোঁট, দাড়ি-গোঁফে সবটা মিলে দেখেই মনে হবে স্বতন্ত্র একজন। গাড়িতে ফিবতে ফিরতে আমার সব খবব জেনে নিলেন---বাড়িতে গান করবাব অনুমতি আছে কিনা, গাইবার ইচ্ছে কিরূপ? ইত্যাদি। বিশ্ববিদ্যালযের অধ্যাপক মহলে অনেক গতিবিধি, তাঁব কাছে গান শেখেন কাজি মোতাহাব হোসেন, অঙ্কেব অধ্যাপক। পিলুবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ বিনয় রায়ও গান শিখেছেন ওঁর কাছে। আমাকে বললেন, ইঞ্জিনিযাবিং স্কুলেব ভাইস প্রিন্সিপাল সমরেশ রায় মহাশয়কে চেনেন? বেলওয়ে লাইনের পাশেই কোয়ার্টারে থাকেন, প্রতি মঙ্গল–শনিবার ওখানে গান বাজনা হয। ওখানে আসবেন।

আমন্ত্রণ বিশেষভাবে মনে পুষে বেখেছি। এবপব থেকে সমবেশবাবুব ওখানে বসে শিক্ষা, ওখানে গান করা, গানেব রেয়াজ চলতে থাকে। কোনো সময়ে আমাদের বাড়ি আসেন। এস্রাজ শেখার মারফতে স্বরলিপি আব সঙ্গীতশাস্ত্রেব সঙ্গে যে পরিচয় হচ্ছিলো, সেই সঙ্গে সমবেশবাবুর তবলা সঙ্গতে গানেব কতকটা উন্নতির পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম। সমবেশ বায চৌধুবী বিশেষ ভাবিক্কি লোক ছিলেন। স্যার আশুতোষের মতো ছিলো তাঁর গোঁফ, চোখ দুটো জ্বলন্ত গুলির মতো তীব্র, তৎকালীন সঙ্গীতসভা ইত্যাদিতে সমরেশবাবু প্রধান ছিলেন। তিনি বলতেন উর্দুর দুর্গালালার কাছে তিনি শিখেছিলেন তবলা, আতা হোসেনের (মুর্শিদাবাদেব) বোল তিনি বাজাতেন। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় তিনি একজন গানের বিচাবকরূপে গণ্য ছিলেন। বহু উদ্দীপনায় ঘটা করে মুহম্মদ হোসেনের কাছে গাণ্ডা বাঁধা সমাপ্ত হলো। নিয়মিত আসতেন তিনি। আমাদের বাসার সংলগ্ন মসজিদে নামাজ সেরে এসে বসতেন আমাদের বৈঠকখানা ঘরে। পান খেতেন আর অজস্র খেয়াল, ঠুমরি, টপ্পা শোনাতেন। শিখতে চাইলেই বলতেন, 'হবে, হবে। ভালো করে রেয়াজ করতে হবে। পাকাপাকি করে টপ্পা আয়ত্ত করুন, তাহলে অন্যান্য গানও স্বাভাবিক হয়ে আসবে। 'মুশকিলাৎ' আর 'জমজমা' তাল সহজ করে নিতে হবে গলার আড় ভেঙে। আমি

শিখেছিলাম হস্নুমিয়ার কাছে আর তিনি শিখেছিলেন হবিব মিয়ার কাছে। হবিব মিয়া পাঞ্জাব ও পরে লক্ষ্ণৌতে শিখে ঢাকায় এসেছিলেন।' খেয়াল গানের শিক্ষায় গান আরম্ভ হলো। সঙ্গে সঙ্গে গলার আড় ভাঙবার জন্য চারটি টপ্পা গান অভ্যাস করতে দিয়েছিলেন। মুহম্মদ হোসেনের কণ্ঠ সুমিষ্ট ছিলো কিন্তু দীর্ঘকাল অনভ্যাসে গলার গতিশক্তি শিথিল হয়ে গিয়েছিলো। মাঝে সাংসারিক বিপর্যয়ে কয়েক বৎসর গান ছেড়ে দিয়েছিলেন। বেশি বয়সে কয়েকজন শিষ্য মিলে তাঁকে আবার গানের পথে নিয়ে আসেন। নিয়মিত শিক্ষার পরেও তিনি প্রথম বয়সে বহুজনের কাছেই শিখেছেন। কোলকাতায় কিছুকাল থেকে সেকালে রমজান খাঁ ও মোরাদ আলী খাঁর কাছ থেকে কিছু আদায় করেছিলেন। কোলকাতায় কয়েকজনের কাছে কিছুকাল শিখে ঢাকায় আবাব ফিরে আসেন। পাঞ্জাবেব কালে খাঁ তখন ঢাকায় এসে কিছুদিন ছিলেন। বড়ে গোলাম আলী খাঁর পিতৃব্য কালে খাঁর কাছ থেকেই কিছু সংগ্রহ কবেছিলেন ঢাকাতেই। এরপব রামপুরেব তসুদ্দুক হোসেন খাঁ ঢাকায় এসে কিছুকাল ছিলেন, পরে তিনি থাকতেন ময়মনসিংহে। তসুদ্দুক হোসেন বিচিত্র রকমেব গানের ভাণ্ডাবী ছিলেন। মুহম্মদ হোসেন অনেকের সঙ্গেই এই প্রবীণতম ওস্তাদের কাছে বহু সংগ্রহ করেন। যে সময়ে তিনি সংগ্রহ কবেছিলেন, সে সবসময়ে ঢাকায় আলাউদ্দীন খাঁও (এদেশে পরিচিত 'আলম') অনেক সংগ্রহ করেছিলেন। পরে ময়মনসিংহে গিয়েও যথেষ্ট সংগ্রহ কবেছিলেন। একথা আমার শোনবাব সুযোগ হয়েছিলো আলাউদ্দীন খাঁ আর মুহম্মদ হোসেনের পবস্পরের আলোচনা শুনে ও চীজ সম্বন্ধে ভাবের আদান-প্রদান লক্ষ্য করে। আলাউদ্দীন খাঁ ১৯৩৬-৩৮ সালে যখন ঢাকায় এসে থাকতেন, পটুয়াটুলির যতীন কোম্পানিতে বসতেন, তখন এ সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের সেকালের অনেক কথা শুনেছি।

মুহম্মদ হোসেনের সংগ্রহ ব্যাপক ছিলো। পববর্তীকালে বহু স্থায়ী, অন্তরা, বহু বাগের গান ভাতখণ্ডে সংগ্রহের সঙ্গে আমরা মিলিযে দেখেছি তাঁর গানগুলোব মৌলিকতা।

মোগলটুলি ছাড়িয়ে আরমানিটোলা। চকবাজাবের রাস্তা দিযে যাতায়াত। নবাবপুরে যেমন গাযকবন্ধুদের আড্ডা ছিলো, আবমানিটোলাতেও তেমনি ছিলো কযেকটি আস্তানা। সরস্বতী পুজো উপলক্ষে গান হতো 'জনসন মেডিকেল মেসে'। ঢাকাব সঙ্গীতপ্রেমিক ছাত্রসমাজ এখানে ভেঙে পড়তো। প্রতি বছবেই সেখানে আসর বসে পচানন্দীব, যিনি কালিমপুবের 'পচা' বলে খ্যাত ছিলেন। পচা এমন গান করতেন যে এরপর সেখানে আর কেউ গান জমাতে পারতো না। বাইজীরা একবার যারা জেনেছে পচাকে, তারা মুখ খুলে পচার সামনে গায না—পাছে পচা চুরি করে নেয়। এসব কিংবদন্তি।

রাত ন'টার পর আসর জমে গেল মেসের দোতালার একটি বড়ো নাতিদীর্ঘ ঘরে। পচা হারমোনিয়াম বাজিযে গান শুরু করেছে। তবলিয়ারা ভিড় কবে বসেছে চারদিকে—কায়েতটুলির গোলাপের ভাই মহতাব চাঁদ তবলা বাজাচ্ছেন। তবলিয়ারা পচার সঙ্গে সাবধানী। সেকালে গানের সঙ্গে তবলিয়ার সাথ সঙ্গতের রীতি ছিলো। লয়কারী ব্যাপারটা গায়কের পক্ষে স্বাভাবিক। পচা একটি পর একটি গান গাইছেন। স্কেল্ এফ্ অথবা এফ্‌শার্প। গানের মুখ আরম্ভ করেই অবলীলাক্রমে জমাট প্যাঁচ কষেন। তৎকালে ইন্দুবালা, আঙ্গুরবালা

আর কৃষ্ণচন্দ্র দের রেকর্ডে গাওয়া কতকগুলো গান তাঁর সম্বল। বাংলা গানের চমকদার কতকগুলো মুখ, ভাবোচ্ছ্বল কতকগুলো শব্দবিন্যাস নিয়ে সুবে ও তালে এমন খেলা কখনো দেখা যায় নি। সুললিত কণ্ঠের জোরে ঠোক্ ঠমকে, তানে, কায়দায় রস রসিক যেন নেচে উঠতেন। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শ্রোতা বসে থাকেন। পচার কাছে বিচার নেই, রবীন্দ্রনাথ নেই, অতুলপ্রসাদ নেই, দ্বিজেন্দ্রলাল নেই, নজরুল নেই—আছে শুধু তাঁদের গানের মূল সুর বজায় বেখে কতকটা নিজের মতো করে গাওয়া, আজকাল যাকে রাগপ্রধান বলি সেই রূপের প্রাথমিক ভঙ্গিতে। পচাব আসরে সকলেই সমাগত—ওস্তাদ, গায়ক ও ছাত্রসমাজ। কিন্তু পচা ক্লান্তিহীন—এ গানের সীমা নেই, বাঁধন নেই। পচা আপন রুচি ও রসবোধের একটা পথ বেঁধে দিয়েছেন। মধ্যলয়ের কতকগুলো সহজ খেয়াল অত্যন্ত প্রচলিত রাগে গাইবার পর বাংলা গান চালাতেন সম্পূর্ণ ঠুমরি ভঙ্গিতে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতপন্থীরা অশাস্ত্রীয় গানেব নিন্দা করেন। গানেব নাক-কান নাকি উড়িয়ে দেয পচা—কিন্তু সকলেই শ্রোতা।

পরদিন সকালেব আসরে আসেন কুমিল্লাব খসরু মিযা (এঁব নামও মোহম্মদ হোসেন)। খসরু আব একটি হাবমোনিযাম নিযে একসঙ্গে দু'জনে গানেব একটি বিশেষ পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে নেন। খসরু মিযা ভঙ্গি দ্বাবা কতকটা শ্রোতাকে আকর্ষণ করেন, কিন্তু পচা সেক্ষেত্রে প্রধান থেকে যায। খসরু মিয়ার ওস্তাদী ও কৃতিত্ব তবু সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

খসরু মিযাব প্রকৃত নাম মাহ্‌মুদ হোসেন। কুমিল্লার দারোগাবাড়িব ছেলে। কলকাতা থেকে বি.এ পাস কবেন। প্রথম জীবনে বাঁশি বাজাতেন—ভালো বাদক ছিলেন। শিক্ষা-জীবনে বহুদিন কলকাতায় কাটান। গানের আসরে ঘুরে বেড়ানো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিলো। ছেলেবেলা থেকে বাংলা গানেও অভ্যাস ছিলো কিন্তু মন ছিলো রাগসঙ্গীতের দিকে। কলকাতায কোনো আসরে খেয়াল গান শুনতে শুনতে গায়কেব সঙ্গে নিজ মনে গুনগুন করে তান, পল্টা করতে আবম্ভ কবেন। কোনো বিশিষ্ট ওস্তাদ গায়কের দৃষ্টিতে এলে পর তিনি খেযাল গান শিখতে শুরু কবেন। সংগ্রহেব নেশায় মেহেন্দী হোসেন খাঁ এবং অন্য অনেকের কাছেই যাতাযাত কবেন, আসরেও গান কবতেন। বি.এ পাসের পর তাঁব বাবা তাঁকে এম.এ পড়ার জন্য ঢাকা সলিমুল্লাহ্ হলে আলি নূবের অভিভাবকত্বে রেখে আসেন। কিন্তু খসরু ঢাকা এবং অন্যান্য স্থানে গান কবেই বেড়াতেন। সমরেশবাবুর আসরে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। হেকিম সাহেবের কাছ থেকেও কিছু সংগ্রহ করেছিলেন। হেকিম সাহেব তাঁকে ভালবাসতেন। কিন্তু এম.এ পড়া আর হলো না। এরপর খসরু মিয়া আবাব কোলকাতায় বেঙ্গল কো-অপারেটিভে, রাইটার্স বিল্ডিং-এর পেছনে 'মিটারস বিল্ডিং'-এ চাকরি করতেন। ঢাকা-কুমিল্লায় যাতাযাত অব্যাহত ছিলো। খসরু মিয়াব সাগরেদদের মধ্যে কুমিল্লার সমরেন্দ্র পাল সুখ্যাত ছিলেন। শৈল দেবী সমবেন্দ্র পালের কাছেই শিখেছিলেন। খসরু মিয়ার অন্যান্য সাগরেদ্ সম্বন্ধে আমাদের আর জানা নেই। নিরন্তর গানের আসরে ফিরে গুণী হিসেবে এমন পরিচিত হয়েছিলেন যে আজকালও কলকাতার কোনো কোনো প্রবীণ গায়কের মুখে খসরু মিয়ার কথা শুনেছি। সঙ্গীতে শেষ পর্যন্ত তিনি ভাতখণ্ডে সংগ্রহের ওপর খুব বেশি জোর দিতেন। দেশ বিভাগের পর খসরু মিয়া ঢাকায় চলে যান। ঢাকাতেই তিনি লোকান্তরিত হন।

মুহম্মদ হোসেনের দেহান্ত হয়েছিলো '৪৬–৪৭ সালে। জ্ঞান গোস্বামীও লোকান্তরিত হন কিছু সময়ের ব্যবধানে। এই দু'জনকে নিয়ে তৎকালীন ঢাকার সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলাম। প্রবন্ধটি ড. এস. কে. দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো এবং তিনি আমাকে ডেকে কয়েকটি কথা বলেছিলেন যা আজো মনে পড়ছে। বলেছিলেন, 'টপ্পা গাইবার রীতিকে ভাষায় ভালোভাবে কোথাও ব্যাখ্যা করা হয় নি। তুমি মুহম্মদ হোসেনেব বক্তব্যগুলো আরো গুছিয়ে কখনো সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে লিখবে।' ড. দে কেন সংক্ষেপে একথা বলেছিলেন তখনই ভাবতে পাবি নি, উনি প্রবন্ধ পড়ে খুশি হয়েছেন ভেবেই ভালো লেগেছিলো। পরে বুঝতে পেরেছিলাম ড. এস. কে. দে-র History of Bengali Literature in the Nineteenth Century, Calcutta 1919, গ্রন্থ পাঠ কবে। এই অমূল্য গবেষণাগ্রন্থটি বচনার পূর্বে এ বিষযে যথেষ্ট অনুসন্ধান কবেছিলেন। টপ্পা গানেব বীতি সম্বন্ধে মুহম্মদ হোসেনের মতামত যা কথায় কথায় আলোচনা হয়েছিলো তা এই : ১. টপ্পা গানেব পাঞ্জাবি ভাষায় স্থায়ী অন্তরা বিলম্বিত পাঞ্জাবি ঠেকাতে গাইতে হবে। প্রাচীন বীতি অনুসাবে বিলম্বিত লয়ে কখনো কখনো দ্রুত তানেব সঙ্গে সম্পূর্ণ স্থায়ী বা অন্তরা একেবাবে একওযার্ধা তালে একবাবে গাইতে হবে। এই রীতিটি বাংলা টপ্পা গানে প্রচলিত নয। বাংলা গানে তাল যেমন সরল, তানও তেমনি সরল ও স্তরে স্তরে গাঁথা। ২. মূল টপ্পায় একবার তান কথাকে মিশিয়ে আবম্ভ করলে তাকে জমজমা রীতিতে গেযে প্রতিবারে সমে ফিরে আসতে হবে। ৩. তানগুলো এক বিশেষ পদ্ধতিব বোলতানের মতো শোনাবে। বাংলা টপ্পাতে এ ভঙ্গিটা ব্যবহৃত হয খুবই কম অথবা একেবাবেই হয না; কারণ বাংলা টপ্পায ভাবাবেগেব প্রকাশ প্রাধান্য লাভ কবে। ড. এস. কে. দে এই লক্ষণ বর্ণনা কেনো প্রয়োজনীয মনে করেছিলেন তা তাঁব নিধুবাবুব গান আলোচনা লক্ষ্য কবলে বুঝতে পারা যায়।

কাশিমপুবের পচার কথা পরেব জীবনে কতো আলোচনা হযেছে। ঢাকা বেডিও স্টেশন শুরু হবাব পর পচা নন্দী রেডিওতে গান কবতে আসে। আমরা ভেবেছিলাম তানপুবার যুগে পচা নন্দীর সুবিধে হবে না। কিন্তু বেডিওতে শুনে দেখেছি সেই উদাত্ত কণ্ঠ, সেই তীক্ষ্ণ সুর প্রতিস্থাপনা, অনায়াস আবেদন আর লযেব কারিগবি বজায ছিলো। বেডিওর উপযুক্ততা অর্জন করবার জন্যে পচা কিছু চীজ সংগ্রহ কবে নিজের ছকে সাজিয়ে নিযেছিলো। আসলে পচা নন্দী ছিলো ছেলেবেলায যাত্রাগানেব দলেব ছোকরা-গায়ক। অল্প বযসেই জযদেবপুরেব অন্তর্গত কাশিমপুরের সারদাবাবুর ওখানে আসবে গান করতে শুরু কবে দেয। শেখার সুযোগ ছিলো না তেমন। গ্রামোফোন বেকর্ডে জহরাবাই আগ্রাওয়ালীর গান নকল কবে প্রথমে পর্যায়ের শিক্ষা। এরপর গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে গান শেখা—এইসব ছিলো পচা নন্দীর বিশেষ লক্ষ্য। শুনেই গান দখল করার পটুত্ব ছাড়াও, মনমাতানো হাল্‌কা ঢং-এ গান উপস্থাপিত করার একটা চমকপ্রদ রীতি উদ্ভাবন করে নিয়েছিলো। আমাদের সে বযসে নির্বিচার মনমাতানো মাইফেল গাইয়ে পচা নন্দী থেকে নিবিড় উন্মাদনা লাভ করা যেতো। বিশেষ করে ঢাকা কুমিল্লা ময়মনসিংহে বিভিন্ন গানের আসরে পচা ছিলো প্রধান অনুপ্রেরণাব উৎস। পরে যখন পচার সঙ্গে গান করবার সুযোগ হয়েছিলো তখন লক্ষ্য করেছি ঠুমরি

গানে, প্রেমের গানে ওর প্রাণ ছিলো অভিষিক্ত। লেখাপড়া জানতো না পচা, কিন্তু এই গায়কের গানে পূর্ব বাংলার সঙ্গীতপ্রিয় তরুণ সমাজ ধীরে ধীরে ভালো শ্রোতা হবার পথে এগিয়ে গিয়েছিলো। চল্লিশ দশকের পর কখন যে পচার প্রাণবিয়োগ হয়েছিলো মনে নেই।

গানের আসরের খোঁজে ঢাকা শহর সাইকেলে চষে বেড়াই। গোয়ালনগরের ওদিকটায় একাধিক আড্ডা ছিলো। কোর্টের পেছনদিক দিয়ে খগেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়িতে উপস্থিত হতাম। খগেশবাবু নাট্যক্ষেত্রেই আজও পরিচিত। তিনি আগ্রার গুল মহম্মদ খাঁর কাছে গান শিখতেন। সেখানেই প্রথম দেখা। উনিশশো তিরিশের কিছুকাল পরেই গুল মহম্মদ খাঁর গান শুনে প্রথমে স্তম্ভিত হয়েছিলাম। গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠ, কতকটা চেরা ভারি আওযাজ। স্থির হযে বসে গান কবেন, বড়ো বড়ো হাত দু'টি সুদৃশ্য ভঙ্গিতে বিস্তার ও তানের সঙ্গে অঙ্গুলি সঞ্চালন করে গান কবেন। এ যেমন রাগেব মীবের অংশ বুঝিয়ে দেবাব চেষ্টা, আবাব তেমনই আত্মপ্রকাশেরও দিক। গুল মহম্মদ খাঁ যখন এসেছিলেন তখন তাঁর কণ্ঠে বৈবিব আমেজ বেশি ছিলো না, প্রচুব সাবগম কবতেন, রাগেব তানগুলোকে সাবগম কবেই বোঝাতেন। সুদক্ষ ছিলেন। কণ্ঠকে কি কবে সুবে নানাভাবে ধ্বনি সামঞ্জস্যে বড়ো ছোট কবে তোলা যায জানতেন। গান কববার এমন ভঙ্গি ঢাকায় শোনা যায় নি। খগেশবাবুকে শেখাবাব সময় লক্ষ্য করা গেলো প্রাচীন রীতির 'মেবে সাথ গাও' পদ্ধতিটি। অর্থাৎ এ গান শিখতে হলে থিওবি এবং স্বরলিপি ইত্যাদির চেয়ে শুধু সঙ্গে গাইতে হবে। পরে বহু ক্ষেত্রে গান শুনে অনেককে শেখানো দেখে মনে হলো গুল মহম্মদ খাঁ গানেব আব একটি বাজ্যের সন্ধান জানেন। যা আমবা এতোকাল ঢাকায় শুনেছি তা থেকে স্বতন্ত্র রাজ্য। ওখানে থেকে যে গান আমবা আবদুল কবিম খাঁর বেকর্ডে প্রথম শুনেছি। গানের মূল উৎস বাগেব ধীর বিস্তার, ধীর ভঙ্গির গান, রাগকে আস্তে আস্তে আযত্তের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট করা, ছন্দে ছন্দে স্তরে স্তবে সাবগমের নানা বিন্যাস দেখানো—যদিও সমস্তটাই বাঁধারূপেই বিকাশ। গুল মহম্মদ খাঁ বলতেন তাঁব ঘবানাব মূলে বৈরম খাঁ। গুল মহম্মদের পিতার সঙ্গে জহবাবাই আগ্রাওযালীব সম্পর্কও সুবিদিত ছিলো। গুল মহম্মদ খাঁ ঢাকায় এসে বসতি স্থাপন কববাব পব তাঁব পসাব কিছুটা জমে ওঠে। কিন্তু অধিক বযসে আশ্চর্যরূপে রেযাজ কবে গলার গতিবেগ বাড়িয়ে ফেলেছিলেন। আমরা গুল মহম্মদ খাঁব গান শোনাব সমযেই আবদুল করিম খাঁ আর পবে ফৈযাজ খাঁর রেকর্ডেব গান শুনে উত্তব ভারতীয় সাঙ্গীতিক পরিমণ্ডলে খেয়াল গানের ব্যাপকতা সম্বন্ধে আঁচ কবতে পেরেছিলাম। পরে কলকাতায় যাতায়াত করে আরো বৃহত্তর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা গেছে। গুল মহম্মদ খাঁ গম্ভীর ও গভীর ভাবদ্যোতক গানের ভঙ্গিব দিকে মন টেনেছিলেন। অবশেষে মুহম্মদ হোসেনের অনুমতি নিয়ে একদা গাণ্ডা বেঁধে সাগরেদও হয়েছিলাম। কিছুকাল শিখেওছিলাম। গান সংগ্রহের দিকে অভাব আমাদের তেমন ছিলো না, কিন্তু ভঙ্গিটাই ছিলো লক্ষ্য। পরবর্তীকালে ইন্দোরের গায়কদের মধ্যে এ ভঙ্গি লক্ষ্য করেছি।

গুল মহম্মদের সমসাময়িককালে আর একজন গায়ক ঢাকায় আসর জমিয়ে বসেছিলেন—তিনি মহারাষ্ট্রের নারায়ণ রাও, যাকে যোশী বলে অভিহিত করা হয়। হাল্‌কাভঙ্গির

ঠুমরিচালের গান এবং মধ্যলয়ের খেয়াল গেয়ে ঢাকার শ্রোতাসমাজকে মুগ্ধ করেছিলেন নারায়ণ রাও। বহু গায়কের মধ্যে শ্রুতিমাধুর্যের জন্যে নারায়ণ রাও-এর ঠুমরি ও খেয়ালের বিশেষ সমাদর হয়েছিলো। নিজ ছাত্রছাত্রীদের কেন্দ্র করে তিনি বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ঢাকায়ই থেকে যান। ১৯৩৫/৩৬-এর পর থেকে কলকাতার বিখ্যাত গায়কেরা প্রায় প্রতি বৎসরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও নানাস্থানে আসতে থাকেন। পরে সঙ্গীতের প্রসার হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলে গানেব আসব বেশি জমে।

মনে পড়ছে কোনো এক শারদ দুপুরে ওস্তাদ হেকিম সাহেব এসে বললেন, চলুন আজ দুপুরে শুভাঢ্যা যাব।

শুভাঢ্যাতে কেনো?

বনোযাবীবাবুর বাড়ি। বনোয়ারীলাল বসুব কথা অনেকেই শুনেছে। বনোয়ারীলাল বসু তখন পাবনা কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল। অধ্যাপনাব ফাঁকে ফাঁকে গান শিখতেন—খেয়াল গান করতেন। আমরা তাঁকে দেখেছি ঢাকাব গানের আসবে সত্যি যেন সুবসিক গন্ধর্বেব উপস্থিতি। ওস্তাদজীর সঙ্গে এলাম সদরঘাটে বুড়িগঙ্গার পাড়ে। সেখান থেকে নৌকো করে ভরা নদী পার হয়ে শুভাঢ্যা যেতে বড় ভালো লাগতো। নদী কানায় কানায় ভরা। ওপারে পৌছে ওখান থেকে মাইলখানেক হাঁটা পথেব পর অনেক বাড়িঘর পেবিয়ে গিযে ফের নৌকা করে বনোয়ারীবাবুর বাড়ি পৌছানো গেলো। বহু দালানবাড়ি সমন্বিত শুভাঢ্যা গ্রাম ছিলো পারজোযারেব সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু অঞ্চল। শুভাঢ্যাতে আগে আরো এসেছিলাম, শীতকালে বাদামতলি পার হয়ে হেঁটে এবং পরে এসেছি সহপাঠী বন্ধুর বাড়িতে, মুহম্মদ হোসেনের সাগবেদ বিবাজ দাশেব বাড়িতে, আরো অনেককাল পবে এক সাহিত্য সভায়।

বনোযাবীবাবু সাদর সম্বর্ধনা জানালেন। ওস্তাদজীব জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। ইজি চেযারে গা এলিয়ে দিযে বই পড়ছিলেন। গানের আলোচনা শুরু হয়ে গেল। ভালো ঢং-এর লক্ষণ কি হতে পাবে? কোনো কোনো ঘবানায় বাগের স্ফূর্তি খুব সুন্দব হয? ইত্যাদি। ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁব আলাপ ও তান পল্টা, আবদুল কবিম খাঁর গান—এসব আলোচনা হতে হতেই জনৈক লক্ষ্ণৌব গায়ক এলেন বনোয়ারীবাবুকে গান শোনাতে। জানতে পেরেছেন বনোয়াবীবাবু গানের বিশিষ্ট রসিক। তাঁকে গান গাইবার অনুবোধের উত্তবে তিনি বললেন, 'এখন শুধু মৌলিক শ্রোতা হবার চেষ্টায আছি। অধ্যাপনা শুরুরও পূর্বে ওস্তাদ মুহম্মদ হোসেনজীকে অবলম্বন করে যেভাবে গানের ভেতর ঢুকেছিলাম তাতে আজও গান বোঝার আনন্দ লাভ করছি শুধু।' এরপব সারারাত ধরে খেয়াল গানেব আসর হলো বনোয়ারীবাবুর বাড়িতে।

১৯৩৬-৩৭ সালে ঢাকায গানের জোয়াব এসে গেছে--খেয়াল ও ঠুমরির চর্চা চলেছে, নানা গাযক-বাদকের আনাগোনা বাড়ছে। তখন সুত্রাপুর ছাড়িয়ে কেশব বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকখানা নতুন গানবাজনা শোনাবার বিশেষ কেন্দ্র। অন্যদিকে ফরাশগঞ্জে রূপবাবু রঘুবাবুর বাড়ির জমিদারী আমলেব পরিবর্তন হয়েছে—কিন্তু নানা ঘরে গানের আসর জমে। যোগেশ দাশ তাঁর জলসাঘবে মাঝে মাঝে আসর জমিয়ে তোলেন। উল্টোদিকের বাড়িতে ওস্তাদ হেকিম সাহেবের ছাত্র বাধাগোবিন্দ ঘোষের আসব জমে। রাধাগোবিন্দ

কিছু ঠুমরি আদায় করেছিলেন।

কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একদিকে যেমন বহু বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, কলকাতার কাউন্সিল, বহু সঙ্গীত সম্মেলন ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তেমনি তাঁর জীবন কেটেছে তবলার সাধনায়। তাঁর বড় ছেলে নির্মলকে মসিদ খাঁর কাছে শিখতে দিয়েছিলেন। অত্যন্ত ভালো তবলিয়াতে পরিণত হয়েছিলো নির্মল, ঢাকা রেডিও শুরু হবার পর কেশববাবু নিজ পুত্রকে নিয়ে ঢাকাতে তবলার লহরা বাজাবার প্রচলন করেন। যদিও প্রথম জীবনে কেশববাবুর শিক্ষা ছিলো প্রসন্ন বণিকেব কাছে, পববর্তী জীবনে অনেকের কাছে শিখে বাদকরূপে সুপরিচিত হয়ে ভারতের বহু সঙ্গীত সম্মেলনে বাজিয়েছেন, বিখ্যাত গায়কবাদকের সঙ্গে। ঢাকায় কেশববাবুব অবদান অতুলনীয়। ১৯৩৯-এ বেতাব কেন্দ্র ঢাকায় শুরু হবার পর থেকে বহু সঙ্গীতজ্ঞ এসেছেন, অনেকেই কেশববাবুর বাড়ি ও তাঁব আসরকে কেন্দ্র কবতেন, বিশেষ করে যন্ত্রীদেরতো কথাই নেই। এখানেই মসিদ খাঁর বাজনা শোনা হয়েছিলো। কেশববাবু শেষ জীবনে নিজে তবলায দিল্লিবাজ শিখেছিলেন সুপ্রসিদ্ধ নাথু খাঁর কাছে। যন্ত্রীদের সঙ্গে সার্থক সঙ্গতদার ছিলেন কেশববাবু, ঢাকায সঙ্গীতক্ষেত্রে সে যুগে তিনি ছিলেন মধ্যমণি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েব ছাত্রদের মধ্যে বাগ-সঙ্গীতের প্রচারের লক্ষণও উল্লেখযোগ্য। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদাব জগন্নাথ হলে ছাত্রদের জন্যে একটি সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। গৌবদাস সেখানে গান শেখ্যাতেন কিন্তু এ ব্যবস্থা বেশিদিন চালু থাকে নি। প্রথম যুগে জগন্নাথ হলে চলতো মেযেদের সঙ্গীত প্রতিযোগিতা। কয়েকটি আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান হযেছিলো। ঢাকা হলে ছেলেদের সঙ্গীত প্রতিযোগিতা কিছুকাল ভালোই চলেছিলো, এতে সাথর্ক প্রতিযোগীদেব সোনার মেডেল দিয়েও গানের নৈপুণ্য স্বীকাব করা হতো। যে সময় থেকে প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে গেলো তাও মনে পড়ছে। জনৈক প্রতিযোগী-গায়ক, গান করবার পর বললেন, ওর সঙ্গে যে তবলা সঙ্গত করেছে সে প্রকৃত তাল বাজায় নি, ইচ্ছে করে তাকে বিব্রত কবেছে। ব্যাস্, কার্জন হলে এ নিয়ে মাবধর হযে গেলো। উপস্থিত ছিলাম ওখানে। যাঁরা গোলমালের পাণ্ডা, তাঁরা বিশ্ববিদ্যালযের ছাত্রতো নযই, গানবাজনাও জানতো কি না সন্দেহ।

কার্জন হলের বহু সঙ্গীত আসরের মধ্যে একটি বিশেষ করে মনে পড়ে। তখন আমাদেব বযস সামান্য। আলাউদ্দীন খাঁর বড়ো ভাই আফতাবুদ্দিনকে ছাত্ররা সংবর্ধনা দিয়েছিলেন। আফতাবুদ্দিন সেখানে আসব মাতিয়ে বাঁশি বাজিয়েছিলেন, বাঁশির পর বাজালেন দোতারার মতোই উন্নত সংস্কবণের একটি যন্ত্র—নিজের তৈরি। আর অবশেষে বাজিযেছিলেন হারমোনিয়াম। সাধারণ শ্রোতার সমক্ষে সর্বাঙ্গ দিয়ে এরূপ অদ্ভুত হারমোনিয়াম বাজানোর দৃষ্টান্ত বিরল। কার্জন হলে ঢাকা হলের উদ্যোগে আরো দু'একটি যন্ত্র-সঙ্গীতের আসরের কথাও উল্লেখ করা যায়।

ভগবান সেতারীর বাজনাব রীতি ছাত্রসমাজে কমে এসেছিলো। তখন ময়মনসিংহ থেকে এনায়েত খাঁর শিষ্য ও প্রশিষ্যের দল ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ঢাকায় কেউ কেউ এসে এনাযেত খাঁর সেতার বাদনের ভঙ্গিটিকে চালু করেন। গৎও কিছু কিছু ছড়িয়ে পড়তে

থাকে। মনে পড়ছে, মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ঢাকায় এসে সঙ্গীত শিক্ষাদান আর সঙ্গীতের চর্চার শুরু কবেন। মনোরঞ্জনবাবুর ছাত্রগোষ্ঠী বেশ ছড়িয়ে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই ভঙ্গির যন্ত্র তৈবি, যন্ত্র বিক্রি এবং এধরনের সঙ্গীত শিক্ষার একটা কেন্দ্র দাড়িয়ে যায়। পরবর্তীকালে আলাউদ্দীন খাঁর কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত, অথবা আয়েত আলীর শিষ্য তাঁদের বংশের বাজিয়েরাও ঢাকায় আসতে থাকেন।

আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবকে যখন ঢাকায় সাধারণ সঙ্গীত–বসিকগণ ভালো করে চিনতে আবম্ভ করেছেন এবং যখন জেনেছেন যে আলাউদ্দীন খাঁ নানাভাবে ঢাকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তখন থেকে আলাউদ্দীন ঢাকায় বেশি আসেন নি। উদয়শঙ্কর যখন ঢাকায় গিয়েছিলেন তখন থেকেই আলাউদ্দীন খাঁর কথা ঘরে ঘবে জানা হয়ে গেছে। বহু পূর্বে আফতাবুদ্দিন ও আলাউদ্দীন ভগবৎ প্রসন্ন শাহ শঙ্খনিধির কাছে ছিলেন, পরে আলাউদ্দীন খাঁ স্বতন্ত্রভাবে এসে কিছুদিন ছিলেন। এরও পববর্তীকালে কুমিল্লা যাবাব পথে তিনি যখন এসে পাটুয়াটুলিব ওদিকে থাকতেন তখন তাঁর সঙ্গে আমবা দেখা কবেছি, তাঁব সঙ্গে নানা আলোচনাও করেছি। এই দশকেবই শেষভাগে ওস্তাদ ওয়ালীউল্লাহ্ খাঁ এসে বাস করতে শুধু কবেন নবাব বাড়িব উল্টোদিকে এক গলিতে। ওয়ালীউল্লাহ খাঁ আমাদেব বড় সমাদব কবে আমন্ত্রণ জানাতেন। তাঁব বাড়িতেও বেশ কতকগুলো গানের আসব বসেছে, আমরা সেখানে জলসা জমিয়েছি। ঢাকায় বেডিও আসার পব একে একে সুধীবলাল, চিন্ময় লাহিড়ী কিছুকাল বাস করেন, সেই সূত্রে সাধারণের মধ্যে গানের উদ্দীপনা জাগে।

বিশ্ববিদ্যালযে সে সময়ে যাঁদের কাছে আমরা গানেব আসব জমিয়েছিলাম তাঁরা হলেন প্রফেসব সত্যেন বসু, ডাঃ এস.এন.বায়। মাঝে-মাঝেই জলসার আয়োজন হতো। মনে পড়ে ঢাকাব ভাইস চ্যান্সেলর হাসান সাহেবের বাড়িতে হযেছিলো একটি গানের আসর। খেয়াল গান শোনানোর জন্যে তবলিয়া নিয়ে উপস্থিত হওয়া গেলো। প্রফেসর বোস সেখানে ছিলেন। আদেশ করলেন বাহাব আব আড়ানা রাগের দুটো খেয়ালের তাবতম্য দেখিয়ে দাও। গান শোনানোব পর তত্ত্ব জানতে চাইলেন। হাসান সাহেব নিজে গজল গান কবতেন, সঙ্গীত বসিক ছিলেন। আবো দু'একজন অধ্যাপকেব বাড়িতে জলসা বসতো, ড. নির্মলচন্দ্র সেন (ঢাকা ইন্টাব কলেজের তৎকালীন অধ্যাপক) তবলা বাজিয়ে হযে আসতেন। এ আসব জমতো ড. সেনের ব্যবস্থাপনায।

এবারে একটি বিশেষ ঘটনাব উল্লেখ করছি। বাংলা বিভাগের ছাত্র ছিলাম, সাহিত্য নামক ঘোড়ারোগ আর সঙ্গীতরোগ এ দুটোর টানাপোড়েনে স্বাভাবিক ছাত্রাবস্থা কাটাতে পারি নি। মোটামুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে যেন ভালো ছাত্র, অন্য কোনো নেশা নেই, বেরিয়ে এলে সঙ্গীতের টানে দিশেহাবা। সাহিত্যের আগ্রহ আব বাইরে ঔদাসীন্য দেখাবার ফলে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মোহিতলাল মজুমদাব, ড. এস. কে. দে প্রভৃতি ব্যক্তিত্বের বড়ো কাছে যেতে পেবেছিলাম। সঙ্গীত ব্যাপারটা সকলের কাছে তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। এম.এ পাস কববাব কিছুকাল পর, হঠাৎ ড. শহীদুল্লাহ্ সাহেব আমাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গেলেন। এরপর তাঁর ঘোড়াব গাড়িতে চেপে তাঁর সঙ্গে যাবার আদেশ পেলাম। কোথায় যেতে হবে জানি না। অবশ্য শহীদুল্লাহ্ সাহেবের সঙ্গে তাঁর দু'একটি বক্তৃতাস্থলে

এব পূর্বে গিয়েছি। এবারে যেখানে এনে উপস্থিত করলেন তাহলো তখনকার বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক আবদুর রশিদ সাহেবের বাড়ি। সেখানে আমাকে নিয়ে এক সভায় কযেকজন গণ্যমান্য অতিথির সামনে বসিয়ে, একটি হারমোনিয়ামের ওপব তাঁর বগলদাবা করা বই খুলে আমার সামনে রেখে বললেন, নাও—এ আমার হাফিজের বাংলা অনুবাদ—এগুলো তুমি গান কবে শোনাও।

এই আদেশ পাওয়ামাত্র মাথায় বজ্রাঘাত। আমি যে গান করি সম্ভবত তিনি শুনেছেন। কিন্তু গান—গান। সব জিনিসই গান হতে পারে না। তিনি বুঝলেন না যা লিখেছেন তা গানেব ভাষা নয়, তাছাড়া গানেব কোনো প্রস্তুতি আমাব নেই। একটি হারমোনিয়াম ছাড়াও গানের জন্যে তবলা দবকার। কাছাকাছি পানেব দোকান থেকে একজন তবলিযা যোগাড় হলো। কিন্তু অথঃ কিম?

আদেশ অকাট্য। শ্রোতাব মধ্যে ছিলেন কলকাতাব একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক। তিনি তাকিযেছিলেন আমাব দিকে। আদেশ তামিল কবেছিলাম। শহীদুল্লাহ্ সাহেব হয়তো খুশি হয়েছিলেন। কেউ মুখে রুমাল চেপে হেসেছে কি না লক্ষ্য করি নি।

বরিশালের 'পোলা'র ঢাকা আগমন

উপক্রমণিকা

চল্লিশের দশকের ঢাকা—এই শিবোনাম আমার মনে অনেক দিন ধরেই বেশ আলোড়ন তুলে চলেছিলো। ওই দশকেব লোকজন আমাদের পরিচিত মহলে আজ একেবাবেই কমে গেছেন। চল্লিশের দশকেব ঢাকা, বিশেষ করে সে সময়কার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ, তখনকাব সক্রিয় পবিচিত প্রগতিশীল তরুণ ছাত্রদের প্রসঙ্গ, বিশিষ্ট শিক্ষকদেব কথা স্মরণ করা এবং বর্তমানের তরুণদেব কাছে সেসব জানানোর একটা প্রয়োজন ও গুরুত্ব রয়েছে। বর্তমান অবশ্যই বর্তমানের হাতে। বর্তমানের যুবক আর তরুণবাই বর্তমানেব মীমাংসাকাবী শক্তি, সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি। এই বর্তমান অবশ্যই নতুন। এরা চল্লিশে ছিলো না। চল্লিশে এদের জন্মই হয় নি। চল্লিশে যাদের জন্ম হয়েছে তাদেব বয়সই এখন, এতো বছর পরে পঞ্চাশেব ওপর। এই বয়সেব ব্যক্তিরাও আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। এদেব কেউ সমব অধিনায়ক, কেউ বা সেক্রেটারিয়েটের কর্মকর্তা, অনেকে রাজনৈতিক নেতা, অধ্যাপক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী। তবু এঁবা চল্লিশের দশককে সচেতনভাবেপ্রত্যক্ষ করেন নি। অথচ চল্লিশের দশকের যে সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, ভাবনা–ধাবণা–চিন্তা, তাবই ফসল, তাবই সৃষ্টি এঁরা। কিন্তু এই চল্লিশেব দশকেব ঢাকার জীবন সম্পর্কে বর্তমানের একজন প্রৌঢ়েব যেমন কোন অন্তরঙ্গ ধারণা নেই, তেমনি বর্তমানের তরুণদেব কাছে চল্লিশের দশক একেবাবেই অতীত ইতিহাসের ব্যাপাব। কেবল যে অতীত ইতিহাসের ব্যাপার তাই নয়, অজ্ঞাত এক ইতিহাস। এ ইতিহাসের ওপর গবেষণা আবশ্যক। কারণ চল্লিশের দশকের ঢাকার গুরুত্ব কেবল এ কাবণে নয় যে,ওই দশকে যে ঢাকা ছিল পূর্ববঙ্গের একটি শহর মাত্র, সমগ্র বঙ্গদেশের এবং বাজধানী কলকাতার তুলনায় মফস্বল শহর মাত্র, সেই ঢাকাই দশকের শেষে '৪৭–এর বঙ্গবিভাগের পর পরিণত হয়েছিল পূর্ববঙ্গের রাজধানীতে। কেবল এই কারণেই নয। বঙ্গদেশের একটা ঐতিহাসিক বিভাগ পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ হিসেবে ইতিহাসের বেশ কিছুটা পর্যায় থেকেই একটা সত্য এবং তার একটা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।এই বৈশিষ্ট্যটি প্রধানত এই সম্প্রদায় কিংবা ঐ সম্প্রদায়েরপ্রাধান্য-অপ্রাধান্যের বৈশিষ্ট্য। অন্তত সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘুব বৈশিষ্ট্য। এবং সে দিক থেকেই পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজে শিক্ষার

ক্রমপ্রসারের ক্ষেত্রে কলকাতার বাইরে ঢাকা, তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেমন অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল, তেমনি ঢাকার শিক্ষাগত এবং সামাজিক–রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, তার ধাবা–উপধারা সমগ্র বঙ্গদেশেব রাজনীতিতে, বিশেষ করে মুসলিম সমাজের বাজনীতিতে একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ক্রমিক গুরুত্বের সঙ্গে পালন করে আসছিল।

ভাবত উপমহাদেশের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ১৯৪০ সালে তখনকার প্রধান মুসলিম বাজনৈতিক সংগঠন মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হযেছিলো লাহোরে। সে প্রস্তাবের শাব্দিক গঠন যাই থাক, পাকিস্তান আন্দোলন মানে ভারতকে হিন্দু–মুসলমান হিসেবে ভাগ করে মুসলমানদেব জন্যে একটা ভিন্ন এবং নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। পাকিস্তান প্রস্তাব থেকেই পাকিস্তান বাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। সে আন্দোলন ক্রমান্বযে বিস্তাবিত হয়েছে। শিক্ষিত তো বটেই, শিক্ষিতদেব মাধ্যমে ব্যাপকতব মুসলিম সমাজ তাতে আলোড়িত হযেছে। সে ইতিহাসে যাচ্ছি নে। হিন্দু সম্প্রদায ও মুসলমান সম্প্রদায বলে আমরা অনেক সময়ে কথা বলি। 'সম্প্রদায়' কথাটাব মধ্যে কোনো নিন্দামূলক ভাব থাকাব কাবণ নেই। মানুষ গোত্র, ধর্ম, সম্প্রদায, দেশ, ভাষা ও অর্থনৈতিক শ্রেণী—বিভিন্নভাবে বিভক্ত। কিংবা মানুষকে এভাবে বিভক্ত বলে বিবেচনা করা যায। মানুষেব সমাজের বিকাশ, এই ক্ষুদ্রকায পৃথিবীতেও সর্বত্র সমান এবং সমতালে হয় নি। ভাবতীয উপমহাদেশেব ক্ষেত্রে ধর্ম হিসেবে বিভিন্ন ধর্মেব অস্তিত্ব থাকলেও হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম এবং তাদের বিশ্বাসীদের মধ্যকাব সম্পর্ক ঊনবিংশ থেকে বিংশ শতকের মধ্যভাগে নানা কার্যকারণে রাজনৈতিক তাৎপর্য গ্রহণ কবে। হিন্দু–মুসলমান কথা দু'টির মধ্যে একটি মানসিক আবেগের ভাব ক্রমান্বযে আপসহীনভাবে সঞ্চারিত হতে থাকে। বিশেষ কবে মুসলমান ধর্ম বিশ্বাসীদের উচ্চ শ্রেণীগত শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দ উনিশ এবং বিশের শতকে নিজেদেবকে যেমন মুসলমান সম্প্রদায়ের পরিচালনকারী বলে প্রচাব করতে লাগলেন, তেমনি মুসলমানরা একই ভাবতীয় উপমহাদেশেব হিন্দুধর্ম বিশ্বাসীদের চাইতে 'একেবারে ভিন্ন' এরূপ ব্যাখ্যা–বক্তব্যের ওপব জোব দিতে থাকেন। যে ভাবতীয় উপমহাদেশে, নানা ধর্ম, ভাষা ও জাতিব অবস্থান, বিদেশী শক্তিব থেকে স্বাধীনতা লাভের ক্ষেত্রে তাব অপব কোন সমাধানেব স্থানে মুসলমানদেব জন্য ভিন্ন বাষ্ট্র স্থাপন, তথা ভারত বিভাগেব ওপবই এই নেতৃবৃন্দ তথা মুসলিম লীগ জোব দিতে লাগলেন। এখান থেকেই মুসলিম লীগের আন্দোলনটি 'সাম্প্রদায়িক'। এই আখ্যা পাকিস্তান আন্দোলন ধারার বাইরেব সামাজিক–সাংস্কৃতিক–রাজনৈতিক মহলে উচ্চারিত হতে থাকে। তবু সেদিন সাম্প্রদায়িক বলেও যেমন পাকিস্তান আন্দোলনকে বাতিল করে দেয়া দেশের বৃহত্তর দল এবং জনসমষ্টির পক্ষে সম্ভব হয় নি (তার কার্যকারণের বিশ্লেষণের কথা ভিন্ন), তেমনি কেবল যে অমুসলমানরাই পাকিস্তান আন্দোলনকে ভাবতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক–সামাজিক বিকাশের সুস্থ কোনো পথ নির্দেশক নয় বলে বিবেচনা করেছেন, তাই নয়, মুসলিম সমাজের মধ্যেও, বিশেষ করে তার বিকাশমান শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে এমন একটি অংশ চল্লিশের দশকে উদ্ভূত হচ্ছিল, যে অংশটি পাকিস্তান আন্দোলনের শক্তিকে অস্বীকার না করলেও তার সাম্প্রদায়িক আবেগে নিজেরা মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়তে চায় নি।

মুসলিম সমাজের শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে এবং ক্রমাধিক সংখ্যায় মুসলিম সমাজের মধ্যস্তর থেকে আগত তরুণদের আধুনিক শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে ঢাকা শহর তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েব গুরুত্বের কথা আমি উল্লেখ করছি। কলকাতার সেইকালের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক পবিবেশ সম্পর্কে আমার নিজের কোনো গভীর ধাবণা নেই। কিন্তু ঢাকার সঙ্গে ১৯৪০ সাল থেকেই আমার একটি সচেতন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো। সে জন্যই চল্লিশের দশকেব ঢাকাব জন্য আমার মমতাবোধ, পেছন ফিবে তাকানোর একটা গভীর আগ্রহ। কিন্তু ব্যাপারটাব মধ্যে কেবল ব্যক্তিগত আবেগেব দিকই নেই। পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব-পাকিস্তানেব বাজধানী হওযার পর থেকে পূর্ববঙ্গে সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক যেসব ঘটনা সংঘটিত হযেছে, আবো নির্দিষ্ট কবে বললে, পঞ্চাশেব দশকে পূর্ববঙ্গে যে গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আন্দোলনেব ক্রমপ্রকাশ ও বিকাশ দেখা গেছে, তাব ভিত্তি চল্লিশেব দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডলে মুসলিম শিক্ষিত মধ্যবিত্তেব মধ্যে উপ্ত হযেছিলো। এবকম ভিত্তির কথা যখন বলা হয, তখন এটা স্বাভাবিক যে, এব মূলে কোনো একটি ব্যক্তি বা কাবণকে উল্লেখ কবা হয না। চল্লিশের দশকের ঢাকায পঞ্চাশেব দশকেব গণতান্ত্রিক বিকাশেব ভিত্তি স্থাপিত হযেছিলো বলার অর্থ, চল্লিশের দশকের ঢাকা তথা মুসলিম শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আবাসক্ষেত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযে এমন একটা পবিবেশ ছিল যাব মধ্যে মানবতাবাদী, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি অতিক্রম কবে যায এমন দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। সবকিছু মিলিযে বলা চলে, একটি মানবতাবাদী, গণতন্ত্রী, বামপন্থী পরিবেশ। কিন্তু যদি প্রশ্ন কবা হয, এটা কি সেদিনকাব প্রধান ধাবা ছিলো, তবে তার জবাব অবশ্যই এই হবে যে, না, এটা নিশ্চযই সেদিনকাব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের মুসলিম ছাত্রদেব মধ্যে প্রধান ধারা ছিলো না। কিন্তু তাব বীজ যে ছিলো, এটা তো গুরুত্বহীন নয। বীজ বাদে বৃক্ষেব বিকাশ সম্ভব নয়। এটা কোনো রূপক অর্থে নয়, একেবাবে বস্তুগত অর্থেই সামাজিক-সাংস্কৃতিক-বাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে সত্য। অবশ্য চল্লিশের দশকে দুর্বল হলেও, সেদিনও দৃশ্যমান এই বীজটিবও কিছু পূর্বভিত্তি নিশ্চয়ই ছিলো। আমাব নিজেব চিন্তায়, এই পূর্বভিত্তিটি স্থাপন কবেছিলেন অধিকতব প্রতিকূল অবস্থাব মধ্যে বিশ ও ত্রিশের দশকেব ঢাকাব মুসলিম সাহিত্য সমাজ, তাব মুখপত্র 'শিখা' এবং তার মুখ্য পাত্রবৃন্দ, যথা কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হোসেন, কাজী মোতাহার হোসেন, বিশ্ববিদ্যালযের তখনকাব তরুণ কিংবা প্রৌঢ় শিক্ষক ও অধ্যাপকবৃন্দ। এই পর্যায় সম্পর্কে কিছু পবিমাণ আলাপ-আলোচনা আমাদের সাহিত্য-আলোচকবৃন্দ করেছেন। যে চল্লিশের দশকের ঢাকার কথা আমি বলতে চাই সে চল্লিশের দশকের ঢাকা অবশ্যই তার পূর্বসূরি ত্রিশেব দশকের ঢাকার উত্তরসূরি।

বরিশালের 'পোলা'র ঢাকা আগমন

কিন্তু আমার ব্যক্তিগত জবানবন্দিতে যদি চল্লিশেব দশকের ঢাকার কিছু স্মৃতিচারণ করতে হয তাহলে আমাকে তো প্রথমে ঢাকায় আসতে হয়।

আমি নিজে ঢাকা এসেছিলাম চল্লিশের দশকের ঠিক সূচনাতেই। ১৯৪০ সালে বরিশাল জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে পাস করার অব্যবহিত পরেই।

আমি এসেছিলাম বলাটা ঠিক নয়। বরিশালের একটি কিশোর। বরিশালের ভাষায় বরিশালের একটি 'পোলা' এসেছিল ঢাকায়, ঢাকা কলেজে পড়তে। ম্যাট্রিক পাস করার পর অবশ্যই সে বরিশালের বিএম কলেজেও পড়তে পারত। তার সহপাঠী অনেকে তাই করেছে। অনেকে কলকাতা গিয়েছে। বরিশাল থেকে তখন সকাল-বিকাল এক্সপ্রেস আর মেইল, বিলাতি আর.এস.এন—আই.জি.এন কোম্পানির বিরাট বিরাট চাকাওয়ালা স্টিমার, যেমন 'ফ্লোরিকান', 'নাগা', 'গারো' কলকাতা রওনা হয়ে যেতো। খুলনা গিয়ে যাত্রীরা ঘাটে দাঁড়ানো রেলগাড়িতে উঠত এবং তাতে চড়ে সোজা কলকাতা। কিন্তু বরিশালের এই 'পোলাটি' কেন কলকাতা যায় নি, সেটাও আজ খোঁজ করে বার করার ব্যাপার।

এর একটি বোধগম্য কারণ হচ্ছে আর্থিক। কলকাতা গেলে খরচ বেশি পড়বে। ঢাকায় তত পড়বে না। কিন্তু তাছাড়াও আর একটা কারণ ছিল এই যে, কিশোরের বড় ভাইও উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতা না গিযে এসেছিলেন ঢাকাতেই, সেই বিশের দশকের শেষ দিকে, ১৯২৭ সালে। বড় ভাই মঞ্জে আলী সরদার-এর সঙ্গে আলাপ করে জেনেছি তাঁরও বরিশালের বিএম কলেজ থেকে বিএ পাস করে এমএ পড়ার জন্য ঢাকায় আসবার কারণের মধ্যে প্রধান ছিল আর্থিক বিবেচনা। ঢাকায় হল বা হোস্টেলে অল্প খরচে থাকা যাবে। এ বিবেচনা একটি গরিব কৃষক পরিবারের সন্তানের উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য দূরে যাওয়ার ক্ষেত্রে কম গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা নয়।

কিন্তু আজ এতো বছর পর সেই ছেলেটির ঢাকা আসবার ছবিটির দিকে তাকাতে গিয়ে যে কথা মনে পড়ে, সেটা আর্থিক সেই বিবেচনার ব্যাপার নয়। মনে ভেসে ওঠে একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চকর ছবি। খাল-বিল-বরিশালের ছেলে হলেও এমন বড় 'জাহাজে' চড়ে আর সে নিজের জেলার বাইরে কখনো যায় নি। রওনা করলো যখন সে ঢাকার পথে, তখন কোনো আত্মীয়জন আসে নি সেই পনের বছরের কিশোরের সঙ্গে। ঢাকাতে কোনো আত্মীযজন থাকার মত অবস্থাই তার ছিলো না। তার বড় ভাই-ই তার মুরুব্বি আর অভিভাবক। তিনি তখন সরকারি চাকুরে। বরিশালেরই কোনো থানা শহর বা বন্দরে। তিনি তাঁর ছোট ভাইটিকে তাঁর পরিচিত ঢাকায় পাঠরত বয়স্ক কোনো ছাত্রের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি হবার জন্য।

ঝমঝম করে বিরাট জাহাজ (সেদিনকার সেই কিশোর এর চাইতে বড় জাহাজ যথার্থই দেখে নি) বরিশাল থেকে ছেড়ে বিরাট বিরাট নদীর বুকে ঢেউ তুলে, চাঁদপুর বন্দর এবং মুন্সিগঞ্জে নোঙর করে, নারায়ণগঞ্জের নদীতে ঢুকে সেখানে কিছুক্ষণ থেমে তারপর আবার মীরকাদিম হয়ে সন্ধ্যার পরে যখন বুড়িগঙ্গায় ঢুকল, তখন কিশোরের চোখে পড়ল, দূরের রাস্তা দিয়ে আরো দ্রুতবেগে এক-চোখো কি একটা যেন দৌড়ে যাচ্ছে ঢাকার দিকে। সঙ্গী বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্র কিশোরকে তার বিস্ময় আর ভয়ের ঘোর কাটিয়ে দেবার জন্য নিশ্চয়ই বলেছিল: 'ঐ দেখ রেলগাড়ি যায়।'

রেলগাড়ি! অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল কিশোরটি দূরে অদৃশ্যপ্রায় সেই অজানা কিন্তু নামেশোনা ছুটন্ত লৌহদানবের দিকে। 'বলত, কোন্ জেলায় রেল যায় নি ?'—এ প্রশ্ন কেবল সেদিনের নয়, আজকের দিনের কিশোরের কাছেও সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষার প্রশ্ন আর তার জবাব আজও এক : সে জেলা বরিশাল।

সে যাই হোক, শান্ত বুড়িগঙ্গায় ঢেউ তুলে জাহাজ এসে ভিড়েছিলো বাদামতলি ঘাটে। সেদিনকার বাদামতলি ঘাট বা তার লাগোয়া সদবঘাটেব 'বাকল্যান্ড বান্দ' এলাকা আজকেব মত সরগরম ছিলো না। বুড়িগঙ্গাও এত কৃশকায়া ছিলো না। ছিলো বেশ বড়। বরিশালের নদীর মতো না হলেও বুড়িগঙ্গা দিয়ে কোম্পানির বড় জাহাজগুলোর চলাচলে, ভিড়তে, কিংবা ছাড়তে কোনো অসুবিধে হতো না। কিন্তু সেকালেব বাদামতলি ঘাটে জাহাজ ভেড়া এবং ছাড়াব সঙ্গে যে বিষয়টি কিশোবেব মনে জড়িত ছিলো সে হচ্ছে তাব আর একটা বিস্ময়। কোম্পানির যাত্রীজাহাজ ঘাটেব সীমানায় পৌছুলে লম্বা ভোঁ দেয়: 'ডবল সিটি মাবে', যাত্রীরা বোঝে তাদের গন্তব্য প্রায় এসে গেছে। ছাড়ার সময়েও বাবংবাব সেই একই ভোঁ। কিন্তু ঢাকার বাদামতলিতে রাতের অন্ধকাবে জাহাজ ভিড়তো যেন চোবেব মতো, ছাড়তোও প্রায় চোবের মতোই। ইঞ্জিনেব আওয়াজ যেনো ভেড়ার আর ছাড়ার সময়ে কম হতো, অন্য জায়গার চাইতে। কিন্তু কেনো ? বহস্যটা কিশোরেব ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতায বেশিদিন বহস্য হয়ে বইল না। বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধুরা বলল : 'আবে জানো না, বাদামতলি ঘাটেব কাছেই ঢাকাব নওযাবেব বাড়ি, 'আহসান মঞ্জিল'। নওয়াবের হুকুম, সন্ধ্যার পবে স্টিমার আসা আব যাওয়ার সময় কোনো 'হুইসল' দিতে পাববে না— নওয়াবেব তাতে 'ঘুমেব ব্যাঘাত হবে।' নওয়াবেব হুকুম কিনা তা জানা নেই। (সেকালে ঢাকার নওযাব পবিবার ঢাকার সমাজ জীবনের অন্যতম প্রধান বলেই বিবেচিত হতো।) কিন্তু সেকালে বাদামতলি ঘাটে জাহাজ নোঙর কবা, নোঙর উঠিয়ে ছেড়ে যাওয়ার সময়ে যে ভোঁ দিত না, একথা সত্য।

প্রৌঢ়ের কৈশোর স্মৃতি

অপবে বৃদ্ধ বললে তেমন উপাদেয় বোধ হয় না। প্রৌঢ় বরঞ্চ চলে। পঁযষট্টি প্লাসের প্রৌঢ়। তারই কিশোরকালেব কিছু স্মৃতি কথা।

সাজিয়েগুছিয়ে বলার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। স্মৃতির পটে যখন যা ভেসে ওঠে, তাকেই আবার তলিয়ে যাবার আগে টেনে তোলার চেষ্টা কবা ভাল। এ কোনো সাহিত্যকর্ম নয়। কাজেই সাহিত্যিক সৌকর্যেব জন্য উদ্বিগ্ন হওয়াও নিরর্থক।

১৯৪০ সনের ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর ববিশালের সেই কিশোর পোলাটি ঢাকা এসেছিলো। 'বিদেশ' ঢাকায়। সেদিন ঢাকায় আসার জন্য জাহাজে চড়ে জাহাজ ছাড়ার সময়ে সে ফেলে আসা বরিশাল শহরের দিকে তাকায় নি। তাকিয়েছিলো অজানা ঢাকা দেখা যায় কি না, কখন দেখা যাবে, তার দিকে। সেদিন ছিলো অজানার আকর্ষণ। 'লিউর

অব দি আননোন্।' কিন্তু আজ স্মৃতির বাহনে চড়ে সেই ৪০ সালে ফিরে গিয়ে অত সহজে বরিশাল ছেড়ে আসতে ইচ্ছে হচ্ছে না। এখন 'লিউর অব দি আননোন্' কোথায় ? এখন জিজ্ঞাসা সেদিনেব ফেলে আসা বরিশালকে কি জানা শেষ হযেছিলো ?

সেই বেল ইসলামিয়া হোস্টেল, পাশের এ.কে. স্কুলের খাবার ঘর, নামাজের সময়ে রোলকল্, হোস্টেলে কড়া সুপার সাহেব : টুপি মাথায় দিয়ে খেতে বসতে হবে। তা না হলে খাওযাব টেবিল থেকে সুপার এসে তুলে দেবেন। রাত দশটা বাজতেই হোস্টেলের লাইট নিবিযে দেওয়ার হুকুম। আর তারপরেই অন্ধকাবে ৩৯-৪০ সালে সেই কিশোবটির গা ঢাকা দিযে খান কয়েক বই হাতে নিয়ে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের গা ঘেঁষে, লোহার রেলিং টপকে ছবির মতো সুন্দর স্টিমার ঘাটের বুকিং অফিসের 'টাইম-বোর্ড'টাব নিচে বসে বই পড়া। আহা, যদি জানতাম, এমন জীবন আর ফিবে পাওয়া যাবে না, তাহলে ফেলে আসা কৈশোবের জীবনকে আবো গভীর কবে ভালবাসতাম! পূর্ণতবভাবে বাঁচতাম।

জেলা স্কুলেব হেডমাস্টার সিরাজউদ্দিন সাহেবের দস্তখত কবা আমাব ক্লাস টেনেব একটা প্রশংসাপত্র এখন পর্যন্ত সযত্নে বাখা আছে। সবল অথচ কম্পিত হাতের সেই সইটিব দিকে তাকালেই হেড স্যাবেব গৌববর্ণ দেহের ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এখনো ভাবতে ভয় লাগে : আপাতভাবে কি কড়া মেজাজের মানুষ। আব এমন কাঠামোর স্কুল-দালানও আমি আব কোথাও দেখি নি। সামনে-পেছনে বিবাট সিঁড়িওয়ালা একতলা দালান। মাঝখান দিযে লম্বা করিডোর। দু'পাশে ক্লাস ঘব। হেডমাস্টার সাহেব এই কবিডোব দিযে এ-মাথা থেকে ও-মাথা হেঁটে যেতেন। তাঁব পাযের আওয়াজেই সব ক্লাসরুম হিম-ঠাণ্ডা হযে যেতো।

কিন্তু শশধব স্যার ছিলেন কী সুন্দর হাসিখুশি মেজাজের শিক্ষক। খুব সম্ভব তিনি ছিলেন অঙ্কের শিক্ষক। আর অঙ্কে আমি আজীবনই কাঁচাব কাঁচাই রযে গেলাম।

ম্যাট্রিক পবীক্ষায অঙ্কের দিন অঙ্ক পবীক্ষা দিয়ে বেবিযেছি। কোনো রকম দিযেছি। একেবারে যে ফেল কবব, তা নয়। তবে কানেব পাশ দিযে যাওয়াব ব্যাপাব। তাই উদ্বেগের অন্ত ছিলো না। পবীক্ষা শেষ হতে শশধব স্যারই সহাস্যে এসে জিজ্ঞেস কবেছিলেন, কিরে পাশ করবি তো ? আমি সভযে এবং শঙ্কিতভাবে বলেছিলাম : পাশ কবব না স্যার ? চল্লিশ কিংবা পঞ্চাশও কি পাবো না ? স্যাব হেসে বলেছিলেন : ঘাবড়াসনে। আমি খাতা একবার দেখে দিয়েছি। পঞ্চাশের মতো তোব থেকে যাবে।

অঙ্কে এমন কাঁচা মানুষেব প্রৌঢ় বয়সে অঙ্কেব কিছু স্মবণে আসবাব কথা নয। তবু স্মৃতিতে সে যে উঠে এলো, সেটাই মজাব। আর মজাব ঘটনা বলেই মনে এলো।

ম্যাট্রিকেব আগে এ্যানুয়ালে, নাইন থেকে যখন টেনে উঠেছিলাম, তার ফলাফলেব ওপর যেদিন পুবস্কাব বিতরণের অনুষ্ঠান হযেছিলো, সেদিন আমাকে অঙ্কের ওপরও পুরস্কার দেওয়া হয়েছিলো। না, ফেল করার জন্য নয। বাংলাতে বোধ হয় নম্বর একটু ভালো উঠেছিলো আর অঙ্ক-বাংলার মিলিত নম্বরের একটা পুরস্কার ছিলো। আব তাতেই আমি এই দু'বিষয়ে পুরস্কার পেয়েছিলাম। কিন্তু আসলে এটাও মূল কারণ ছিলো না। মূল কারণ এ্যানুযালে তপনের পরীক্ষা না দেওয়া। তপন ছিলো ক্লাশের হিন্দু- মুসলমান সকলের মধ্যে

তুখোড় ছেলে। ওই-ই ফার্স্ট হতো। ওরই ন্যায্যত প্রাপ্য ছিল সব পুরস্কার। কিন্তু কোনো অসুখের জন্য বোধ হয় সেবার তপন এ্যানুয়াল দেয় নি। আর তাতেই খুলেছিলো আমার কপাল।

কিন্তু ব্যাপারটাতে আমার আনন্দ বা গর্ববোধ হওয়ার চাইতে কৌতুক জেগেছিলো বেশি। বেশ মজার মনে হয়েছিলো। তবে পুরস্কার হিসেবে দেওয়া ইংরেজি-বাংলা বই-এব বোঝায় তিনফুটি ছোট্ট কিশোরটিব কাঁধ যে ভরে গিয়েছিলো, সেটা সত্য। আব তাতেই দর্শকদেব মধ্য সে কী বাহবা!।

তাই বলে একেবারেই কি যোগ্য ছিলাম না ? মিলাদ হতো স্কুলে। সে উপলক্ষে হজবতের জীবনের ওপর রচনা প্রতিযোগিতা হতো। আব তাতে একবাব 'মানুষ হজবত মোহাম্মদ' শিরোনামেব আমাব লেখাটিকে প্রথম পুবস্কার দেওয়া হযেছিলো। এ পাওযাতে হযত তেমন ফাঁকি ছিলো না।

আসলে মোজাম্মেলের সামনে এই ভালো হওয়া, পুরস্কাব পাওয়া নিয়ে কোনো কথা বলারই উপায় ছিলো না। ইচ্ছা কবলে মোজাম্মেল আমাদেব অনেকেব চাইতেই ভালো ফল কবতে পাবতো। ক্লাস এইটে বৃত্তি নিযে নাইনে এসে ভর্তি হয়েছে ও। কালো ছিপছিপে গড়ন। চোখে-মুখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিব ছাপ। ওর চিন্তা ভালো ফলেব নয়, চিন্তা নিজের বিপ্লবী দল 'আব.এস.পি'র সাংগঠনিক প্রভাবে কোন্ ছেলেকে কীভাবে যোগাড় কবতে পাববে, সেটা। আর তাই আমাকে ঠাট্টা করে বলত : এই ভালো ছেলে! বই পড়া রাখো। এই লিফলেট ক'টা নিযে যাও। দেখো, একটু সাবধানে নিও। কেউ যেন জানে না। কালই ফেরত দিও। ওর কথাবার্তায সত্যি ভয় হতো। লাল কালিতে ছোট ছোট অক্ষরে ছাপা ইশতেহাব : বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে খতম কবে ভাবতবর্ষে শোষিত জনতার রাজ কাযেম করাব জঙ্গি আওয়াজ।

একদিন দিযেছিলো পড়তে একটা বই। তিনশ' পৃষ্ঠাব ওপরে তাব আকাব। বাংলায় বলেছিলো : প্রোসক্রাইব্‌ড্ বই; বেআইনি বই। খবরদার, কেউ যেন টের না পায়। একবাতে শেষ করতে হবে। আমি তাই করেছিলাম। কোনো কষ্ট কবতে হয নি। একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চ আমাকে টেনে নিযে যাচ্ছিল। কেবল যে নিষিদ্ধ বই পাঠের আকর্ষণ, তাই নয়। গ্রন্থের বিষয়বস্তুও। প্রবন্ধ নয। গল্প। বিপ্লবী উপন্যাস।

নায়ক-নাযিকারা সমিতি কবে। শ্রমিকদেব মধ্যে সভা করে। ভারতবর্ষের বাইরে। বেঙ্গুনে। মান্দালযে। কিন্তু ভারতেব স্বাধীনতা তাদের লক্ষ্য। নায়ককে ভালবাসে নায়িকা। কিন্তু নায়ক দুর্বল। পুলিশের আতঙ্কে সে দলের গোপন কথা প্রকাশ করে দেয়। এই অপরাধে গুপ্ত দলের গোপন বিচার বসে। রায় হয় : এই গুরুতর অপরাধে তাকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হবে। কিন্তু সে দণ্ড কার্যকর হতে পারে না। নায়িকা তার প্রেমিকেব দণ্ডে বিমূঢ়। কিন্তু তাকে অভয় দেয সব্যসাচী। দলের বিপ্লবী অধিনায়ক। রহস্যপুরুষ। সব্যসাচী বলেন : ভয় পাসনে বোন, ভারতী। অপূর্বর কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু অপূর্ব বিপ্লবীদলের যোগ্য নয়। ওকে তুই এই বিপদের মধ্যে আনিসনে ...।

আজ জানি এ কাহিনী হচ্ছে 'পথের দাবী'র কাহিনী। বই-এর নাম 'পথের দাবী'।

লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু এই বই তখন বৃটিশ সরকারের ঘোষণায় নিষিদ্ধ আর বিপজ্জনক বই। এ বই কারুর হাতে পেলে অমনি তার গ্রেপ্তারের আশঙ্কা। সশ্রম কারাদণ্ডের ভয। আব তাই সে রাতে বইটার পুরোটা পড়েও বুঝতে পারি নি : কি নাম এ বইয়ের। বইয়ের পাতার মাথায় মুদ্রিত হয়েছিলো যেখানে যেখানে 'পথের দাবী' নামটি, সবখান থেকেই সেটাকে কেটে ফেলে আপাত নির্দোষ করা হয়েছিলো 'পথেব দাবী'কে। 'পথের দাবী'হীন 'পথের দাবী'কে।

মোজাম্মেলের এই ছিল কাববাব। তাই ওর ধমকে ক্লাসে ভালো ফল কবেছি বা অনেক বই পুবস্কার পেয়েছি, একথা বলাব সাহসই হতো না।

এই বই পড়ার স্মৃতি যেমন মনে গেঁথে রয়েছে, তেমনি মজার স্মৃতি হিসেবে গেঁথে আছে বেল ইসলামিয়া হোস্টেলে কম্পালসরি নামাজের বোলকলের স্মৃতি।

এখন আর বেল ইসলামিযাব সেই পুরনো মর্যাদা নেই। তার দেওয়ালেও দেখলাম, আজকাল আর চুনকাম হয না। অথচ সেদিন শহবের 'বি আই' হোস্টেল বা বেল ইসলামিযা হোস্টেল ছিল জেলা স্কুল আর এ.কে স্কুলেব ছাত্রদের ছাত্রাবাস। কোনো ইংবেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নামে প্রতিষ্ঠিত হোস্টেল।

এ.কে স্কুলের মৌলবী, দীর্ঘদেহী, শ্মশ্রুমণ্ডিত সুলতান সাহেব তাব সুপাবিনটেন্ডেন্ট। তাঁব গলাব আওয়াজ আর দীর্ঘ চেহাবার সামনে নাইন–টেনের বড় সাইজের ছেলেরাও কুঁকড়ে যেতো। তাঁর বেওয়াজ ছিলো, মগরেবেব আব এশাব নামাজে বোর্ডিং–এব প্রত্যেক ছাত্রকে হাজির থাকতে হবে। নামাজেব জমাত হবে বোর্ডিং–এর টানা বাবান্দায়। আব সুপাবিনটেন্ডেন্ট নিজে তার ইমামতি করবেন। মোনাজাত শেষে বেজিস্টার ধরে রোলকল। রোলকলেব জবাবে 'লাব্বাযেক' বলতে হবে। 'লাব্বাযেক' মানে হাজির।

কিন্তু সন্ধ্যাব পব ছাত্রদেব দুষ্টুমি যে বাড়তে থাকতো, সুলতান সাহেব সেটা বুঝতে পাবতেন। কেউ কেউ নামাজে উপস্থিত হতো না। উপস্থিত না হলে ক্লাস সেভেন থেকে টেন পর্যন্ত 'ওযাক্‌ত' প্রতি জবিমানা ছিল, যতদূর মনে পড়ে, এক আনা। আব ক্লাস সিক্স পর্যন্ত বেত। আমি সাহস করে 'লাব্বাযেক' বলি নি বা জামাতে অনুপস্থিত রয়েছি, এমন কথা মনে করতে পারছি নে। কিন্তু সহপাঠী আমিনুলকে দেখতাম বেপবোযা। হাসি হাসি মুখ। কিন্তু নামাজে, বিশেষ কবে এশাব নামাজে সে হাজির হতো না। সুলতান সাহেব এব কৈফিয়ত তলব কবতেন। সুপারিনটেন্ডেন্টকে আমবা 'স্যার' বলতাম না। বলতে হতো 'হুজুব'। আমিনুলকে তলব করলে আমিনুল হাসিমুখে বলত : হুজুব, আমি তো বলেছি. আমার জরিমানাটা আগাম নিযে নিন ...।

সুলতান সাহেব আজ আর বেঁচে নেই। কিন্তু শুনেছি, আমি বরিশাল থেকে আসার পরেও তিনি আমাকে স্মবণে বেখেছিলেন, তাঁর আত্মীয়জন আর অন্য ছাত্রদের কাছেও আমার কথা বলেছিলেন।

এই বরিশালেই সেই '৩৮ সনে এসেছিলেন ছবির মতো দেখতে সুন্দর, সুভাষচন্দ্র বসু। বক্তৃতা কবেছিলেন বি.এম স্কুলের উল্টো দিকের বার একাডেমির মাঠে। এসেছিলেন নিশ্চয়ই। তা না হলে বার একাডেমির মাঠের পাশ দিয়ে এরপব যখনই হেঁটেছি. তখুনি

সুভাষ বসুব চেহারা আমার মনের চোখে কেনো ভেসে উঠেছে বারংবাব! আজ হয়ত সেই বার একাডেমিও নিশ্চিহ্ন। বরিশাল শহরে যতগুলো হাইস্কুল ছিল, এতগুলো হাইস্কুল খুব কম জেলা শহরেই দেখা যেত।

এমনি জানা-অজানা নানা উপাদান। নানা উপাদান দিয়ে গঠিত হয়-যে কোনো পদার্থ। একজন কিশোরও একটা পদার্থ। চারদিকের আলো-হাওয়া, পানি, মানুষজন, দয়া-মায়া, আঘাত, স্নেহ, সব নিয়ে যে পরিবেশ তারই মিলিত উপাদানের ফসল সে। এমনি করেই তার বৃদ্ধিপ্রাপ্তি। তারপরে একদিন আবার সে যৌগিকের বিশ্লিষ্ট উপাদানে পর্যবসিত হয়।

যেমন ছিলো তেমনভাবে হযত নয়। নতুনভাবে নতুন উপাদানের সৃষ্টি করে পুরনো উপাদান তার ভূমিকা পালন করে। তার কতোখানি সচেতন, কতোখানি অচেতন : সে অনেক তত্ত্বেব কথা। সে তত্ত্ব থাক। কিন্তু কোনো এক সময়ে যদি বসতেই হয় কোন্ উপাদান দিযে তৈরি হযেছে একটা জীবন, তাব হিসেব নিতে, তখন কোনো উপাদানকেই হিসেবের বাইবে বাখবার উপায থাকে না। কাউকেই বাইরে রাখা উচিত নয়। অবশ্য সব উপাদানকে নির্দিষ্ট করাও সহজ নয়।

অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর স্মৃতিচারণ

চল্লিশের দশকেব ঢাকার সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক পরিবেশের কোনো বেখাচিত্র আমার একার পক্ষে তৈরি করা আদৌ সম্ভব নয়। আমি কেবল এর বৈশিষ্ট্য, একে জানবার প্রযোজন আর এ-বিষয়ে আমাব আগ্রহের কথা উল্লেখ করেছি।

ব্যক্তিগত এই আগ্রহের কথা প্রখ্যাত সাংবাদিক-সাহিত্যিক সৈয়দ নুরুদ্দিনকে আমি বলেছিলাম। কবি সানাউল হকও এই সময়কার ছাত্র। আমার অগ্রবর্তী। তাঁর সঙ্গেও এ সম্পর্কে আলাপের প্রয়োজন রয়েছে। 'সংবাদ'-এর এককালীন সম্পাদক খায়রুল কবির এবং তার বর্তমান সম্পাদক আহমদুল কবির এঁবা দু'জনও আমার অগ্রবর্তী। চল্লিশের দশকের ঢাকাব কাহিনী লেখাব অধিকতর উপযুক্ত পাত্র এঁরা। ঢাকা শহবের না হলেও ঢাকা জেলার এঁবা অধিবাসী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, চল্লিশেব দশকেই। এবং বুদ্ধিবৃত্তি-গতভাবে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এঁরা এঁদের অধ্যয়নকাল থেকেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এসেছেন। চল্লিশের দশকের ঢাকার অন্তরঙ্গ পরিচয় এরাঁই জানেন। এ.কে. নাজমুল করিম আজ প্রয়াত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন তিনি ১৯৪১ থেকে '৪৫ সাল পর্যন্ত। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের পর সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। সমাজতাত্ত্বিক একটা দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাঁর। কলেজে পড়ার সময় থেকেই দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত না হলেও, এ সম্পর্কে কৌতূহলী মন ছিল তাঁর। তাঁর সহপাঠী হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছাত্র সংগঠন 'ছাত্র ফেডারেশন'-এর কর্মী। এঁদের একজন ছিলেন ববি

গুহ। রবি গুহ ছিলেন সর্বদা হাসিমুখ, আলাপপ্রিয়, সমাজতন্ত্র-ব্যাখ্যাকারী এবং ছাত্র-শিক্ষক মহলে খুব সাদরে গৃহীত ছাত্রকর্মী। মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে আমার অগ্রজদের কথা স্মরণ করতেই মনে এল নাজমুল করিমের নাম। নাজমুল করিম যে সমাজতন্ত্রে দ্বিধাহীনভাবে বিশ্বাস করতেন, তা নয়। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে তাঁর ছিলো বিশেষ কৌতূহল। চল্লিশের সনে না হলেও বিয়াল্লিশ সনের দিকে ঢাকার কমিউনিস্ট কর্মীরা ছাত্রদের মধ্যে বেশ সক্রিয় হয়ে উঠছিলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সোভিযেত রাশিয়া হিটলারের ফ্যাসিস্ট বাহিনীর হাতে আক্রান্ত হওয়ার পরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যুদ্ধ সম্পর্কে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী যে নীতি গ্রহণ করেছিলো, তাতে কমিউনিস্ট পার্টিকে ভারত সরকার আর নিষিদ্ধ রাখা আবশ্যক মনে করে নি। ভারতেব কমিউনিস্ট পার্টি জার্মানি-ইতালি-জাপান মিলে যে আন্তর্জাতিক ফ্যাসিস্ট অক্ষশক্তি তৈরি হয়েছিলো তাব বিরুদ্ধে সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং শক্তির ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের নীতি ঘোষণা করেছিলো। এ নীতির ব্যাপারে ভারতের কংগ্রেস এবং কংগ্রেসেব ভেতরে কিংবা বাইরে ফরোয়ার্ড ব্লক, আর.এস.পি বা বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক পার্টি প্রভৃতির বিরোধিতা ছিলো। ফরোযার্ড ব্লকের প্রখ্যাত নেতা সুভাষচন্দ্র বসু সে সময়ে বৃটিশ সরকারেব অন্তরীণ অবস্থা থেকে কৌশলে পালিযে বার্লিন হয়ে টোকিওতে গিয়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্য জাপানের সাহায্য লাভের চেষ্টা করেছিলেন। এর ফলে ভারতে যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাখ্যা অধিকতর জটিল রূপ গ্রহণ করে। ঢাকাতে কমিউনিস্ট কর্মীদের এই ফ্যাসিবাদ-বিরোধী নীতি হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে কংগ্রেস, ফবোয়ার্ড ব্লক এবং আব.এস.পি মহল থেকে তীব্র বিবোধিতার সম্মুখীন হয়। এর বিভিন্ন আত্মঘাতী প্রকাশ সংঘটিত হত হিন্দু ছাত্রদের হল ঢাকা হল, জগন্নাথ হল এবং হিন্দু মধ্যবিত্ত প্রধান তাঁতীবাজার, শাঁখারী বাজার, ওয়ারী ও নবাবপুর প্রভৃতি এলাকাব ছাত্র মধ্যবিত্ত কর্মীদের মধ্যে। এ-সব বিরোধ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে তেমন কোনো আলোড়ন বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো না। যুদ্ধের চরিত্রের ব্যাখ্যা-প্রতিব্যাখ্যা মুসলিম ছাত্রদের চিন্তা ও আলোচনার কোনো উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে যেটা উল্লেখযোগ্য তা হল এই যে, ঢাকা শহরের এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন হিন্দু ছাত্র এবং মধ্যবিত্ত অন্য কর্মীরা তাদেব নিজেদের সমাজে তীব্র বিরোধের সম্মুখীন হলেও মুসলিম ছাত্র, বিশেষ করে তার মধ্যকার উদার অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছাত্রদের কাছে বেশ সমাদর পেতে লাগল। এই ধারাতেই চল্লিশের দশকে, বিশেষ করে ৪২ থেকে ৪৫-৪৬ সালে ছাত্র ফেডারেশনের এবং ঢাকার প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের কর্মীদের সম্পর্ক তৈরি হয এই সময়কার মুসলিম ছাত্রদের সঙ্গে। এবং এদের মধ্যে আমার বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে যেমন ছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এ.কে. নাজমুল করিম, তেমনি বাংলার হেসামুদ্দিন আহমদ, ইংরেজির এ.কে.এম আহসান, কবীর চৌধুরী, অর্থনীতির সানাউল হক এরা। সৈয়দ নুরুদ্দিন আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন কিংবা একেবারে সহপাঠী, সেটাও হিসেব করার বিষয়। সৈয়দ নুরুদ্দিনের পাঠ্য বিষয় ছিল বোধ হয় ইতিহাস। বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে প্রয়াত মুজাফফর আহমদ চৌধুরীর নামও স্মরণীয়। তিনি ছিলেন এ.কে. নাজমুল করিমেরও

অগ্রবর্তী। কিন্তু তাঁর সঙ্গেও কমিউনিস্ট কর্মীদের একটা পরিচয় এবং হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিলো।

অধ্যাপক কবীর চৌধুরী চল্লিশের দশকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। ইংরেজিতে অনার্স এবং এম.এ. উভয় পরীক্ষাতে তিনি প্রথম শ্রেণী লাভ করেছিলেন। অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর ছোট ভাই মুনীর চৌধুরী। এককালে যখন জঙ্গি এবং বামপন্থী রাজনীতিতে মুসলিম মধ্যবিত্ত কোনো মেয়ে বা ছাত্রীর সক্রিয়তা একেবারে অচিন্তনীয় ছিল, বিশেষ করে ঢাকায়, তখন পাকিস্তানের গোড়ার দিকে কবীর চৌধুরীর ছোট বোন নাদেরা বেগমের রাজনৈতিক উৎসাহ এবং কর্ম ছাত্রছাত্রী মহলে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো।

অধ্যাপক কবীর চৌধুবীব একটি পাবিবারিক অন্তরঙ্গ নাম 'মানিক'। বয়োজ্যেষ্ঠ এবং অগ্রজপ্রতিম হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসেবে পড়বার সময় থেকে তাঁকে 'মানিক ভাই' বলে সম্বোধন করেছি। এই 'চল্লিশের দশকের' ঢাকাব কথা মনে করে সেদিন, ১৭ জুন'৮৩, তাঁর বাসায় গিয়ে বললাম, আপনি কিছু বলুন আমাকে, সেদিনের কথা যা মনে আছে।

কবীব চৌধুরী সহাস্যে বললেন : সেদিনের সঙ্গে আজকের কালের ব্যবধান তো কম নয়। ঘটনা এবং চরিত্রের স্মৃতিও তো প্রায় বিলুপ্ত।

আমি বললাম : আপনি কি ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়েই ঢাকা এসেছিলেন ?

কবীব চৌধুরী বললেন : না, আমি বেশ কিছু আগেই ঢাকা এসেছিলাম।

কবীর চৌধুবী ঢাকাতে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাস করেছেন ১৯৩৮ সালে। ঢাকা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেন ১৯৪০ সালে। তারপর আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযে। বাবা আবদুল হালিম চৌধুরী ছিলেন পদস্থ সরকারি কর্মচারি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেদিনকার ছবিটা স্মরণ করে কবীর চৌধুরী বললেন : ছাত্র সংখ্যা তো তখন কত কম! ধবো, সেই ১৯৪০-এর কথা। আমি অনার্স দিযেছিলাম ৪৩-এ। তখন আমবা মাত্র জনাবিশেক ছাত্র ইংরেজি ডিপার্টমেন্টে। মেয়ে মাত্র চারজন।

আমি বললাম : মেয়েদের মধ্যে মুসলমান ছাত্রী ছিল কি একটিও ?

মানিক ভাই বললেন : না, আমাদের ইংরেজিতে আদৌ নয়। কিন্তু বিজ্ঞানে ছিলেন মেহের, যাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়, পরবর্তীকালে।

দু'একটা কথা। খণ্ডচিত্র। আজ বেশি কিছু মনে পড়ে না। কেবল রমনা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের একান্ত বোমান্টিক পরিবেশ বাদে মনে পড়ার মতো হয়তো কিছু নেইও। তবু সেদিনকার পটভূমিতে তার একটি ভূমিকা ছিলো, যা পরবর্তীকালকে প্রভাবিত করেছে। এই প্রসঙ্গে কবীর চৌধুরী বললেন : সাম্প্রদায়িকতা চারদিকে বিস্তারিত হচ্ছিল, একথা সত্য। কিন্তু ১৯৪২-এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক কোনো ঘটনা ঘটেছে বলে আমাদের মনে পড়ে না।

'৪২ সনের শেষের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে একটা সংঘাত ঘটেছিলো। এর সূত্রপাত হয়েছিলো কার্জন হলে ছাত্রীদের একটা সাংস্কৃতিক

অনুষ্ঠানে সলিমুল্লাহ হলের কিছু ছাত্রের আচরণ নিয়ে, হিন্দু ছাত্রদের সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদের ফলে। পবের দিন এর বিস্তার ঘটে বিশ্ববিদ্যালযের আর্টস এবং অফিস বিল্ডিং অর্থাৎ এখনকার বর্তমানের মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল বিল্ডিং-এ। এ ভবনের দোতলার একদিকে ছিল ফজলুল হক হল অর্থাৎ মুসলিম ছাত্রদের বাসস্থান। ভবনের পুবদিকে ছিল ক্লাস ঘর, ছাত্রীদের কমনরুম আর শিক্ষকদেরও বসার ঘর। নিচে ছিল লাইব্রেরি। এই দিনের সংঘাতের সময়টাতেই নাজির আহমদ নামের একজন মুসলমান ছাত্র আকস্মিকভাবে ছুরিকাহত হন এবং ঐদিনই বিকেলে মিটফোর্ড হাসপাতালে তিনি মারা যান। আমি তখন মাত্র আই.এ. পরীক্ষা শেষে বিশ্ববিদ্যালযের দর্শন বিভাগে অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছি। নাজির আহমদের স্মরণে পরবর্তীকালে নাজিরাবাজার এলাকায় একটা পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেছিল মুসলিম ছাত্রবৃন্দ, যার নাম দেয়া হয়েছিলো শহীদ নাজিব লাইব্রেরি।

আমি কবীর চৌধুবী সাহেবকে জিগ্যেস কবলাম, কিন্তু এ ঘটনা সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের মধ্যকার সম্পর্কের বিষযে আপনার কি কিছু মনে পড়ে ?

কবীর চৌধুরী সাহেব বললেন : এ ঘটনাকে বলতে পাবি সেদিনকাব আবহাওয়ার একটি ব্যতিক্রম। কারণ আমাদের পাবস্পবিক সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কেবল হিন্দু ছাত্রদের সঙ্গে নয়। শিক্ষকদেব অধিকাংশ ছিলেন হিন্দু সমাজেব। আমাদের ইংরেজিতে ডঃ মাহমুদ হাসান ব্যতীত সেদিন কোনো মুসলমান অধ্যাপক ছিলেন না। আমার ছাত্র জীবনের শেষ দিকে, আমার মনে পড়ে, প্রয়াত ফজলুর রহমান সাহেব এসে ইংরেজি বিভাগে যোগ দিয়েছিলেন শিক্ষক হিসেবে। ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিলেন তিনি। পরে তিনি কিছু দিন পূর্ব পাকিস্তানের জনশিক্ষা পরিচালক অর্থাৎ ডি.পি.আই হয়েছিলেন। অকালে তিনি মারা গেছেন। হিন্দু শিক্ষকদের বাড়িতে গিযে আমাদের গল্প করা, ক্লাস করা—এটা ছিল সেদিনকার সেই পরিবেশেব স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। এই শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন যেমন মন্মথ ঘোষ, তেমনি পি.কে. গুহ, অমলেন্দু বোস আর এস.এন. রায়। এঁদের সঙ্গে আমাদের অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে, ছাত্রদের এত আন্তরিক, অমাযিক সম্পর্ক ছিলো যে, সে কথা আজ একেবারে অকল্পনীয় বলে মনে হয়। আমাদের সে সম্পর্কটা ছিলো, বলা চলে, একেবারে পারিবারিক ব্যাপার। অধ্যাপক জুনারকরের পবিবারের কথা মনে পড়ে। এই পরিবারের সঙ্গে মুনীরের সম্পর্ক তো পরবর্তীকালে খুব ঘনিষ্ঠ হয়েছিলো। এইসব শিক্ষক এত স্নেহপরায়ণ ছিলেন, ছাত্রদেব সঙ্গে এঁদের ব্যবহার এত খেলামেলা ছিলো যে, সে কথা ভাবতেই আজ মনে একটা আবেগের সঞ্চার হয়।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক কবীর চৌধুরী নিজের বিভাগের অন্য মুসলিম ছাত্রদের কথাও স্মরণ করলেন। বললেন, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেনও কৃতী ছাত্র ছিলেন। ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণী পেয়েছিলেন। কিন্তু আমার এক বছর কিংবা দু'বছর আগে। অবশ্য সৈয়দ আলী আহসান আমার সহপাঠী। আমাদের সময়ে অনার্সে প্রথম শ্রেণী আমি একাই পেয়েছিলাম। ১৯৪৩-এ। কিন্তু এম.এ.-তে আমরা প্রথম শ্রেণী লাভ করেছিলাম পাঁচজন। সে একটা রেকর্ড বিশেষ। এদের মধ্যে আমি ছাড়া ছিলেন আজিজুল হক (কিছুদিন আগে তিনি উপদেষ্টা তথা সরকারের মন্ত্রী ছিলেন)। আজিজুল হক নানা ক্ষেত্রে তখন থেকেই খুব

এ্যাকটিভ ছিলেন। খুব ভাল ডিবেট করতেন। তাছাড়া ছিলেন প্রণব গুহ। প্রণব গুহ পরে ভারতীয় ফরেন সার্ভিসে যোগ দেন এবং আমাদের এখানে একবার ডেপুটি হাই কমিশনার হিসেবেও এসেছিলেন। প্রণব ছিলেন অধ্যাপক মন্মথ ঘোষের আত্মীয়। মন্মথ বাবু ছিলেন আমাদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় কৃতী অধ্যাপক। ইংবেজির কৃতী ছাত্রদের স্মরণ কবে অধ্যাপক কবীর চৌধুরী এ.কে.এম আহসান সাহেবের কথাও বললেন। এ.কে.এম আহসান আমার কিছুটা পরবর্তী—হয়ত এক বছর পরে এসেছিলেন ইউনিভার্সিটিতে। কিন্তু সেদিনও সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনাতে তাঁর মধ্যে একটা তীব্র অতৃপ্তি আর জ্বালার আভাস থাকতো বলে আমার মনে পড়ে।

এই প্রসঙ্গে কবীর চৌধুবী সাহেব হঠাৎ তাঁব একজন সহপাঠীর নাম এবং তাঁর অকাল মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে বললেন : দেখ, হঠাৎ আমার রউফেব কথা মনে পড়ছে। কত মেধাবী ছাত্র ছিলো সে। ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হয়েছিলো। উত্তরবঙ্গে বোধ হয় বাড়ি ছিলো। যক্ষ্মাতে মারা গিয়েছিলো পবে, অকালে। কিন্তু ওর কথায় একটি ব্যাপার মনে পড়ে। বাংলা বিভাগে সম্ভবত উমা বলে একটি মেয়ে ছিল। এই মেয়েটির সঙ্গে বউফের বেশ একটি প্রণয় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো।

কথাটায় কিছুটা চমকিত হওয়ার ব্যাপার আছে। আজ আন্তঃসম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের প্রীতি-প্রণয়েব কথা, এমন কি আন্তঃসম্প্রদায়িক পরিণয়ও আর কোনো চমক সৃষ্টি করে না, সমাজে কোন তরঙ্গ তোলে না। কিন্তু একদিন, এবং সেই ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে এমন ঘটনা যেমন বিরল, তেমনি সাংঘাতিকই ছিলো। সমাজের মধ্যে এমন সম্পর্কের উপলক্ষে মর্মান্তিক বিরোধেরও সৃষ্টি হয়েছে, মারাত্মক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রউফের সঙ্গে উমার সম্পর্ক তেমন কোনো বিসম্বাদের সৃষ্টি কবেছিল বলে অধ্যাপক কবীর চৌধুবী স্মরণ করলেন না। বরঞ্চ সেই উমাকে স্মরণ করে বললেন: আজও রউফের প্রতি ওব আকর্ষণের প্রগাঢ়তা এবং সাহসের কথা মনে হলে আমার আনন্দ হয়। সেদিন হিন্দু-মুসলমান সব মেয়েরই বাইরে যাতায়াত ছিল সীমাবদ্ধ। মুসলমান মেয়েরা তো বদ্ধ ঘোড়ার গাড়িতে ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশ্যে পায়ে হেঁটে বা উন্মুক্ত গাড়িতে আসতেঁই পারত না। হিন্দু মেয়েদের সীমাবদ্ধতা অতখানি ছিলো না। কিন্তু উমা শাড়ি ছেড়ে সেলোয়ার-কামিজ আর বোরখা পরে মুসলমান মেয়ে সেজে রউফের সঙ্গে রমনার লেকেব কাছে এসে যে আলাপ করার সাহস দেখাত, সে চিত্রটি আমি ভুলতে পারি নি।

কাহিনীটি আমারও ভালো লাগে।

তারপরেই কবীর চৌধুরী সাহেব বললেন : তবে মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে সেইকালে সাম্প্রদায়িকতা তীব্রভাবে না থাকলেও একটা গোত্রবোধ যে ছিলো, সেটি আমি স্মরণ করতে পারি। এবং সেটি আজ বেশ কৌতুকজনক বোধ হয়।

আমি বললাম : এর কোনো ঘটনা আপনার স্মৃতিতে আসে?

কবীর চৌধুরী বললেন : সে এক মজার ঘটনা। আমাদের বিভাগের একটি খৃষ্টান ছাত্রীর সঙ্গে আমার কিছুটা পরিচয় এবং আলাপ-বিনিময় ছিল। আর সেকালে এটিও ছিলো চোখে

পড়ার বিষয়। এ নিয়েই চলত জল্পনা–কল্পনা। একদিন দেখলাম, সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের সহপাঠী কিছু ছাত্র এসে আমাকে খুব তমিজ করে বললেন : কবীর সাহেব, আপনার একটা ব্যাপারে আমরা খুব উদ্বিগ্ন। (সেকালে সহপাঠী সহপাঠীকে আপনি করে বলত, বিশেষ করে মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে এই রেওয়াজটি ছিল)। আমি বললাম, কি ব্যাপার? তাঁরা বললেন, এই যে আপনি আমাদের সমাজের বাইরের একটি মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করছেন, আপনার মত একটি মুসলমান ভালো ছাত্র, এটি ঠিক নয়।

ঘটনাটি বলে কবীর চৌধুরী বললেন, এতে তেমন কিছু ঘটে নি। তবে এই যে এঁরা বললেন, মুসলমান সমাজের আমি ভালো ছাত্র, অপর সমাজের কারুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে পারব না, এটিতে সেদিনকার মুসলিম ছাত্রদের একটি গোত্রবোধের প্রকাশ দেখা যায়।

ছাত্র–শিক্ষকদের রাজনীতি প্রসঙ্গে কবীর চৌধুরী সাহেব সেদিনেব কথা স্মরণ করে বললেন, মুনীর তো ঢাকা এসেছিল আমার পরে। আমি যখন আসি তখন মুনীর আলীগড়ে পড়ে। তবে ছাত্র–শিক্ষক সবার মধ্যে আমি সেদিন সাম্প্রদায়িকতার চাইতে মানবিক একটি বোধেরই প্রকাশ দেখতাম। কিন্তু সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে এবং শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে যে চল্লিশের দশকে ক্রমান্বয়ে প্রবেশ করছিলো এবং নানা মহল থেকে প্রবেশ করানো হচ্ছিল, সে কথাও ঠিক। কিন্তু এখানে যেটি উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে এই যে, এমন অবস্থায়ও মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে এমন কিছু ছাত্র ছিলো যারা সাম্প্রদায়িক হওয়ার চাইতে বামপন্থী রাজনীতির দিকে অধিক আকর্ষিত হয়েছে। নিজের কথা বলতে গিয়ে কবীর চৌধুরী বললেন, আমি সেদিন রাজনৈতিক চেতনার দিক থেকে কোন সক্রিয় কর্মী ছিলাম না। কিন্তু তবু সাহিত্য–সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেদিনকার ঢাকার বামপন্থী গুণীদের মধ্যে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত (কবি), রণেশ দাশগুপ্ত, অচ্যুত গোস্বামী—এঁরা যে ক্রমান্বয়ে আমাদের নিকটবর্তী হচ্ছিলেন এবং আমরা যে তাঁদের দিকে এগুচ্ছিলাম, এ ভাবটি তো আমার আজো মনে জাগে। কারণ, ৪৭–এর পূর্ববর্তী সময়ে একদিকে কংগ্রেস, আর একদিকে মুসলিম লীগ : এর বাইরে প্রগতিশীল বামপন্থী চিন্তাসম্পন্ন একটা ধারা ছিলো।

তারপর আমাকে জিগ্যেস করলেন : তোমার মনে পড়ে, রায় সাহেবের বাজারের সেই দালানটির কথা, যার তেতলাতেই বোধ হয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের অফিস ছিলো?

আমি বললাম, হ্যাঁ, সেই দালানটি এখনো আছে। যেখানে এখন একটা ওভারব্রিজ উঠেছে তার পূর্বপাড়েব গোড়াতে। এই গলিটির নাম জি. ঘোষের গলি। এবং এক সময়ে এই গলির মুখের প্রথম তেতলা বাড়িটির দোতলাতে ছিল প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের অফিস। পরে এর নিচের তলায় প্রগতিশীল বইপত্রের একটি দোকানও খোলা হয়েছিলো।

কবীর চৌধুরী বললেন, আমি খুব বেশি হয়ত যাতায়াত করি নি সেদিন প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সেই অফিসে। তবু আমার যোগ নিশ্চয়ই কিছুটা ছিল। তাই সেদিনের কথা মনে হতে আজ এই কবি-সাহিত্যিকদের কথা মনে ভেসে উঠছে।

কবীর চৌধুরী এম.এ পাস করে ('৪৫ সনে) সরকারি চাকরি গ্রহণ করেছিলেন। খাদ্য বিভাগে। মুসলিম ছাত্রদের ওপর বামপন্থী বা সমাজতন্ত্রী ভাবনার ক্রমপ্রসারের উল্লেখ

করতে গিয়ে তিনি বললেন, আমি তখন রাজবাড়িতে সরকারি চাকরি করি। রাজবাড়ির একটা ঘটনা কিন্তু এখনো মনে পড়ে।

আমি বললাম : কি ঘটনা, বলুন।

কবীর চৌধুরী বললেন, আমার মনে আছে, রেল শ্রমিকদের সংগঠক ব্যারিস্টার জ্যোতি বসু এসেছেন রাজবাড়িতে রেল শ্রমিকদের এক সম্মেলনে। জ্যোতি বসু তখনি কলকাতার প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা। রাজবাড়িতে তিনি বক্তৃতা করবেন শ্রমিকদের সম্মেলনে। আমার মত চাকরিজীবীর সেই সম্মেলনের কাছে যাওয়া সেদিন খুব নিরাপদ ব্যাপার ছিলো না। আমার মনে যেমন শঙ্কা ছিলো, তেমনি আকর্ষণও ছিলো। আমার এখনো কৌতুকের সঙ্গে মনে পড়ে যে, সেই আকর্ষণ এবং আশঙ্কা নিয়ে, আমি রাত্রির অন্ধকারে আমার এক বন্ধুকে সাথে করে গায়ে-মাথায় কাপড় জড়িয়ে প্রায় আত্মগোপনের ভাব নিয়ে সেদিন জ্যোতি বসুর বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম।

১৯.৬.৮৩

'চল্লিশের দশকের ঢাকা' নামের লেখাটি প্রসঙ্গে 'সংবাদ'-এর বিদগ্ধ পাঠকজনদের কাছ থেকে বেশ সাড়া পাওয়া গেছে। অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর সহপাঠী জনাব বোরহানউদ্দিন আহমদ ইতিমধ্যে 'সংবাদ'-এ তাঁর ছাত্রজীবনের কিছু প্রাসঙ্গিক ঘটনার স্মৃতিচারণ করেছেন। জনাব সিরাজুল ইসলামের একটি চিঠিও প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি রাজশাহীর নওগাঁ থেকে জনাব আতাউল হক সিদ্দিকী অধ্যাপক কবীর চৌধুরী তাঁর সহপাঠী কৃতী ছাত্র আবদুর রউফ এবং তার সঙ্গে এক হিন্দু সম্প্রদায়ের ছাত্রীর যে প্রণয়-প্রীতির কথা উল্লেখ করেছিলেন তার সূত্র ধরে একটি দীর্ঘ রচনা সংবাদ-এর সাহিত্য সম্পাদককে পাঠিয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমাকেও তিনি এ সম্পর্কে জানিয়েছেন। তাঁর এই লেখাটিতে তিনি উল্লিখিত তরুণ ছাত্র আবদুর রউফের শিক্ষাগত জীবন এবং তার সঙ্গে এক হিন্দু তরুণীর প্রণয়ের বিষয়টিকে বিশদভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। জনাব আতাউল হক সিদ্দিকী অকাল প্রয়াত রউফের ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে এ সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে তিনি তাঁর রচনাটি তৈরি করেছেন। জনাব সিদ্দিকী বলেছেন, রউফের বাড়িও ছিল নওগাঁতে।

তিনি রউফের ছাত্র জীবনের কৃতিত্বের অধিকতর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন : '১৯৩৮ সনে ঢাকা সেন্ট গ্রেগরিজ স্কুল থেকে রউফ ঢাকা বোর্ডের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন' এবং বাংলাতেও তিনি সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে 'পার্বতীচরণ মেডাল' নামে সাধারণ মেধার স্বর্ণপদকের অতিরিক্ত আর একটি স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন এবং 'তখনকার দিনে শিক্ষাদীক্ষায় পশ্চাদ্‌পদ বাংলার মুসলমান সমাজের মধ্য থেকে রউফের মত একজন মুসলিম ছাত্রের ঐ রকম কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের একটা আলাদা গৌরব ছিল'— জনাব সিদ্দিকীর এ মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ এবং যথার্থ। পত্রলেখকের সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী অর্ধ-শতাব্দী পূর্বের সেই ঢাকার সমাজে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে

ক্রমবর্ধমান সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং সংঘাতের পরিবেশে দুই সম্প্রদায়ের দুই তরুণ-তরুণী, রউফ এবং উমার প্রণয়, পরিণয়ের প্রস্তাব অবধি নাকি পৌঁছেছিলো। কিন্তু প্লুরুসিতে আক্রান্ত রউফের আকস্মিক প্রয়াণে তাদের সেই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হতে পারে নি। ছাত্রীটির প্রকৃত নাম নাকি ছিল জয়ন্তী মজুমদার। ডাকনাম ছিলো উমা। এই বিষাদময় কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ তৈরি করেছেন পত্রলেখক জনাব সিদ্দিকী। সেকালের আবহাওয়াতে এই প্রণয় কাহিনীটি অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু তার বিস্তারিত বিবরণের তেমন প্রয়োজন হয়ত আজ নেই।

কলেজ নয় তো রাজপ্রাসাদ

কিন্তু আমার ব্যক্তিগত জবানবন্দিতে যদি চল্লিশেব দশকের ঢাকার কিছু স্মৃতিচারণ করতে হয় তাহলে আমাকে তো প্রথমে ঢাকাতে আসতে হয়।

আমি নিজে ঢাকা এসেছিলাম চল্লিশেব দশকের ঠিক শুরুতেই। ১৯৪০ সনে বরিশাল জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে পাস করার অব্যবহিত পরেই।

ঢাকা ইন্টাবমিডিযেট সরকারি কলেজে আই. এ.-তে ভর্তি হয়ে গেলাম। কত সহজে, এক বাক্যে ভর্তি হয়ে গিয়েছিলাম। সেদিন ব্যাপারটা এমনিই ছিলো। যারা ভর্তি হতে চাইত, যারা আগের পবীক্ষা পাস করে এসেছে তাদের জন্য ভর্তি হওয়া কোন সমস্যা ছিলো না। আজ সেদিনেব কথা শায়েস্তা খাঁর আমলের চাল-ডালের মতোই শোনায। চাল-ডালের কথা তুলছিনে। কিন্তু লেখাপড়ার ব্যাপাবে সেদিনটি শায়েস্তা খাঁর আমলেব ব্যাপারই ছিল। স্কুল-কলেজই ভর্তির জন্য ছাত্র খুঁজে বেড়াত। কোনো স্কুল বা কলেজ কত ভালো, তার প্রসপেকটাস বার করতো।

ঢাকা শহরে তখন প্রধান কলেজ ছিলো ঢাকা কলেজ আর জগন্নাথ কলেজ। আবো কলেজ ছিলো। কিন্তু এ দু'টিই পুরানো এবং পবিচিত।

ঢাকা কলেজে আই.এ.-তে আমার বিষয় ছিলো ইংরেজি, বাংলা এবং তার সাথে ইতিহাস, মানে পৃথিবীর ইতিহাস, লজিক এবং সিভিক্স ও ইকনমিক্স।

'ঢাকা কলেজ' কথাটি মনে করতেই আমার চোখে ভেসে ওঠে প্রাসাদের মত সেই দালানটি, যেটি ১৯০৫ সনে প্রথম বঙ্গভঙ্গের পবে পূর্ববঙ্গ এবং আসাম নিয়ে গঠিত প্রদেশের লাট সাহেবের ভবন হিসেবে তৈরি হয়েছিলো। অনেকটা কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-এর প্যাটার্নে তৈরি। সাদা ঝক্‌ঝকে বাড়ি। উঠতে রাজকীয় সিঁড়ি। মার্বেল পাথরের। তারপরে দোতলায যাবার সিঁড়ি। ফটো নেওয়ার মতো। উপরে উঠে বাঁদিকে কাঠের মেঝে, বিরাট হল ঘর। পরে শুনেছি এটি নাকি সাহেবদের বলরুম বা নাচঘর ছিলো। মোট কথা কোনো ঘরই ছাত্রদের ক্লাস করার জন্য তৈরি নয়। তাই জীবনকালের ভাগ্য যে এমন দালানে ঢোকার অধিকার পেল বরিশালেব প্রত্যন্ত গ্রামের এক 'ছাওয়াল'। দিনকালই বদলে যাচ্ছিল। তা না হলে, এমন হয়? প্রাসাদের মধ্যে কৃষকের সন্তানের প্রবেশ ঘটে?

রাস্তার একদিকে এই দালান। বর্তমানে পুরানো হাইকোর্ট নামে পরিচিত। আর একদিকে কার্জন হল। মাঝখানের এই রাস্তাটি সেদিন থেকেই আছে। এর তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। তা না হলে সেদিনের ঢাকা আর অপরিবর্তিত নেই। এমন কি শহরের মধ্যকার দোলাইখালও আজ রাস্তা হয়ে গেছে এবং ঢাকার রেলস্টেশন বলতেই যে ফুলবাড়িয়াকে বোঝাত সে এখন এই '৮৩ সালে ঢাকা থেকে যাতায়াতকারী বাসের প্রধান কেন্দ্র। রেল লাইন আর বিদ্যমান নেই। পুরানো সেই রেললাইনকেই তেজগাঁ থেকে গেন্ডারিয়া পর্যন্ত রাস্তা করা হয়েছে।

পরিবর্তিত ঢাকায় হাঁটতে কিংবা রিকশা করে যাতায়াতেও ঢাকাকে যেমন অপরিচিত তেমনি নিজেকে বিদেশি বলে বোধ হয়।

১৯৪০ সনেও নিজেকে ঢাকাতে বিদেশি বলে মনে হয়েছিলো। বিদেশি কিশোর হিসেবেই সেদিন শান্ত ঠাণ্ডা রমনার নাম না জানা এ-রাস্তা, ও-রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আবিষ্কার করেছি সলিমুল্লাহ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের আর্টস বিল্ডিং অর্থাৎ বর্তমানের মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। ঢাকা কলেজ আর কার্জন হলের মাঝখান দিয়ে রাস্তাটা পূর্বদিকে গিয়ে কোথায় যে মোড় নিয়েছিলো, কোন্ মাঠে বা বাগানে তা আব এখন স্মরণ করতে পারছিনে। অথচ মন চায় পুরনো দিনে ফিরে যেতে, পুরানো রাস্তায় হাঁটতে। পুরানো বাড়ি আজ বিধ্বস্ত, পুরানো মাঠ আজ সরকারি-বেসরকারি বাড়িতে রূপান্তরিত। এমন অবস্থায় পুবানো জীবনকে স্মরণ করার উপায় কি? তাই অসহায় বোধ করি পুরানো জীবনকে স্মরণ করার চেষ্টায়। ঢাকার সেই ৪০-এর দশকের কোনো পুরানো মানচিত্র আছে কিনা আমার জানা নেই। না থাকাই সম্ভব। থাকলে সেখানে বাস্তাঘাটের নাম দেখেও হয়তো পুরানো কথা কিছু স্মরণ করতে পারতাম। বস্তুর সঙ্গে স্মৃতি জড়িত থাকে, ঘটনার, এমন কি ভাব-ভাবনারও। সেই বস্তুর বাস্তব পরিবর্তনে পুরানো ঘটনাকে স্মরণে আনা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

ঢাকায় এসে প্রথম রাতটি কাটিয়েছিলাম নওয়াব মনজিলেব ন্যায় গঠিত বিরাট সলিমুল্লাহ হলে। এ কথাটি স্মবণ হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালযের বয়স্ক যে ছাত্রটির হাতে জিম্মা করে দিয়েছিলেন আমাকে আমার অভিভাবক বড় ভাই, সে ছাত্রটিই আমাব থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে। সেকালে যেমন তার বাইরের সৌকর্য ছিলো অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তেমনি ভেতরের বাগানটিও ছিল ছবির মতো সাজানো, মনোহারী। তার চারপাশে কোথাও এমন মনোহর গম্বুজওয়ালা দালান আর ছিলো না। এখান থেকে জগন্নাথ হলের পাশ দিয়ে এগিয়ে কার্জন হল অবধি এলেই মাত্র আমাদের ঢাকা কলেজের সাদা গম্বুজওয়ালা বাড়ির সাক্ষাৎ মিলতো।

আজো এই দালানের পাশের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গেলে মনে ইচ্ছা জাগে একবার ভেতরে যাই, দেখি আমাদের সেই ক্লাস রুমগুলো এখন কেমন আছে। কিন্তু এমন ইচ্ছা পূরণ করার উপায় নেই। এ ভবন এখন নিষিদ্ধ এবং সংরক্ষিত এলাকা। সরকারের কোনো গোপন বিভাগ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অথচ ইতিহাসের সাক্ষ্য হিসেবে দালানটিকে জাতীয় যাদুঘর হিসেবে বিবেচনা করে তাকে যেমন অবিকৃত রাখার চেষ্টা করা আবশ্যক, তেমনি

তাকে আজকের যুগের শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতী, প্রবীণ-প্রবীণার দর্শনের জন্য প্রবেশযোগ্য করাও আবশ্যক। এই ভবনের বিভিন্ন ঘরেই পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের ইতিহাসের বিকাশ ও বিবর্তনের নানা উপাদান সংরক্ষিত ও প্রদর্শিত হওয়া উচিত। নতুন যাদুঘর ভবন বিশাল বটে, কিন্তু পুরানো এই ভবনটির মত ইতিহাসের সাক্ষাৎ সাক্ষ্য সে এখনো হয়ে ওঠে নি।

ঢাকা কলেজের কথা বলতে কেবল কলেজ ভবনই যে মনের মধ্যে ভেসে উঠছে, তা নয়। এখানে কলেজের আর একটি ভবনের কথাও বলতে হয়। সেটি ঢাকা কলেজের ছাত্রদের থাকার ভবন। ভবনটি কার্জন হলের দক্ষিণ-পূর্বে লাল ইটের ভবন। এটি এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলেব মূল ভবন বলে পরিচিত। এর মূল কাঠামোটি এখনো অপরিবর্তিত। কিন্তু দোতলার সঙ্গে আব একটি তলা যুক্ত করা হযেছে। সামনের মাঠেও নতুন ভবন তৈরি হযেছে। তবে বৃহৎ আকাবেব পুকুরটি এবং তারই দুই পাড়ের বড় বাঁধানো ঘাট এখনো আছে। এই পুকুরের পশ্চিম পাড়ে সেকালে ছিলো ঢাকা হল, বিশ্ববিদ্যালযের ছাত্রাবাস। থাকতো প্রধানত হিন্দু সমাজেরই ছাত্রবৃন্দ। এখন সে ছাত্রাবাসের নাম দেওয়া হয়েছে শহীদুল্লাহ্ হল : ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ হল।

কাজেই যেটি এখন ফজলুল হক হল, সে ভবনটি আসলে ঢাকা কলেজেরই ছাত্রাবাস। এই ভবনটির সঙ্গে আমার ছাত্র জীবন, বলা চলে '৪০ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পর্যায়, এম.এ. পর্যন্ত জড়িত ছিলো। কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে ঢাকা কলেজের ভবনটি যেমন তখন বৃটিশ ও মার্কিন সামরিক বাহিনীর পূর্ব রণাঙ্গনের সৈনিকদের একটা হাসপাতালে পর্যবসিত হযেছিলো, ঢাকা কলেজেব ছাত্রাবাসও অন্যত্র অপসারিত হয়েছিলো। যুদ্ধের সময়ে ইউনিভার্সিটিব মূল আর্টস বিল্ডিং-এর একাংশও সামরিক হাসপাতালে পবিণত হযেছিলো এবং তখনি বোধ হয এই ভবনের দোতলাতে অবস্থিত ফজলুল হক হলকে ঢাকা কলেজের ছাত্রাবাস তথা বর্তমান ফজলুল হক হল ভবনে নিয়ে আসা হয।

কিন্তু ভবনসমূহেব এমন প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস রচনার দক্ষ লোক আমি নই। তবু ভবনের মধ্যকাব মানুষজন, তাব ভাবনাচিন্তার কথা বলতে গেলে ভবনের কথাই আগে আসে।

একটা কথা বলা ভাল। সেদিন এটাকে তেমন বেমানান মনে হয় নি। কিন্তু আজ কথাটা ভাবতে গিয়ে একটু বিস্ময় বোধ হচ্ছে। ঢাকা কলেজের ছাত্রদের হোস্টেলের কথা বলেছি। কিন্তু ছাত্রীদের সন্ধান কি? আসলে এখনো ঢাকা কলেজ বোধ হয় কেবল মাত্র ছাত্রদেরই কলেজ, যদিও শিক্ষক বা অধ্যাপকরা কেবল অধ্যাপকই নন, অধ্যাপিকাও বটে। কিন্তু সেদিনও ঢাকা কলেজে কোনো ছাত্রী পড়তো না। জগন্নাথ কলেজেও নয়। ছাত্রীদের ইডেন কলেজ শহরের এ মাথাতেই ছিলো না। ছিল ওয়াইজঘাট নামে সদরঘাটের কাছে যে এলাকা আছে সেখানে। মোট কথা মেয়েদের সঙ্গে সেই 'ইন্টারমিডিয়েট স্টেজে'ও আমাদের কোনো যোগাযোগই ছিলো না।

প্রবীণ অগ্রজ সাহিত্যিক, অধ্যাপক, অধ্যক্ষদের স্মৃতিচাবণে দেখছি যে, তাঁরা অনেকে ঢাকা কলেজে পড়েছেন এবং ঢাকা কলেজে প্রখ্যাত সাহিত্যিক কাজি আবদুল ওদুদের

সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তাঁর সাহিত্য আলোচনা শুনেছেন। কিন্তু আমার সে সৌভাগ্য হয় নি। হয়ত কাজি আবদুল ওদুদ '৪০-এর পূর্বেই ঢাকা থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজ বা অপর কোথাও বদলি হয়ে গিয়েছিলেন।

'৪০ থেকে '৪২ সনের কলেজ জীবনে আমার স্মৃতিতে ভেসে ওঠে প্রয়াত ডক্টর মমতাজউদ্দিন আহমদের নাম। তিনি তখন ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। তাছাড়া আমার নিজের শিক্ষকদের মধ্যে ইংরেজিব জালালউদ্দিন আহমদ, পি.কে. রায় (সঠিক মনে করতে পারছিনে নামটি), ইতিহাসের পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী। (আহা! কি নিরীহ কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষক। শুনেছি পরবর্তীকালে ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত হন)। সিভিক্স ও ইকনমিকস্-এব অধ্যাপক জনাব শফিকুর রহমান, লজিকেব জনাব ফজলুব রহমান— এঁরা ছিলেন। শফিকুব রহমান সাহেব এবং ফজলুর রহমান সাহেব এখনো জীবিত আছেন এবং উচ্চতব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা বিশ্ববিদ্যালযের শিক্ষামূলক কার্যাদির সঙ্গে সক্রিযভাবে জড়িত আছেন। এটি আনন্দের কথা। জালালউদ্দিন সাহেব খুব রসিক মেজাজেব মানুষ ছিলেন। তাঁর ইংবেজি উচ্চারণ নিয়ে সেদিনও আমবা ছেলেরা নানা বস-বসিকতা করতাম। তাঁকে অনুকবণ কবে কথা বলতাম। জালাল সাহেব পরবর্তীকালে অর্থাৎ পাকিস্তান আমলে দীর্ঘদিন ঢাকা কলেজেব অধ্যক্ষের দাযিত্ব পালন করেছেন। কিন্তু তিনি এখন প্রয়াত।

দু'বছরের সেই কিশোরকালের কলেজ জীবনে বড় রকমের কোনো ঘটনা স্মৃতিতে নেই। যে একটির কথা স্মবণে আছে তা একটু বিস্তারিতভাবে পরে বলব। কিন্তু তার চেয়ে হালকা ধরনের নিজের যে আচরণের কথা মনে পড়ছে তারই একটু উল্লেখ এখানে করা যায। বিজ্ঞানে সেদিন কারা ছাত্র ছিলেন, তা আজ জানিনে। কারণ আমি ছিলাম আই.এ. তথা কলা শাখার ছাত্র। কলা এবং বিজ্ঞান, এ দু'টিই প্রধান শাখা ছিলো। বাণিজ্য শাখা তখনও চালু হযেছে কিনা স্মরণ নেই। কলা শাখায, বিশেষ করে আমার ক্লাসে সহপাঠী হিসেবে আমি পেয়েছিলাম সৈযদ আলী আশরাফকে। সৈয়দ আলী আশরাফ সৈয়দ আলী আহসানেব অনুজ। সৈযদ আলী আশরাফ ছিলেন যেমন মেধাবী তেমনি সিবিয়াস। বিশ্ববিদ্যালযের অর্থনীতির অধ্যাপক এইচ. এল.দে'র ছেলে অজিত দেও আমার সহপাঠি ছিলো। আমাব সহপাঠী ছিলেন কামালউদ্দিনও। ইনি পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে অনার্স এবং এম.এ পড়েছেন এবং এখন ব্যাঙ্কিং-এর ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত। নাসিরউদ্দিনও আমার তখনকার বন্ধু; নাসিরউদ্দিন আহমদ। ডাক বিভাগ এবং যোগাযোগ বিভাগের উচ্চতর দায়িত্ব পালন করে হয়ত এতদিনে অবসব নিয়েছেন। নাসিরের ছোট ভাই ছিলো গিয়াসউদ্দিন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের তরুণ অধ্যাপক, '৭১ সনে হানাদার বাহিনীর হাতে নিহত হয়ে নিজের সতেজ স্বাদেশিক জীবনবোধের অপরাজেযতাকে প্রমাণ করে গেছেন। তাদের পরিবারেও যেমন, আমিও তেমনি গিয়াসকে তার কিশোরকালে ডাকতাম 'বাচ্চু' বলে। নাসিরের বাবা ১৯৪১-৪২ এ চাঁদপুর মহকুমার প্রধান ছিলেন। জনাব আবদুল গফুর। উদার হৃদয় মানুষ। নাসির নিয়ে গিয়েছিলো আমাকে তাদের সেই বাসায়। আর সেখানেই কিশোর বাচ্চুকে

পেয়েছিলাম আমার অনুরাগী স্নেহভাজন হিসেবে। '৪২-এর কথা বলতে এমনিভাবে '৭১-এর শহীদ বাচ্চুও স্মৃতির পাতায় স্মৃতি হিসেবে জ্বলে ওঠে। আমার আর একটি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন আবদুল মতিন। এককালে সাংবাদিক ছিলেন। এখন বিলেত প্রবাসী। ইনি বিজ্ঞানেব ছাত্র ছিলেন। কিন্তু হোস্টেলে আমার সঙ্গী ছিলেন। হোস্টেলে সঙ্গী ছিলেন কামালও। তাছাড়া ইতিহাসের আর একজন মেধাবী ছাত্রের নাম আজ স্মরণ হচ্ছে। ফবিদপুর থেকে এসেছিলেন মোজাহেরউদ্দিন আহমদ। মেধাবী এবং ব্যতিক্রমী জীবন বোধ আর আচরণের এক তরুণ ছাত্র ছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে ইতিহাসে এম.এ. পাস করেছেন। আইন শাস্ত্রেও কৃতিত্বের সঙ্গে ডিগ্রি নিয়েছেন। মুন্সেফ থেকে বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা এবং অধ্যক্ষতা কবেছেন। কিন্তু সংসার বা চাকরি, কোথাও যেন কোনো স্থিতি পান নি তিনি। এবং মানাতে পাবেন নি পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে। সে পরিবেশে তিনি এককালে যেমন সাম্প্রদায়িক মনোভাবের তীব্রতা দেখেছেন, তেমনি জীবনেব অন্যান্য ক্ষেত্রে সুবিধাবাদ এবং দুর্নীতি তাঁর আপসহীন মনকে বিচলিত করেছে। তিনি অকালে মাবা গেছেন। বন্ধুবর আবুল কাসেম ছিলেন দরাজমন, মেজাজ এবং চিন্তার কিশোর। কূপমণ্ডুকতা এবং সাম্প্রদায়িকতাকে তিনি আন্তরিকভাবে ঘৃণা করতেন সেই তাঁর কলেজেব ছাত্রজীবন থেকে এবং কারুব মধ্যে এমন সঙ্কীর্ণতার পরিচয় পেলে তাকে স্পষ্ট ভাষায় সমালোচনা করতে কাসেম ছিলেন দ্বিধাহীন। তাঁব ব্যক্তিগত জীবনটিও বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। সরকারি কলেজে ভূগোলের অধ্যাপনা করেছেন। ইংরেজি সাহিত্যেও ডিগ্রি নিয়েছেন। এখনো তিনি তাঁর সেদিনকার সরস মেজাজ এবং ভঙ্গি নিয়ে বেঁচে আছেন।

কলেজেব মধ্যে রাজনৈতিক হৈ-হাঙ্গামা সেকালে তেমন ঘটে নি। তখনো রমনা শান্ত। ৪০, ৪১, ৪২-বিশেষ করে যুদ্ধ বাধার পূর্ব পর্যন্ত সেকালের কিশোর ছাত্রদের জীবন তবঙ্গবিহীন অলস-আনন্দঘন অধ্যযনের জীবন। শিক্ষকরা ক্লাস করতেন রীতিমত। বরঞ্চ সেই রীতিমত ক্লাসের মধ্যে দু'এক সময়ে ক্লাস না কবাতেই মন আনন্দ পেতো। (এখন রীতি হচ্ছে ক্লাস না হওয়ার। ক্লাস হওয়াটাই রীতির ব্যতিক্রম।) ক্লাসে আমরা শিক্ষকদের সঙ্গে নির্দোষ দুষ্টামিতে আনন্দ পেতাম। জালাল সাহেবের বেপরোয়া ঢাকাইয়া উচ্চারণের ইংবেজি বক্তৃতাতে আমরা বেশ আমোদ বোধ করতাম। শফিকুর রহমান সাহেব সিভিকস্ আর ইকনমিক্স্ পড়াতেন। নিরীহ এবং সিরিয়াস অধ্যাপক। হযত ছাত্রদের সঙ্গে রস-রসিকতার যোগাযোগ কম ছিল; আর তাই তাঁর কোনো ভঙ্গি নিয়ে ছাত্ররা তাঁকে জ্বালাতন করার চেষ্টা করতো। তাঁব আলোচনা রীতিকে আমরা একটা রঙ্গ করে প্রকাশ করে নিজেদের মধ্যে তিনি ক্লাসে আসার আগে বলতাম: 'চ্যাপম্যান ওপাইন্‌স্', সেলিগম্যান কনক্লুডস এ্যান্ড শফিকুর রহমান জয়েনস' : এটা সেকালের দুষ্টু কিশোর আমাদের মস্তিষ্কের সৃষ্টি। শফিকুর রহমান সাহেব হয়ত তাঁর বক্তৃতায় অথরিটির উদ্ধৃতি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার করতেন। তার প্রতি তাঁর ছাত্রদের সরস সমালোচনা। কিন্তু এমন সমালোচনা তাঁব কানে কখনো গেছে বলে আমি মনে করিনে।

মমতাজউদ্দিন সাহেব নিজে দর্শন শাস্ত্রের বিলেত-ফেরত অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে দর্শন পড়াবার তো কোন জায়গা ছিলো না। লজিকের ক্লাস নিয়েছেন,

এমনও মনে পড়ে না। কিন্তু ইংরেজির ক্লাস নেওয়াটাই বোধ হয় অধ্যক্ষকে অধিক মানায়। তাই তিনি আমাদের দু'একটা ইংরেজি ক্লাস নিয়েছিলেন। তাব একটা ক্লাসে তিনি 'এসথেটিক্স্' ব্যাপারটির সংজ্ঞাদানের চেষ্টা করে তাঁর নিজস্ব কিছুটা তোতলানো ভঙ্গিতে এবং বিশিষ্ট উচ্চারণে যে বিব্রত হয়ে উঠছিলেন সেটি আজ ৪৩ বছর পরেও মনে ভেসে উঠছে। 'ইউ আনডারস্ট্যান্ড, এসথেটিক্স্ মিনস্—' সে উচ্চারণটি কানে বাজলেও তাকে তুলে দেওয়ার ক্ষমতা নেই। সেদিনকার তাঁর বিব্রতকর অবস্থায় দুষ্ট ছাত্র হিসেবে আমোদ বোধ করলেও আজ তাঁর জন্য মমতাবোধ হচ্ছে। মমতাজউদ্দিন সাহেবই পরবর্তীকালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠন ও বিকাশে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন 'মমতাজউদ্দিন কলাভবন' বলে অভিহিত হচ্ছে।

কিন্তু তিনি বেশ স্নেহপরায়ণ ছিলেন। কলেজের পেছনে মাঠের মধ্যে একতলা বাড়িটিতে প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে তাঁর বাস ছিলো। আমরা সেবাব হোস্টেলে কি নিয়ে যেন 'হাঙ্গাব স্ট্রাইক' কবেছিলাম। তখন বেডিও যুগের সবে সূচনা। হয়ত আমাদেব দাবি ছিলো হোস্টেলেব কমনরুমে একটি বেডিও কেনো বসানো হচ্ছে না। কিংবা হয়ত অভিযোগ ছিলো ডাইনিং হলের ডাল এত পাতলা হয় কেনো? আমরা ঘোষণা করে দিলাম আমবা আর ভাত খাবো না। দুপুব গড়িয়ে যায়, আমরা ভাত খাইনে। অবশ্য নিজের নিজের ঘরে বসে কেক, বিস্কুট খেতে আমাদেব কোনো অসুবিধা হয় নি। আমাদের ক্ষোভ বোধ হয় বেশি ছিলো হোস্টেলেব সুপাবিনটেনডেন্ট জাঁদবেল মানুষ ওয়ালীউল্লাহ সাহেবের বিরুদ্ধে। ওয়ালীউল্লাহ সাহেব অবশ্য মুসলমান ছাত্রদেব সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান ছাত্ররা আমরা একই দালানে থাকতাম। পশ্চিম দিকেব ভাগটা বোধ হয় হিন্দু ছেলেদেব ছিলো। পূর্বদিকের ভাগটা মুসলমান ছেলেদের। তিনটা দালান। একটার সঙ্গে আর একটা যোগ করা। উত্তবেব অর্ধেক বোধ হয় হিন্দু ছেলেদেব। অর্ধেক মুসলমান ছেলেদেব। এরও আগে হয়ত হিন্দু ছাত্রদের সংখ্যাই বেশি ছিলো। '৪০-এর দিকে মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। সে যা হোক, হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদেব দুটো ভিন্ন হোস্টেল ছিলো, এমন আমার মনে পড়ে না। হিন্দু ছাত্রদেব সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন বোধ হয় বিজ্ঞানের অধ্যাপক নির্মল সেন। আমাদের একজন এসিসট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন। তাঁর নাম জনাব কফিলউদ্দিন। ওয়ালীউল্লাহ সাহেব এবং কফিলউদ্দিন সাহেব—এঁরা দু'জনেই আজ প্রয়াত। যে 'হাঙ্গাব স্ট্রাইকেব' কথা বলছিলাম তাঁব স্মৃতিতে দেখছি, মমতাজউদ্দিন সাহেব যখন শুনলেন আমরা বেলা দুটো পর্যন্ত খাচ্ছিনে, তখনি তিনি ছুটে এলেন আমাদের রাগ ভাঙাতে। নিজে ছেলেদের পিঠে হাত দিয়ে আদর করে ডাইনিং হলে নিয়ে গেলেন এবং নিজে তাদের সঙ্গে বসে খেলেন এবং ভরসা দিলেন, ডাইনিং হলের খাওয়ার তিনি উন্নতির ব্যবস্থা করবেন।

শিবরাত্রির ফুল সিরিয়াল

'৪০-৪২ সালের কথা। ঢাকা কলেজের ক্লাসের স্মৃতি যতো না মনে পড়ে তার চেয়ে বেশি মনে পড়ে হোস্টেলের। সহপাঠী নূরুল ইসলাম চৌধুরী ছিলেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। আর ছিলেন

লুৎফুল করিম। এরা ক'জন কেবল যে কলেজের সহপাঠী ছিলেন তাই নয়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পাঠ্য বিষয়ের বিভিন্নতা হলেও এঁদের অনেককেই আমি একই ভবনে, অর্থাৎ ঢাকা কলেজের হোস্টেল ভবন যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম ছাত্রাবাস ফজলুল হক হলে রূপান্তবিত হলো, তখন হলের সঙ্গী হিসেবেও পেয়েছিলাম। নূরুল ইসলাম চৌধুরী সম্প্রতি বাংলাদেশের ফরেন সারভিস থেকে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন শেষে অবসর গ্রহণ করেছেন। প্রয়াত অধ্যাপক এ.কে নাজমুল করিমের কনিষ্ঠ ভাই লুৎফুল করিমও সরকারের প্রশাসন বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ কবেছেন।

কিন্তু সেই '৪১-৪২ সালের ইন্টারমিডিয়েট হোস্টেলের স্মৃতির মধ্যে আর যে ঘটনাটি ভাসছে সেটিকে কিছুটা রাজনৈতিক ঘটনা বলা চলে। এই ঘটনাটির উৎসও বোধ হয় হোস্টেলের জাঁদরেল সুপারিনটেনডেন্ট ওয়ালীউল্লাহ সাহেব। সাংঘাতিক কড়া মানুষ ছিলেন। হোস্টেলে নিয়ম কবেছিলেন, বাত ন'টা বাজতেই লোহার সদর গেট বন্ধ করে দিবেন। এরপবে কেউ বাইরে থেকে এলে তাকে গেট বইতে নাম লিখতে হবে এবং তাব এমন বিলম্বের জন্য পরের দিন সুপারিনটেনডেন্টের কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে। রাত দশটার পবে হোস্টেলের মেইন সুইচ অফ করে দেবার হুকুম দিতেন। দশটাব পরে সবাইকে ঘুমাতে হবে। সিনেমা যাওয়া বারণ ছিল। অথচ এমন সমস্ত নিয়ম-নিষেধ আমরা মান্য করার চাইতে ভঙ্গই হযত বেশি করতাম। বিলম্বে ফিরলে গেটের খাতায় নাম লেখার বদলে গেটেব উঁচু শিক বেযে তা টপকে ভেতরে ঢোকার পন্থাই ছেলেরা অধিক গ্রহণ করতো। একবার ব্যাপারটা একটু বেশি হয়ে গিয়েছিলো।

সে বাতটা ছিল শিবরাত্রি। হিন্দু পর্বের দিন। এমন পর্বে ঢাকায় তখন যে কয়টি সিনেমা ঘর ছিলো তাদের মধ্যে বিশিষ্টরা বিশেষ আকর্ষণীয় ছবির প্রদর্শনী করতো। এই শিবরাত্রিব তারিখেও ঢাকার অন্যতম সিনেমা হল মুকুলে (এর বর্তমান নাম 'আজাদ', ঢাকা কোর্টের বিপরীতে) এই রাতে তিন তিনটা পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা ছায়াছবি দেখবার আকর্ষণ ছিলো। এমন আকর্ষণে আকৃষ্ট না হওয়া কঠিন ব্যাপার। ভক্ত, অনুরক্ত ইত্যাদি মিলে আমার প্রায় একটি দল বা উপদলেব মতো গড়ে উঠেছিলো। এবা একজোটে হাঁটতো, চলতো, গল্প করতো। এদের নিজেদের মধ্যে আলোচনার প্রধান বিষয় হতো সাহিত্য বা কোনো উল্লেখযোগ্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ঘটনা। নিজেদেব ভাবনাচিন্তা প্রকাশ করার জন্য হাতে লেখা ম্যাগাজিনও আমরা সেদিন তৈরি কবেছিলাম। নাম দিয়েছিলাম : 'পাগলা ঝোরা'। এ নামের কি অর্থ, তা আমি আজো জানিনে। হয়ত বা উৎফুল্ল নির্ঝর। এই দলের প্রায় স্বনির্বাচিত নেতা হযে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। আর সেজন্যই বোধ হয আমার নামের প্রধান দুই অংশকে বাদ দিয়ে বন্ধুরা নামের অপ্রধান অংশকে প্রধান করে 'সরদার' বলে আমাকে সম্বোধন করতো। শিবরাত্রির ফুল সিরিয়ালে যাবার গোপন ব্যবস্থার দায়িত্ব পড়ল আমাব ওপর। সন্ধ্যার পরেই ডাইনিং হল থেকে খেয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে সোজা রওনা দিলাম রমনা হোস্টেল থেকে মুকুল বরাবর। ভরসা ছিল, ছবি দেখতে দেখতে তো ভোর হয়ে যাবে। তখন ফিরে এলে গেট খোলাই পাওয়া যাবে এবং ওয়ালীউল্লাহ সাহেব টেরও পাবেন না। তিন তিনটে ছবি। একটির বোধ হয় নাম ছিলো

'দেশের মাটি'। আর দু'টির নাম মনে নেই। তবে ঠিকই, সারা রাত্রি ছবি দেখেছিলাম। পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা ছবি মানে প্রত্যেকটার দৈর্ঘ্য কমসে কম আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা। ছবি যখন শেষ হলো তখন ভোর হয়েছিলো ঠিকই। কিন্তু সারারাত ধরে এমন অদ্ভুত আনন্দ ভোগের নেশায় ছ'সাতজনের সেই দলের সকলেরই চোখ বাঙা আর ঢুলুঢুলু, মাথার চুল বেপাট, উস্কখুস্ক। কারুব মুখেই তেমন কোনো কথা নেই। আধ বোজা চোখে নির্জন ঠাণ্ডা রাস্তা দিয়ে 'মুকুল' থেকে সারাটা পথ হেঁটে এলাম। মনে কোনো ভয় ছিলো না। ভেবেছিলাম, এত সকালে ওয়ালীউল্লাহ্ সাহেব জানতেও পারবেন না। কিন্তু প্রবাদে যা আছে বাস্তবে তা সত্য বৈ মিথ্যা হয় না। যেখানে বাঘেব ভয় সেখানেই রাত্রি হয়। আমাদেরও তাই হলো। হোস্টেলেব কাছে প্রায় এসে গেছি। এখনো বাস্তার পাশের গেটে পৌঁছি নি। হঠাৎ শুনলাম হাঁক এলো : এই তোমরা সবাই কোত্থেকে এলে, এত ভোরে? ঐ হাঁকের চোটে আমাদের সকলেব তন্দ্রা টুটে গেল। চোখেব পাতা পুবো খুলতেই দেখি সামনেই ব্যাঘ্র স্বয়ং, সুপাবিনটেনডেন্ট ওয়ালীউল্লাহ সাহেব। কিন্তু যেটা মারাত্মক হযেছিলো, সে হচ্ছে এই দলের মধ্যে জবাবদানকাবী একজনেব সত্যবাদিতা। সে মুখে আর কোনো জবাব না পেযে অক্লেশে বলে ফেলল: স্যার, সিনেমায় গেছিলাম।

বিস্ময় আর আতঙ্কভরা প্রশ্ন এলো আবাব : সিনেমায়? সারাবাত? ডিড ইউ টেক পাবমিশন?

জবাব এলো: স্যাব সরদাব বলেছে, পারমিশন পাওযা গেছে ... ...

কিন্তু সত্যি কি সরদাব বলেছিলো, 'পারমিশন পাওযা গেছে'? সরদারেব একথা সেদিনও মনে পড়ে নি, আজো মনে পড়ছে না। তাই বলে, তা নিয়ে বাদপ্রতিবাদের প্রশ্ন ওঠে না। যে বিপদ এসেছে, তার আশঙ্কা তো ছিলই।

: সি ইন মাই অফিস : আমাব অফিসে সবাই দেখা করো। ... ...

যা হোক, বিস্তারিত সংলাপ উল্লেখ করে লাভ নেই। ওয়ালীউল্লাহ্ সাহেব 'শোকজ' কবলেন আমাদের সবাইকেই; 'শোকজ' কেন তোমাদের স্টাইপেন্ড কেটে দেওয়া হবে না এবং লুৎফুল করিমকে (এবং আরো একজনকে বোধ হয়) হোস্টেল থেকে বহিষ্কৃত করা হবে না? লুৎফুল করিম ছিলো নাজমুল করিমের ছোট ভাই। নাজমুল করিম ইউনিভার্সিটিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স পড়েন। আমরা ঢাকা ইন্টার হোস্টেল থেকে বিভিন্ন সময়ে তাঁর কাছে গিয়ে গল্প করি। তাঁরও একটি ভক্ত এবং গুণমুগ্ধ সহপাঠীর দল ছিলো। লুৎফুল করিমের ওপর খড়গহস্ত হওয়াব কাবণ বোধ হয় ওর ত্যাড়াবাঁকা জওয়াব। লুৎফুল করিম সুপারিনটেনডেন্ট সাহেবকে হযত তেমন মান্য কবতো না এবং এই অপরাধের ব্যাপারে তাঁকে কিছু একটা বলে থাকবে।

এবং এই বহিষ্কারের আদেশ থেকেই ব্যাপারটা কিছুটা রাজনৈতিক হয়ে দাঁড়াল। আমরা যুক্ত হয়ে পড়লাম আমাদের কলেজের বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়, এমন কি বৃহত্তরভাবে দেশের মধ্যে প্রবাহিত রাজনৈতিক ধারা-উপধারার সঙ্গে। ১৯৪০-এর পরবর্তীকাল। যুদ্ধ বেধে গেছে ইউরোপে। সে যুদ্ধ ক্রমে সম্প্রসারিত হচ্ছে বিশ্বের চারদিকে। '৪২-এর গোড়াতে এশিয়াতে যুদ্ধ চলছে। জাপান এগুচ্ছে চীনের দিকে এবং বর্মার দিকে। ভারতবর্ষে

প্রধান রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বাধীনতার আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠছে। প্রধান ধারার বাইরে মুসলমান সম্প্রদায়েব নেতৃবৃন্দ জিন্নাহ সাহেবের নেতৃত্বে দাবি তুলেছে পাকিস্তানের। '৪০-এর মার্চে লাহোরে পাশ হয়েছে পাকিস্তান প্রস্তাব। মুসলিম সমাজের ছাত্রদের মধ্যেও পাকিস্তান আন্দোলন সাড়া জাগাচ্ছে। মুসলিম ছাত্রদের প্রতিষ্ঠান এই আন্দোলন সমর্থন করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্রগণ বোধ হয় এই প্রথম দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে উঠছে। রাজনৈতিক মঞ্চের ঘটনা-দুর্ঘটনা, দাবি প্রতি-দাবির প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তাদের মধ্যে। তারা আন্দোলিত হচ্ছে তাব দ্বারা।

বঙ্গদেশ এবং তার রাজধানী কলকাতায় তখন এই রাজনীতিই নানা জটিলতা লাভ করছে। বঙ্গদেশের অন্যতম জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক। তিনি এতদিন মুসলিমদের অন্যতম প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু জিন্নাহ সাহেবের সঙ্গে তাঁব বিবোধিতা ঘটেছে। তিনি মুসলিম লীগের বাইরেব শক্তি এবং হিন্দু সম্প্রদায়েব প্রখ্যাত নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে সঙ্গী করে কলকাতায় আইন পরিষদে মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। এই মন্ত্রিসভাকেই মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ এবং অনুসারীগণ নিন্দাসূচকভাবে 'হক-শ্যামা' বা 'শ্যামা-হক' মন্ত্রিসভা বলে অভিহিত করছে। এই মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন ঢাকার নওয়াব হাবিবুল্লাহ। পুরাতন ঢাকা তথা ঢাকার স্থানীয় মুসলিম সমাজের ওপব নওযাব পবিবারেব তখনো বিপুল প্রভাব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রবা প্রধানত ঢাকার বাইরে থেকে আগত। তাদের বাস ছাত্রাবাসগুলোতে। মোট কথা বৃহত্তব ক্ষেত্রে যেমন, ঢাকাতেও তেমনি হক সাহেবের মন্ত্রিসভার পক্ষেব, বিপক্ষের একটি রাজনৈতিক শক্তি সংগঠিত হয়ে ওঠে।

ঢাকা কলেজের হোস্টেলে আমাদেব মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন তারা তখন জরুরিভাবে আবেদন করল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হক সাহেবেব কাছে। হয়ত এটা তাদের কৌশলগত একটা ব্যাপাব ছিলো। তারা বলল যেহেতু তারা হকপন্থী সে কারণে তাদের বিরুদ্ধে এবকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। হক সাহেব নাকি কলেজ কর্তৃপক্ষকে এই দণ্ড অবিলম্বে প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আমাদের হোস্টেলের ব্যাপারটি সাংঘাতিক কিছু অবশ্যই ছিলো না। কিন্তু ক্রমান্বয়ে যে আমবা যুক্ত হয়ে পড়ছিলাম বৃহত্তর রাজনৈতিক ধারা-প্রতিধারার সঙ্গে, সেটি উল্লেখ করা আবশ্যক।

এমনি সময়ে শোনা গেল হক মন্ত্রিসভার নেতৃবর্গ ঢাকা আসবেন আগামী অত তারিখে। ঢাকায় এপক্ষ, ওপক্ষের যেন সাজসাজ রব পড়ে গেল। মুসলমান ছাত্রদের প্রধান অংশ হক সাহেবের বিরোধী হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, মুসলিম লীগ হক সাহেবের বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং তখন পাকিস্তান আন্দোলনই মুসলমান সমাজের প্রধান আন্দোলন। মুসলিম ছাত্ররা সংগঠিত হলো, ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশনে হক সাহেবের মন্ত্রিসভার নেতারা যখন নামবেন তখন তাঁদের বিরুদ্ধে কালো পতাকা প্রদর্শন করে তাদের

বিরোধিতা করা হবে। শহরের মহল্লা সরদারগণ নওয়াব বাড়ির নেতৃত্বে সংগঠিত হলো ঢাকা রেলস্টেশনে হক মন্ত্রিসভার সদস্যদের সংবর্ধনা জানাবার জন্য। খুব সম্ভব এই সদস্যদের মধ্যে নওয়াব হাবিবুল্লাহ মাত্র সেদিন কলকাতা থেকে ঢাকায় এসেছিলেন। আর কেউ নয়। তবু সেদিন স্টেশনে দুই পক্ষে সংঘর্ষ হয়েছিলো।

ঘটনার আগে থেকে ঢাকা কলেজের আমাদের হোস্টেলেও এই সংবর্ধনা প্রতি-সংবর্ধনার ঢেউ এসে লাগছিলো। একদিন দেখলাম হঠাৎ কযেকটি ছাত্র এসে আমাদেব কযেকজনকে বলল, আগামী অত তারিখে স্টেশনে যেতে হবে হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রদর্শনে। তাবা এমনটি করেছিলো আমাদের হকপন্থী ভেবেই। একথা ঠিক যে, দেশের রাজনীতির ব্যাপারটা আমরা তত বুঝতাম না। এবং সুনির্দিষ্টভাবে সেদিন আমরা হক মন্ত্রিসভার সমর্থক কিংবা বিবোধী হিসেবে দাঁড়াই নি। কিন্তু হোস্টেলেব মধ্যে আমাদের নিয়ে ইতিপূর্বে যে ব্যাপাব ঘটেছিলো তাতে হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার আমাদেব উপায় ছিলো না। আমবা বললাম: 'প্রতিবাদে যাবো, কি যাবো না, সে আমাদের স্বাধীন সিদ্ধান্তের ব্যাপার। একথায় আমাদেব হোস্টেলের প্রতিপক্ষ দল রুষ্ট হলো।

তাদের এই রোষেব প্রকাশ ঐ মুহূর্তে না ঘটলেও ঘটলো সংবর্ধনা প্রতি-সংবর্ধনার সন্ধ্যায়। কাবণ ঐ দিন সলিমুল্লাহ এবং ফজলুল হক হলের হক-বিরোধী যে ছাত্রবা প্রতিবাদ জানাতে ফুলবাড়িয়া স্টেশনে গিয়েছিলো তারা তাদের চাইতে দলে ভারি হক-নওয়াবের সমর্থনকারী মহল্লাব লোকদেব হাতে নিগৃহীত হযেছিলো। তাদেব কালো পতাকা প্রদর্শন তত কার্যকর হয় নি। স্বাভাবিকভাবেই তাবা ক্ষুব্ধ হয়েছিলো। এবং এই ক্ষোভের প্রকাশ ঘটাল তাবা ঐ সন্ধ্যায ফজলুল হক হল এবং সলিমুল্লাহ হলের যেসব ছাত্রকে তারা হক-সমর্থক বলে মনে করল তাদেব বিছানাপত্র ওলটপালট এবং ফেলে দেয়ার মাধ্যমে। ফজলুল হক হলে তাদেব আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিলো নাজমুল করিম। তাঁর বিছানাপত্র তাঁর প্রতিপক্ষীযরা ওপর থেকে নিচে ফেলে দিয়েছিলো। এই আক্রমণ আমাদেব হোস্টেলেও বিস্তারিত হলো।

কয়েক মাস পরেই আমার আই.এ. ফাইনাল পরীক্ষা। এমন সময়ে হোস্টেলের আবহাওয়া এই সব ঘটনায় পড়াশুনার জন্য প্রতিকূল হযে দাঁড়াল। আমি অবশেষে হোস্টেল ত্যাগ করে আমার বড় ভাই সাহেবের বাসায চলে যাই। তিনি তখন বরিশাল জেলার নলচিটিতে সাবরেজিস্ট্রার হিসেবে চাকবিরত। সেখানে তাঁর বাসায় বসে পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে লাগলাম। আমার বড় ভাই হোস্টেলের ঘটনাব বিবরণ শুনে আমার ওপর খুব সন্তুষ্ট হলেন না। তাঁর মন্তব্য হলো : 'তোমরা হচ্ছ কওমের দুশমন। তোমরা হুমায়ুন কবীরের মতোই ক্ষতিকারক শক্তি।' বড় ভাই আমার মুরুব্বি। তাঁর সামনে মুখ তুলে কখনো কথা বলিনে। সেদিনও কিছু বলি নি। কিন্তু একটু মজা লাগছিল, তিনি যে আমাকে হুমায়ুন কবীরের নামের সঙ্গে যুক্ত করে আঘাত করছেন, তাই দেখে। কারণ হুমায়ুন কবীরকে আমি ততটা খারাপ কিছু মনে করতাম না। সাংঘাতিক বিদ্বান বলে যেমন তিনি পরিচিত ছিলেন, তেমনি তাঁকে জাতীয়তাবাদী বলে আমি প্রশংসা করতাম।

সে যাহোক, মাস দুই পরে পরীক্ষা দিতে যখন ঢাকায় নিজের হোস্টেলে ফিরে এলাম তখন দেখলাম হোস্টেলের পরিস্থিতি শান্ত হয়ে গেছে। এমন কি যারা সেদিন সক্রিয়ভাবে আমার বিরুদ্ধতা করেছিলো তাদের মধ্যেও কোনো কোনো সহপাঠী এসে বলল: সেদিন উত্তেজনার মধ্যে তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছিলাম। তুমি সেটা মনে রেখো না।

শান্ত পরিস্থিতিতেই পরীক্ষা শেষ হলো। সে পরীক্ষা ছিলো ঢাকা বোর্ডের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা। ঢাকা বোর্ড তখন ঢাকা শহরের স্কুল-কলেজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ঢাকা শহরের বাইরের সমগ্র বঙ্গের সব স্কুল-কলেজই ছিলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে।

আমার পরীক্ষার সিট পড়েছিলো জগন্নাথ কলেজে। কেন্দ্রের কথা মনে পড়লো এই কারণে যে, সেদিন আমি বোধ হয় লজিক পরীক্ষা দিচ্ছিলাম। সেদিন দেখলাম আমি কিছু লেখার পর থেকেই একজন অধ্যাপক, যিনি পাহারা দিচ্ছিলেন হলে, আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার লেখা দেখতে লাগলেন। অল্পক্ষণ পরেই যদি তিনি চলে যেতেন তাহলে ঘটনাটি মনে দাগ কাটতো না। কিন্তু তিনি প্রায় সারা সময়টাই আমার পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন বলে মনে পড়ছে। যেন আমি নকল-টকল করতে না পারি, তার বিরুদ্ধে পাহারা। ব্যাপারটাতে প্রথমে আমি কিছুটা অস্বস্তিবোধ করলেও কিছুক্ষণের মধ্যে নিজের লেখায় মগ্ন হয়ে গেলাম। তখন বাংলা বাদে সব বিষয়ের প্রশ্নের জবাবই আমরা ইংরেজিতে দিতাম। যে-অধ্যাপক আমাকে সারাক্ষণ পাহারা দিলেন তিনি যে আমার জবাবদানের দ্রুততায় এবং জবাবের মানে বেশ সন্তুষ্ট হচ্ছিলেন তাই যেন বুঝিয়ে গেলেন একেবারে শেষ ঘণ্টা পড়ার সময়ে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে।

পরীক্ষা দিয়ে আবার চলে এলাম বড় ভাইয়ের কাছে। বড় ভাই জিগ্যেস করলেন: কেমন হবে তোমার পরীক্ষার রেজাল্ট। জিজ্ঞাসার মধ্যেও একটু খোঁচা ছিলো। ভাবটা এমন যে, পড়ার চাইতে অপড়ার কাজেই তো জুটে গেছ। কাজেই কি আর ফল করবে। আমি ছোট কথায় বললাম। পাস নিশ্চয় করব।

তিনি বললেন: আর কিছু নয়?

আমি বললাম : পরীক্ষায় পাস করা ছাড়া আর কি করা যায়?

যা হোক, ছোট-বড়র এমন সংলাপ আর বেশি এগোয় নি।

কিন্তু আমার জবাবে কোনো ক্ষোভ ছিলো না। আসলেই পরীক্ষার ফলাফলে আমার কোনো চিন্তা ছিলো না। একে তো ম্যাট্রিকে স্কুলে দেখেছিলাম মোজাম্মেলকে, যে পরীক্ষায় ভাল ফল করাকেই খারাপ মনে করতো। (মোজাম্মেলের একালের পরিচয় অনেকে জানেন। প্রখ্যাত সাংবাদিক, এককালের রাজনৈতিক দল আর.এস.পি'র নেতৃস্থানীয় কর্মী এবং ১৯৬৫ সালে কায়রোতে পিআইএ বিমান দুর্ঘটনায় নিহত। মোজাম্মেল হক আমার স্কুল সহপাঠী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু)। তাছাড়া একবার যখন ম্যাট্রিকের অঙ্কের বাধা পার হতে পেরেছি কোনো প্রকারে, টায়ে টায়ে, তখন বই পড়াতে আমায় আর আটকায় কে? আর

বই পড়ার মত সোজা কাজ আর কি আছে? অন্তত বই পড়া যে তামাক সাজাবার চাইতে সোজা, সে কথাটা আমি জীবনের পাঁচ ছ'বছর বয়সেই বুঝেছিলাম, বাবা যখন বাড়িতে মেহমান কেউ এলে ডাক দিয়ে বলতেন, করিম তামাক নিয়ে আয়। আর তখন সে হুকুমে হুঁকা জোগাড় করতে হতো, হুঁকার কল্কেতে তামাকের দলা পুরতে হতো এবং সেই তামাকে উনুন থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার তুলে ফুঁ দিয়ে দিয়ে আগুন ধরিয়ে হুঁকার মাথায় বসিয়ে মজলিশে নিয়ে হাজির করতে হতো। সে এক কঠিন পরীক্ষা। সে কঠিন পরীক্ষায় বিনা বকাবকুনিতে পাস খুব কমই করেছি। তখনি বুঝেছিলাম এর চাইতে কত সহজ কোরানের বাণীর সুললিত কাব্যিক অনুবাদ পড়া, আর তা পড়ে মা, বোন, চাচা, চাচীকে শোনানো। কত আকর্ষণীয় হাসান-হোসেনেব করুণ কাহিনী পড়া, 'বিষাদ সিন্ধু' থেকে। আহা ইমাম হোসেনের জীবনের শেষ মুহূর্তটি কি করুণ, কি নিদারুণ। 'সীমাব ইমাম হোসেনের বক্ষে চাপিয়া বসিয়াছে। সে হোসেনের কণ্ঠে খঞ্জর চালাইতেছে। কিন্তু খঞ্জর হোসেনের কণ্ঠ ভেদ করিতেছে না। ইমাম হোসেন বলিলেন: ভাই সীমার এ জায়গায় তুমি কিছু কবিতে পারিবে না। এ জায়গায় হজরত মুহম্মদ মোস্তফা, আমার নানাজান আমাকে চুম্বন কবিযাছিলেন।' 'আর ফোরাত নদীর তীরে এক ফোঁটা পানি না পেয়ে ইমাম হোসেনের পরিবার-পরিজন' বিশেষ করে শিশুদের কি করুণ মৃত্যু! পড়তে পড়তে সত্যি গলা ধরে আসত, চোখে পানি জমত। বাড়ির চাচা, চাচী, বড় ভাই, এরা কেবল ডেকে ডেকে আদব করে বলতেন : করিম তুইতো সুন্দর পড়িস। পড়তো আবার সেই জায়গাটি।

তাই পরীক্ষার ভয় নয়, পড়ার আনন্দই আমাকে আনন্দিত করতো। এই পরীক্ষা পাসেব সুযোগেই যখন গ্রামের কৃষক পরিবারের একটি ছেলে আমার পক্ষে ঢাকা কলেজের প্রাসাদ আর হোস্টেলের পাকা ভবনকে নিজের বাড়িতে পরিণত করা সম্ভব হলো তখন আমার চেতন-অবচেতনে আর আনন্দেব সীমা রইল না। কলেজ আর হোস্টেল এবং তার শিক্ষকবৃন্দ, সহপাঠী বন্ধুরা, হোস্টেলের ওয়ালীউল্লাহ সাহেব, এসিসট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট কফিল উদ্দিন সাহেব এঁরা হয়ে দাঁড়ালেন আমার এই বৃহত্তর এবং নতুন পরিবাবেব আত্মীয়বর্গ। ক্লাস এইট কিংবা নাইন থেকে হোস্টেল জীবনযাপনে অভ্যস্ত আমি তাই কোনদিনই কলেজ আব হোস্টেল জীবনকে বৈরী বলে ভাবতে পারি নি। এত যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঢাকাব বুকে বয়ে গেল, কোনোদিন তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে কোথাও যেতে মন চায় নি! ঢাকার মধ্যে থেকেই ঢাকাকে উপভোগ করার একটি বোধ ছিল মনে।

কয়েক মাস পরে পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুলো। তার খবর পেলাম বড় ভাইয়ের চাকরিস্থানের বাসায় বসে। ঢাকা থেকে আমি তখন দূরে। নিরুদ্বিগ্ন আমার নামে বড় ভাইয়ের 'কেয়ার অবে' হঠাৎ একদিন একটি টেলিগ্রাম এলো ঢাকা থেকে। পাঠিয়েছেন ইউনিভার্সিটির অনার্স ক্লাসের ছাত্র নাজমুল করিম। তাঁর সঙ্গে ইতিমধ্যে সম্পর্কটি আমার অগ্রজ-অনুজের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। টেলিগ্রামে তিনি আমার পরীক্ষার ফল জানিয়েছেন। বুঝলাম আমার পরীক্ষার ফলের ব্যাপারে আমার চাইতে তাঁরই আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিলো অধিক। সে টেলিগ্রামের মর্ম আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত ছিলো: কেবল আমার বড় ভাইয়ের জন্য নয়। আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত ছিলো খোদ আমার জন্যও।

টেলিগ্রাম করেছেন নাজমুল করিম : 'ইউ হ্যাভ স্টুড সেকেন্ড ইন দি বোর্ড। হারটি কনগ্রেচুলেশনস': তুমি বোর্ডে সেকেন্ড হয়েছ। আমার অভিনন্দনও নিও। নাজমুল করিম কোনোদিন আমাকে তুমি বলে ডাকেন নি। বলেছেন, 'আপনি'। অথচ আমি তাঁর বয়োকনিষ্ঠ এবং অনুজপ্রতিম। কিন্তু সেকালে সহপাঠীও সহপাঠীকে খুব ঘনিষ্ঠ না হলে আপনি বলে সম্বোধন করতো। কিন্তু আপনি বললেও আমার জন্য নাজমুল করিমের স্নেহ ছিলো অপার। তিনি আজ অকালে প্রয়াত। সেদিনের এই স্মৃতিতে স্বাভাবিকভাবে আমার মনে একটি আবেগের সৃষ্টি হচ্ছে।

টেলিগ্রাম পেয়ে বড় ভাইয়ের আনন্দ আর ধরে না। তিনি অমনি তাঁর পাড়া-প্রতিবেশীকে খবর দিলেন, যেন আমি মস্ত একটা কাজ করেছি। বিকেলে মসজিদে মিলাদেরও আয়োজন করলেন।

তার কয়েকদিন পরে ঢাকায় পাঠাবার সময়ে হুকুম দিলেন : 'ইংরেজিতে কিন্তু অনার্স নিবে।'

এ হুকুম তিনি করতে পারেন। কি আশ্চর্য অক্লেশে ইংরেজি লিখতে পারেন তিনি। নিজে অনার্স পড়তে পারেন নি। বরিশালেব বি.এম কলেজ থেকে বি.এ পাস করে এম.এ পড়তে এসেছিলেন ইংবেজিতে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে, ১৯২৭ সনে। কিন্তু সাংসাবিক দৈন্যের কাবণে একটি চাকরির সুযোগ পেলে সেই পড়া আর শেষ করতে পাবেন নি। অথচ পুরোনো সকল শিক্ষক আর সহপাঠীদের কাছেই তাঁর প্রশংসা শুনেছি: 'আহ! মৌজে আলী! খুব ভালো ছেলে ছিলো সে'। তাই বড় ভাইয়ের হুকুম ছিলো ইংরেজিতে অনার্স নিতে। আমি প্রথমে ইংরেজিতেই অনার্স নিয়েছিলাম। পরে তাকে বাদ দিয়ে দর্শন। কিন্তু সে কাহিনী পবে বলা যাবে। পরীক্ষায় ভাল ফল করলে ব্যাপারটা যে কেবল ব্যক্তিগত এবং পরিবারগত নয়, সেটা ব্যক্তি এবং পরিবারকে ছাড়িয়ে প্রতিষ্ঠান, এমনকি বৃহত্তরভাবে সম্প্রদায়েব ব্যাপার হযে দাঁড়াতে পাবে, কিংবা সেদিন সেরূপ দাঁড়াতে সেটা বুঝলাম, এই মহাকাণ্ড সেকেন্ড হওয়ার ব্যাপাবটির প্রতিক্রিয়া দেখে, ঢাকা ফিরে এসে। কলেজে যেতে ইংবেজি অধ্যাপক পি.কে রায় গর্বের সঙ্গে হাত ধরে অফিস ঘবে নিয়ে গেলেন। বললেন অধ্যক্ষ এবং অপর অধ্যাপকদেব : দেখুন, আমিই একে হদিস কবেছিলাম। আমি জানতাম ও ভাল করবে। ও আমাদের কলেজের নাম রেখেছে। কথাটা নৈর্ব্যক্তিকভাবে দেখলে কিছুটা সত্য বটে। সেকালে লেখাপড়া আর পরীক্ষাতে সত্যেন ভদ্রের অধ্যক্ষতায় জগন্নাথ কলেজই ছিল প্রধান। পরীক্ষায় জগন্নাথ কলেজই ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড হতো। কিন্তু '৪২ সনের পরীক্ষায় ঢাকা কলেজ কলা শাখায় সেকেন্ড 'পোস্ট' দখল করেছে, এটা কি কম কথা। এ প্রায় ফুটবলের কম্পিটিশনের ব্যাপার: কলেজে কলেজে। কলেজের দল জিতলো তো কলেজের নাম। ব্যাপারটাতে আমার বেশ মজাই লাগছিলো। কিছুটা অজাত শত্রুরই ব্যাপার ছিলো একটু। সবাই খুশি হলো। এমন কি আশরাফও, সৈয়দ আলী আশরাফ। আসলে অধিক ভালো ছাত্র আশরাফ আর অজিত দে-ই ছিলো। আশরাফ ইংরেজিতে কত দক্ষ। পাবিবারিক পরিবেশও উচ্চশিক্ষা আব সাহিত্যের। সৈয়দ আলী আহসানের অনুজ। অজিত দেও ইতিহাসে কত ভালো নম্বর পেত ক্লাসে আর কলেজের পরীক্ষায়। ওরা ক্লাসে

বসত ফার্স্ট বেঞ্চে। একেবারে অধ্যাপকের চোখের সামনে। আর আমি বসতাম পেছনে, অধ্যাপকদের চোখ এড়িয়ে, যেখানে বসে পাশের বন্ধুর সঙ্গে একটু খুনসুটি করতে পারি আর স্যারকে দু'একটা বেয়াড়া প্রশ্ন করতে পারি। (এটা বুঝতে পারছি, এ সমস্ত গোপন কথা এই বয়সে, বিশেষ করে মাস্টারি করার অবস্থায়, নিজের ছেলেমেয়ে আর ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে প্রকাশ করা বুদ্ধির কাজ নয়। তবু কথার টানে কথা আসছে, স্মৃতির টানে স্মৃতি। বাস্তব বিবেচনাবোধ আর থাকছে কোথায় ?)। সবচেয়ে খুশি হলো দেখলাম লাস্ট বেঞ্চের হাসিখুশি মেজাজের সুঠামদেহী কামালউদ্দিন। ওরই বেশি টান ছিলো আমার উপর। ওর ডাক নাম ছিলো 'ঠাণ্ডা'। ওই-ই অনেক সময়ে কিছুটা সামনের বেঞ্চ থেকে টেনে আমাকে একেবাবে পেছনেব বেঞ্চে নিয়ে যেতো। 'আপনি' সম্বোধন করতো না। 'তুমিও' না। করত 'তুই' বলে। বলত: 'তোর জায়গা সামনে নয়। সামনে বসবে 'গুড বয়েজ'রা। তুই বসবি আমাদেব কাছে আর দেখে দিবি আমাদের খাতা। তুই পড়া নিবি আমাদের। ব্যাপারটা প্রায় তাই ছিলো। কামাল, ওবা যে লেখাপড়ায় খারাপ ছিলো তা নয়। ওরা সমগ্র জীবনটাকে অধিকতর স্বাভাবিকভাবে নিতো। আমি যখনি পারতাম আন্তরিকভাবে ওদের সাহায্য করতাম। বিশেষ করে সেই কামালউদ্দিনের চেহারা আব কথা এত বছর পরেও মনে ভেসে উঠছে। ভেসে উঠছে একটা বেদনাবোধের সঙ্গে। কামালউদ্দিন নাকি মারা গেছেন। একদিনের কথা মনে পড়ে। আমি তখন আমার পরবর্তী জীবনে, এক পর্যাযেব রাজবন্দিত্ব শেষ করে বেরিয়েছি, পাকিস্তান আমলে। ঘটনাচক্রে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য হয়েছি, ১৯৫৫ সনে। এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন পথে দেখা কামালউদ্দিনের সঙ্গে। দেখা মাত্র একেবারে জোর করে রিকশায় উঠিয়ে নিজের বাসায় নিয়ে মার কাছে হাজির করে বলল: 'দেখ মা, কাকে নিয়ে এসেছি। আমার কলেজের বন্ধু, সবদার ...।' কামালের বাবা তখন মারা গেছেন। কিন্তু সেদিন অমনি করে ধরে নিয়ে মার কাছে হাজির করে যে পরিচয় আমার সে দিয়েছিলো এবং মা স্নেহযত্নে যেভাবে আপ্যায়িত করেছিলেন এবং তাতে কামালউদ্দিনের আন্তরিকতাব যে প্রকাশটি ঘটেছিলো, তাতে আমি অভিভূত হযে গিয়েছিলাম।

কেবল কলেজে নয়, নাজমুল করিম, দেখলাম, তাঁর দলেব একটি ছেলের এমন ভাল ফলকে তাঁর প্রতিপক্ষীয়দের কাছে একটি 'চ্যালেঞ্জ' হিসেবে উপস্থিত করলেন। দেখ, আমার ছেলেরাই ভালো করে, তারা খারাপ করে না। হোস্টেলের এসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট কফিলউদ্দিন সাহেব সত্যই আন্তরিকভাবে আমাদের, অর্থাৎ কেবল আমার ফলে নয়, আমাদের 'দুষ্ট' দলটির লুৎফুল করিম, আবুল কাসেম, মোজাহার—সকলের রেজাল্টেই খুশি হলেন। সুপারিনটেনডেন্ট ওয়ালীউল্লাহ্ সাহেব আমাদের ওপর একটু খাপ্পাই ছিলেন। আমাদের প্রতি তাঁর সব আচরণ কফিল উদ্দিন সাহেবের কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হতো না। তাই আমাদের জন্য কফিল উদ্দিন সাহেবের যথার্থই একটি মানসিক সহানুভূতি ছিলো।

ঢাকা কলেজের স্মৃতির কথা এখানে শেষ করতে গিয়ে নিজের মনে কেবল একটি বোধই জাগছে। যে কলেজ একদিন আমার অপরিচিত এবং বিস্ময়ের জগৎ বলে বোধ হতো, সে কলেজ, তার হোস্টেল এবং পরিবেশ আর একদিন যথার্থই আমার অস্তিত্বের অংশ

হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। ঢাকাতে তখনো কলেজের পরীক্ষা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশে কলেজের সঙ্গে কোনো বিচ্ছেদবোধ জাগত না। কারণ ঢাকাতেই ইউনিভার্সিটি। আর আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়তে গিয়ে যে 'অনভিজাত' তথা কমনারের হল অর্থাৎ ফজলুল হক হলে জায়গা নিলাম সে ফজলুল হক হলও আমার অপরিচিত ছিলো না। সে পরিচয়ের সূত্র ছিলেন নাজমুল করিম এবং তাঁর অপর সহপাঠীরা। এবং তাঁর সহপাঠীদের অন্যতম ছিলেন রবি গুহ।

সিনেমা বিশারদ

এই স্মৃতিচারণের একটি জায়গায় সে যুগে সারারাত জেগে সিনেমা দেখার 'পাপের' কথা যখন আজকের নিজেব ছেলেপিলের কাছে একবার বলেই ফেলেছি তখন সেকালে কত সিনেমা দেখেছি তার একটি লিস্টিই দিয়ে দিই। তালিকাটি পেলাম ছেঁড়াখোঁড়া প্রায় ৪৫ বছর পুরোনো একটি খাতার পৃষ্ঠায়। এ লিস্টি দেখে আমার নিজের তো এখন গর্বই হয়। আব কিছু না হোক, সেদিনকার একজন 'সিনেমা এক্সপার্ট' বলে তো নিজেকে দাবি করতে পাবি। কিন্তু তার চাইতেও মূল্যবান কথা, রক্ষিত এই লিস্টি থেকে বাংলা ছায়াছবির সেই কৈশোরকালের চিন্তাভাবনা, আকর্ষণ রুচির কিছু শিরোনাম একালের মানুষ পেতে পারে। সেজন্যই তালিকাটির এই উদ্ধৃতি। সেকালে যে দু'একটি ইংরেজি ছবি আসত তার নামও দেখছি খাতাটিতে মেলে। তাই তাও তুলে দেয়া হলো। সংখ্যাগতভাবে প্রায় 'সেঞ্চুরি'। সংখ্যার ক্রম না দিয়ে কেবল শিরোনামগুলো দিচ্ছি: মুক্তি, চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি, দিদি, অভিনয়, টারজানকি বেটি, খনা, অভিজ্ঞান, অচ্ছুৎ কন্যা, রিক্তা, দেবদাস, গৃহদাহ, পুকার, সাপুড়ে, গোরা, পরপারে, পায়ের ধুলো, পথের শেষে, বড়দিদি, বজত জয়ন্তী, অধিকার, অভিনেত্রী, শুকতারা, জীবন-মরণ, দুশমন, যখেব ধন, সাথী, পথভুলে, ঘরকি রানী, ডাক্তার, তরুণী, কলঙ্ক ভঞ্জন, মাদার ইন্ডিয়া, দি লায়ন হ্যাজ উইংস, লাইফ অব এমিল জোলা, দি ম্যান দে কুড নট হ্যাং, ক্রিমিন্যাল অব দি এযার, টাইফুন, শাপমুক্তি, দেশের মাটি, হাতে খড়ি, শর্মিষ্ঠা, দেবযানী, সোনার সংসার, রেবেকা, স্বামী-স্ত্রী, ভালবাসা ও মায়ামৃগ, শিবরাত্রি, পুনর্মিলন, পরিচয়, খাজাঞ্চী, বিজয়িনী, গ্রহের ফের, চাণক্য, অমরগীতি, সার্জেন্ট ম্যাডেন, দি বিস্ট অব বারলিন, পথিক, ঠিকাদার, পরশমণি, রমা, কয়েদী, জেইলর, রাজকুমারের নির্বাসন, দি রেইনস কেইম, দি কোর্ট ড্যান্সার, রাজনর্তকী, মায়ের প্রাণ, উত্তরায়ন, আজাদ, পড়শী, প্রতিরোধ, অভয়ের বিয়ে, স্কুল ডেজ অব টম ব্রাউন, গ্রেট কম্যান্ডমেন্ট, কঙ্কণ, জীবন প্রভাত, দি বার্থ অব এ বেবী, নন্দিনী, বন্দী, শেষ উত্তর, দি ডিফিট অব দি জারমানস নিয়ার মস্কো, প্রিয় বান্ধবী, ভীষ্ম, বন্ধন।

এবার গুণে দেখুন! না! প্রায় ৪৫ বছর আগেকার জীবনের এদিক-ওদিকে দৃষ্টিক্ষেপকারী সেই কিশোর ছাত্রটিকে আমার খুব যে খারাপ লাগছে, এমন বলতে পারিনে। বরঞ্চ একটু মমতা জাগছে এবং কৃতজ্ঞতাও। অন্তত তার খাতায় সিনেমা দেখার 'পাপের' এই সাক্ষ্যটি তুলে রাখার জন্য।

সোমেনের হত্যাকাণ্ড এবং সেকালের এক কিশোর মনের প্রতিক্রিয়া

একালের প্রগতিশীল তরুণ সাহিত্যকর্মীদের কাছে সোমেনকে পরিচিত করার দায়বদ্ধতা থেকে আমি কিছু যে না লিখেছি, তা নয়। কিন্তু সেকালের কথা আমার স্মৃতিতে তত সজাগ নেই। সে এখন ঝাপসা হয়ে গেছে। ১৯৪২ সনের ৮ মার্চ, অসামান্য সম্ভাবনার আকর, রেলশ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক, তরুণ লেখক সোমেন চন্দ একটি শ্রমিক মিছিল পরিচালনাকালে প্রতিপক্ষীয়দের দ্বারা নির্মমভাবে নিহত হয়েছিলেন। আমি তখন আই.এ পরীক্ষা পাস করে ঢাকা ইউনিভার্সিটির দবজায় মাত্র পা রেখেছি। প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সাথে তখনো হয়ত হৃদ্যতা ততো তৈরি হয় নি। সোমেনের নির্মমভাবে নিহত হওয়ার ঘটনাই হয়তো চুম্বকের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের মুসলিম প্রগতিশীল সাহিত্যকর্মীদের আকর্ষণ করে নিয়ে গিয়েছিলো প্রগতিলেখক সঙ্ঘের অনুষ্ঠানে, আলোচনায়, ক্রিয়াকর্মে। আমার ভাগ্য যে, আমিও সে আহ্বানের বাইরে সেদিন থাকতে পারি নি। কিন্তু ঘটনা হিসেবে তার কোনো স্মৃতিকে টেনে তুলতে পারছিনে। আকস্মিকভাবে দেখলাম, কলকাতা থেকে এ যুগে, ১৯৭৩ সনে দিলীপ মজুমদারের সম্পাদনায় দু'টি খণ্ডে 'সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনা সমগ্র' নামে যে সঙ্কলনটি প্রকাশিত হয়েছে তাব একটির মধ্যে সেকালে সোমেনের গল্পসংগ্রহ 'সঙ্কেত'–এব ওপর আমার একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। প্রবন্ধটির পুনর্মুদ্রণের ভূমিকায় সম্পাদক লিখেছেন : "প্রতিবোধ পত্রিকায় (১৩৫০ : ১৯৪৩: সোমেন স্মৃতি সংখ্যা) সরদাব ফজলুল করিম 'সঙ্কেত' নামে যে প্রবন্ধটি রচনা করেন সেই প্রবন্ধেও 'সোমেনের সঙ্কেত ও অন্যান্য গল্প' সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি এই কারণে উল্লেখযোগ্য, এতে একজন সমসাময়িক মুসলিম লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত। অসাম্প্রদায়িক মানবপ্রেমিক কমিউনিস্ট সোমেনকে তাঁরাও চিনতে পেরেছিলেন। ভালোবেসেছিলেন তাঁকে।''

সেকালের একটি কিশোরের প্রতিক্রিয়ার স্মারক হিসেবে লেখাটির খানিকটা গুরুত্ব এখনো আছে বলেই সম্পাদক এটি পুনর্মুদ্রিত করেছেন। লেখাটির সাহিত্যিক গুণাগুণের কথা নয়। সেই ইতিহাসের আভাস হিসেবে লেখাটিকে এখানেও প্রকাশ করা যায়।

"১৯৪২ সনের মার্চ মাসে সোমেন চন্দ যখন নিহত হয়, আমাদের মুসলমান ছাত্র সমাজের বৃহত্তর অংশ তখন নিজেদের নেতৃবৃন্দের মান–অপমানের পরিমাণ নির্ধারণ লইয়া ব্যস্ত। কোনো বিশিষ্ট নেতাকে পুষ্পমাল্য প্রদান বা অপর কাহাকেও কালো পতাকা প্রদর্শন, ইহাই ছিলো আমাদের রাজনীতির তখনকার বৈশিষ্ট্য। আমাদের সেই চেতনাহীন অবস্থাতে সোমেন চন্দের মৃত্যুকে আমরা হয়তো ঠিকভাবে দেখিতে পারি নাই। এমনি সময়ে শুনিয়াছিলাম সোমেনের মৃত্যুর কথা। ঢাকা শহরের চির পুরাতন দাঙ্গা ব্যতীত সেইদিন তাহাকে কিছু ভাবিতে পারি নাই। কিন্তু তথাপি সেই অবস্থাতেও পরিচিত–অপরিচিত কাহারো কাহারো মুখে সোমেন চন্দের মৃত্যু–সংবাদের সাথে বক্রহাসি দেখিয়া সন্দেহ জাগিয়াছিলো।

'তাহার পরে বাহিরের আলোবাতাসে আসিলাম—বক্রহাসি সেদিন কাহারা হাসিয়াছিলো, কেনো হাসিয়াছিলো পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম। সোমেনের কাহিনীতো পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন নহে। জীবনের কল্যাণের বিরোধী গুণ্ডার দল অনেক সোমেনকে হত্যা করিয়াছে—কিন্তু তাই বলিয়া জীবনের জয়কে ওরা রোধ করিতে পারে নাই। সেদিনও কাপুরুষ ফ্যাসিস্ত গুণ্ডার দল সোমেনকে হত্যা করিয়া সোমেনের জীবনের আদর্শকে নষ্ট করিতে পারে নাই। তাই আজ যদি দিনের আলোতে তাদের কারুকে দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে জোর গলায বলিতাম : সোমেনের সঙ্কেতধ্বনি স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে— তোদের দিন শেষ হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, দিনের আলোয় আজ আর উহারা বাহির হয় না—পৃথিবীর জনগণের অগ্রগতির প্রতিটি শক্তিতরঙ্গ ওদের বুকে শেল হানিয়াছে–চোরা গর্তে উহারা আত্মরক্ষার পথ খুঁজিয়াছে। তাই আজকাল নিশাচরের বেশে ওদের দুর্বল ছোবল ওদের বিলোপের আভাস দেয়।

"সোমেন চন্দ যখন মারা যায় তখন তাহাকে চিনিতাম না—চিনিবার পর্যাযে তখন ছিলাম না। সোমেনকে চিনিলাম তাহার 'সঙ্কেত ও অন্যান্য গল্প' প্রকাশ হইবার পরে। বইখানা হাতে লইতে প্রথমে সঙ্কোচ ছিলো যথেষ্ট– অবহেলাও সুস্পষ্ট। বাংলাদেশের বাজার বাংলা গল্প উপন্যাসে ভরিয়া গিয়াছে—এত বই! কত আর পড়া যায়? আর নিছক একই সুরের বিভিন্ন দুর্বল প্রকাশ। তাই সোমেনের 'সঙ্কেত' হাতে আসার পরেও অনেকদিন যাবৎ অপঠিত হইয়া পড়িয়াছিলো।

"তাহার পর সত্যই 'সঙ্কেত' একদিন পড়িতে আরম্ভ করিলাম। 'রাত্রিশেষ' সঙ্কেতের প্রথম গল্প। বৈষ্ণবদের আখড়ার কাহিনী। পড়িতে আরম্ভ করিয়া তেমন ভাল লাগিল না। পড়িতে পড়িতে কিছুদূর যাইতে একখানে টের পাইলাম, নিজের অজ্ঞাতে ভাল লাগিতে আরম্ভ করিয়াছে। সোমেন একস্থানে চাঁদিনী রাতের বর্ণনা করিতেছে। '... আজ এতোক্ষণে মাত্র চাঁদ উঠিয়াছে। বনানী কথা বলিতে শুরু করিয়াছে। পায়ে হাঁটা সাদা পথ টুকরা জ্যোৎস্নায় মনোরম। সৌন্দর্য আহরণের নেশায় চোখ বুজিয়া আসে—পা ফেলা মন্থর—দেহ শিথিল ...' দেখিলাম আমার অবহেলায় ভাঙন ধরিয়াছে। মনে মনে ভাবিলাম কযেকটি মাত্র লাইনে বেশ তো বর্ণনাটি দিয়াছে। পিছনের পাতা উল্টাইয়া সোমেনের জন্ম–মৃত্যুব তারিখটা দেখিতে ইচ্ছা হইলো। দেখিলাম জীবনের পরিধি মাত্র বাইশ বছর। চমক লাগিল। এ গল্প তাহা হইলে নিশ্চয়ই ষোল সতের বছব বয়সে লেখা। আহা, লেখাটার যদি তারিখ থাকিত। গল্পটা শেষ করিলাম। কাহিনীর তেমন কোনো বৈশিষ্ট্য নাই, কিন্তু সংযত হাতের প্রকাশ–ক্ষমতা যেভাবে গল্পটার শেষের দিকে এক জায়গায় সোমেন গাঢ় সন্ধ্যার নিস্তব্ধতার বর্ণনা দিয়াছে—'... বাহিরে অন্ধকার আরো গাঢ়তায় চাপিয়া আসিয়াছে। একটানা ঝিঁঝি পোকার শব্দ। কিছুদূরে কামার বাড়ির লোহা ঠুকিবার আওয়াজ ...' চমৎকার লাগিল। লাইন তিনটি পড়িতে যাইয়া আমাদের গ্রামের বাড়ির বিশিষ্ট একটা জায়গার কথা মনে পড়িল, যেখানটায় দাঁড়াইয়া সন্ধ্যার সময়ে কামার বাড়ির লোহা ঠোকার শব্দ ঠিক শোনা যায়। তিন লাইনে সোমেন সব ছবিটা আঁকিয়া দিল। আজ আবার লাইন তিনটার পানে চাহিয়া সোমেনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, যে সম্ভাবনাকে গুণ্ডা পশুর দল

বর্বরভাবে হত্যা করিল, সেই সম্ভাবনার ছবিকে স্পষ্ট দেখিতে পাই। দ্বিতীয় গল্প 'স্বপ্ন' ও 'রাত্রি শেষ'–এর সুরেই লেখা—কিন্তু এখানে গল্পটির মধ্যে উপমা শক্তির নতুনত্বের যেমন খবর পাইলাম, তেমনি তাহার দরকার মত কাহিনীর মধ্যে অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টির অদ্ভুত হাতেরও স্পর্শ অনুভব করিলাম। এই গল্পে একখানে সোমেন রাত্রিকে বলিয়াছে 'সাপের দেহের মত পিচ্ছিল নিস্তব্ধ'। এবার বইখানা দবদের সহিত জোর করিয়া ধরিলাম—সোমেন গতানুগতিক নয়, সোমেন নতুন পথের যাত্রী।

"তাহার পরে 'একটি রাত'। প্রায় এক নিশ্বাসে শেষ করিয়া কেবল খুঁজিতে লাগিলাম যদি গল্পটার রচনার তাবিখটা পাইতে পারি—যদি আগের দুইটা গল্পের সাথে এই গল্পেব সময়ের ব্যবধানটা ও অবস্থা নিরূপণ কবিতে পারি। সেদিন পারি নাই। আজো জানি না সোমেন 'রাত্রি শেষ' ও 'স্বপ্ন' কবে লিখিয়াছিলো—ইহার পবে তাহার মনে ভাবের বন্যা কিভাবে বহিয়াছিলো। সঠিক জানিতে পারি নাই। কিন্তু আভাস পাইযাছি। শ্রীযুক্ত নির্মল ঘোষকে লিখিত সোমেনের যে ক'খানি চিঠিপত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একখানে ১৯৩৮ সনের শেষের দিকে সোমেন এই বলিয়া লিখিল: 'গ্রামের অভিজ্ঞতা আমার প্রচুব, এমন কী যা কেন্দ্র করে শরৎচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে অনেকেই কতগুলো Sweet উপন্যাস রচনা করেছেন, বৈষ্ণবদের সেই আখড়ার সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত আমি। কিন্তু ওসব পুরানো হয়ে গেছে—এখন নতুন দৃষ্টিভঙ্গির দরকার। বছরখানেক আগে সেই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির কোনোই পথ খুঁজে পেতাম না—এখন কতকটা পেযেছি বলে মনে হচ্ছে।' ১৮ বছর বয়সে সে এই চিঠি লিখিয়াছিলো। কাজেই এরও দুই এক বছর আগে হয়ত লিখিয়াছিলো 'স্বপ্ন' ও 'রাত্রি শেষ'। তাই আজ কেবল সোমেন সম্বন্ধে মনে হয়, জীবনের গতি কত সবল ও দ্রুত হইলে ঐ সময়ে এই বয়সে, এই দৃষ্টিভঙ্গি রূপ পাইতে পারে। ... গবিব মধ্যবিত্ত ঘবের ছেলে সুকুমাব। সাম্যবাদে বিশ্বাসী সে—তার কর্মীও। ঘরে শুধু বৃদ্ধা মা। ঘরের অভাব-অভিযোগ কত স্পষ্ট— কিন্তু সুকুমারেব কর্মে বাধা নাই—'সুকুমারের কাছে কতো লোক যে আসে তার ইয়ত্তা নেই। সাবাদিন ডাকাডাকি লেগেই আছে। সর্বদা যারা আসে তাদের মধ্যে গ্লাস ওয়ার্কসের সামসুব একজন...।' বৃদ্ধা মা ছেলেব কাজকর্ম দেখিযা চোখের জল ফেলেন—কিন্তু ছেলের জন্য তৃপ্তি ও তাদের অনুভূতি তাহার মনকেও ভরিয়া তোলে। ...এই সুকুমারের জীবন কাহিনী—বিশেষ করিয়া তাহার একটি রাতেব কথা, যে রাত্রিতে পুলিশ আসিয়া সুকুমারের বাড়ি ঘেরাও করিল। তাই সোমেন শুধু নতুন পথেব যাত্রীই ছিলো না—সে ছিলো নতুন দিনের অগ্রদূত—আমাদের দেশে তার প্রথম বীর সৈনিক। ইহার পরের গল্প তিনটি 'সঙ্কেত', 'দাঙ্গা', 'ইঁদুর'।

'এক রাত্রি'তে যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনের সাক্ষাৎ পাইলাম; শেষের এই গল্প তিনটি তাহারই উন্নততর ও পূর্ণতর প্রকাশরূপ হইয়া রহিয়াছে। 'সঙ্কেত' ও 'ইঁদুর' দুইটিই বড় গল্প। 'ইঁদুর' সম্বন্ধে আজ আর কিছু বলিবার অপেক্ষা রাখে না। দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকবৃন্দ অসঙ্কোচে শিল্পের উচ্চাসন প্রদান করিয়াছেন। সোমেনের শক্তির প্রমাণের ইহার পরে আর প্রয়োজন হয় না। 'ইঁদুর' ইংরেজিতে অনূদিত হইয়া আজ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্য ক্ষেত্রে আন্তঃপ্রাদেশিক গল্পে পরিণত হইয়াছে। ঢাকার সোমেন আজ শুধু বাংলার

সোমেন নয়—সে আজ ভারতের সোমেন। 'ইঁদুর' গল্পের প্রথম পাঠে আমার মনে যে তৃপ্তির শিহরণ জাগিয়াছিলো, তাহাকে প্রকাশ করিয়া বলিবার ক্ষমতা আমার জন্মায় নাই। তাহার কতকগুলি জায়গা ভুলিতে পারি না—কেবল পড়িতে ভাল লাগে। গরিব মধ্যবিত্ত পরিবার। সোমেনের নায়ক গরিব মা-বাপের মধ্যে সন্ধ্যার পূর্বে মান-অভিমান হইয়াছিলো! গভীররাত্রে ইঁদুরের উৎপাতের মধ্যে তাহাদের মান ভাঙনের পালা আরম্ভ হইয়াছে। সোমেনের নায়ক এইখানটায় বলিতেছে: 'বাবা মাকে ডাকলেন নাম ধরে। ভারি চমৎকার মনে হলো—মনে মনে বাবাকে আমার বয়স ফিরিয়ে দিলাম—আর আমার প্রতি ভালবাসা কামনা করতে লাগলাম তার কাছ থেকে...।' কিন্তু এই স্থানটি! সোমেনের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সংযত নায়কের মনের অবস্থার কি অভিনব প্রকাশ: ' মনে মনে বাবাকে আমার বয়স ফিরিয়ে দিলাম....।' সোমেনও ছিলো গবিব মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। মধ্যবিত্ত পরিবারের দুঃখময় কাহিনী—সেই দুঃখের সংসারেও নব জীবনের যে স্ফুলিঙ্গ তৈরি হইতেছে, তাহার এমনি সরস মধুর সাহিত্যিক প্রকাশ আর কি কোথাও পাইয়াছি? তারপর সেইখানটা, সোমেনের নায়ক (একি সোমেন নিজে?) রেল ইউনিয়ন হইতে ফিরিয়া আসিতেছে—মজুর, ইয়াসিন, সুরেন—সোমেনের আপনার জনের মধ্য হইতে সোমেনের নায়ক সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরিতেছে: 'আমি ফিরে এলাম। সাম্যবাদের গর্ব—তার ইস্পাতের মতো আশা তার সোনার মতো ফসল বুকে করে আমি ফিরে এলাম ...।'

'সঙ্কেত' গল্পটিকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বিচার করা প্রয়োজন। 'সঙ্কেতে' সোমেনের সাহিত্যিক শক্তির কতখানি প্রকাশ হইয়াছে তাহাই একমাত্র বিচার্য নহে। কিন্তু সেদিক দিয়া বলিতে গেলেও গ্রামের অধিবাসী ও তাহাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তাহার জ্ঞানের পরিচয় ও তাহার সাহিত্যিক প্রকাশ 'সঙ্কেতে' আছে। কিন্তু সঙ্কেতের অপর যে দিকটা, সে আমাদের দেশের সর্বহারা মজুর ও কিষানদের জাগরণের সঙ্কেতধ্বনির প্রকাশ। ...কোন মিলের শ্রমিকরা ধর্মঘট করিযাছে। মিলের মালিক তাহাদের ধর্মঘট শক্তিহীন কবিয়া দিবার জন্য দূর গ্রাম হইতে লোভ দেখাইয়া কৃষকদের লইয়া আসিয়াছে। নতুন সংগৃহীত শ্রমিকগণ মিলের মধ্যে ঢুকিতে যাইতে কলের ধর্মঘটি মজুরগণের নেতা তাহাদের বুঝাইয়া বলিতেছে যে, যেন তাহারা তাহাদেরই ভাইদের মুখের ভাত কাড়িয়া না লয়—দুঃখ-দুর্দশা তাহাদের উভয়েরই সমান—উভযের উপরই শোষণ সমানভাবে চলিয়াছে—মিলের ম্যানেজার হতভম্ভ হইয়াছে কি করিতে সে কি করিল? শ্রমিকের শক্তি সে আরো জোরালো করিয়া দিলো। সোমেনের 'সঙ্কেত', কৃষক মজুরের একতাবদ্ধতার যে সঙ্কেত আমরা আমাদের দেশে পাইতেছি তাহারই প্রকাশ।

'দাঙ্গা' সম্বন্ধে কোনো বিশেষণই বোধ হয় যোগ্য হইবে না। ঢাকা শহরের ১৯৪০-৪১ সনের দাঙ্গার সময়ে প্রায়ই ঢাকাতে ছিলাম। সোমেনের 'দাঙ্গা' পড়িয়া শেষ করিয়া আবার সেই অবস্থা হুবহু মনে পড়িল—সেই 'আল্লাহু আকবর' 'বন্দেমাতরম'-এর মুহুর্মুহু ধ্বনি—বাড়িকে বাড়ি পোড়াইবার সেই অমানুষিক দৃশ্য। সোমেনের এই গল্প সেই সময়ে হয়তো কোথাওপ্রকাশ হয় নাই—হয়তো এই বইতেই ইহার প্রথম প্রকাশ—নচেৎ দেশের সেই দুর্দিনে বাংলার সাহিত্যিক জগৎ ঢাকার অবস্থা সম্বন্ধে নিছক নিস্তব্ধ! প্রতিবাদের শব্দ

কাহারো লেখনী হইতে তখন বাহির হয় নাই—কোন সমাজেরই না—না হিন্দু, না মুসলমান। হয়তো একমাত্র সোমেনের হাত হইতে বাহির হইয়াছিলো সমবেদনা ও প্রতিবাদের এই তীক্ষ্ণবাণ। 'দাঙ্গা'র একটা স্থান—সোমেনের নায়ক অশোক দাঙ্গার বিরোধিতা করে, তাহাতে তাহার ছোট ভাই অজয় ক্ষেপা: অজু কর্কশ স্বরে বললে, 'তোমরা তো বলবেই'—আবার মৃদু স্বরে—'তোমরা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়।' নায়ক অশোক জবাব দিল : 'আমরা ইহুদির বাচ্চা নারে?' তাহার পর আব একস্থানে—মাটির দিকে চেয়ে অশোক মনে মনে বললে, 'আগামী নূতন সভ্যতার যারা বীজ, তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আমি যোগ দিয়েছি—তাদের সুখ-দুঃখ আমারও সুখ-দুঃখ। আমি যেমন বর্তমানের সৈনিক, আগামী দিনেরও সৈনিক বটে। সেজন্য আমার গর্বের সীমা নেই। আমি জানি আজকের চক্রান্ত সেদিন ব্যর্থ হবে—প্রতিক্রিয়ার ধোঁয়া শূন্যে মেলাবে। আমি আজ থেকে দ্বিগুণ কর্তব্যপবাযণ হলাম—আমার কোনো ভয় নেই।' পড়িয়া ভাবিলাম দেশকে, তাহার জনগণকে কতখানি দবদ দিয়া ভালবাসিলে লেখক এমনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সৈনিক হইতে পারে—তাহাদেবই জন্য শহীদ হইতে পারে। আর আমাদেব দেশের যাহারা সাহিত্যেব পবিত্র প্রাসাদে বসিয়া মনে করেন, দেশের জনগণেব সমস্যা লইয়া সাহিত্য সৃষ্টি হয় না—দেশেব সমস্যাকে সাহিত্যে রূপ দেওযা মানে প্রোপাগাণ্ডা করা, তাহারা অন্ততপক্ষে সোমেনের 'দাঙ্গা' পড়িয়া দেখিতে পারেন।

টলার ও রালফ ফক্সের জীবনী পড়িয়া সোমেন একদিন লিখিয়াছিলো : 'ফক্স সবচেয়ে গৌরবজনকভাবে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে—কিন্তু যদি আরো কিছুকাল বেচে থাকত!' আজ সোমেনের স্মৃতিবার্ষিকী উদ্‌যাপন করিতে যাইযা তাহার নিজের কথাই তাহার সম্বন্ধে কেবল বলিতে ইচ্ছা করে: কিন্তু যদি আবো কিছুকাল বেঁচে থাকত! তবু সোমেন আজ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা হতাশ হইব না। সোমেনের মৃত্যুদিনে মুষ্টিবদ্ধ হাতে আমরা আজ এই প্রতিজ্ঞা লইব, যেন তাহার আদর্শের বীজ লক্ষ কোটি হইযা আমাদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে; জীবনেব যে ইঙ্গিত সোমেন তাহার জীবনে পাইয়াছিলো—আজ যাহার সুস্পষ্ট আভাস সোমেনের ও হাজাব লক্ষ জনগণের রক্তের মধ্য দিযে আমাদেব দৃষ্টিপথে ভাসিয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রতিষ্ঠা যেন আমরা করিতে পারি—কেননা একমাত্র তাহার প্রতিষ্ঠাতেই হইবে সোমেনের জীবনের নব প্রতিষ্ঠা।"

'দি রুটস'

গাছের শক্তি শেকড়ে। মাটির কত গভীরে তার শেকড় গেল তাতে। কথাটা মনে পড়েছে, আমার বাসা থেকে নিউমার্কেটের পথে যে দুটো গাছ দেখেছিলাম কয়েকদিন আগেও, সামান্য ঝড়ের আঘাতে তাদের পড়ে যেতে দেখে। ঝড়ের পরেও রাস্তায় গাছ দুটো শুয়ে ছিলো। গোড়ার দিকে চাইতে আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, আরে! এর যে শেকড়ই নেই। এ দাঁড়িয়ে ছিলো কি করে এতদিন! এটাই বিস্ময়। বৃহৎ বৃক্ষ যেগুলো, যেগুলো বড় ঝড়েও

পড়ে না, তার ডালপালা ভাঙলেও সে যে আমূল উল্টে যায় না, তার কারণ তার শেকড়ের গভীরতা। স্বর্ণলতার কথা অবশ্য আলাদা। স্বর্ণলতা, সোনার মতো রং। তাই বোধ হয় স্বর্ণলতা। আমরা গ্রামে থাকতে বলতাম, শূন্যলতা। শূন্যলতা অবশ্য গাছ নয়, লতা। কিন্তু যথার্থই শূন্য। শেকড়বিহীন। ওর বাঁচন ও বৃদ্ধি অন্য গাছকে শোষণ করে। কিন্তু তবু তারও বিপদ আছে। যাকে শোষণ করে এমন সোনার রং, সে যদি উল্টে যায়, তবে তারও শেষ। এমন কি, সে যদি ঝেড়ে ফেলে দেয় নিজেব গা থেকে এমন পরভোজীকে তবু তার শেষ।

মানুষের বেলায় কি ব্যাপারটা আলাদা? না। তা নয়। মানুষেরও শক্তি তার শেকড়ে। ব্যক্তি বা জাতি যেভাবেই দেখিনে কেনো, শক্তি তার শেকড়ে। কত গভীরে সে প্রবিষ্ট হযেছে, তার ওপর। মানুষের শেকড়েব মাটি কেবল আক্ষরিক অর্থে মাটি নয়। মানুষের শেকড়েব মাটি তার অভিজ্ঞতা, তার ইতিহাস, তাব অতীত। যার অভিজ্ঞতা নাই, ইতিহাস নাই, অতীত নাই, সে শেকড়হীন, প্রায় শূন্যলতার মতো। যে মানুষ, ব্যক্তি বা জাতি হিসেবে ঋদ্ধ হতে চায়, কিংবা যদি সে পতিত হয় সঙ্কটে, তবে তার উচিত অন্বেষণ করা তার শেকড়ের। দেখা, কত দূর গেছে সে শেকড়। আর এই চেষ্টাতেই তার শেকড় গভীর থেকে গভীরে চলে যেতে বাধ্য। নিজের আত্মবিশ্বাসে সঙ্কটের সমাধানের অস্থিরতায় জিজ্ঞাসা যদি জাগে, সন্ধান করো তোমার শেকড়ের।

আমিও তো জানিনে আমার শেকড় কোথায়? কি দিয়ে তৈরি হয়েছি আমি। চল্লিশ সনে যে কিশোরটি এসেছিলো একেবাবে 'বিদেশ' এক ঢাকায়, তারও তো কিছু শেকড় ছিলো তখনো। কিছু পূর্বকাহিনী। কিছু মালমশলা, পবিবেশ। সুতোর টানে তাও আসে। তাকেও আনতে হয়। জানতে হয়। সেই বোধ থেকে এতদিন পরে গেলাম নিজের বড় ভাইয়ের কাছে, যিনি বেঁচে আছেন এখনো। একদিন ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে সাহস হতো না। কিন্তু স্নেহশ্রদ্ধায় দু'জনে প্রায় বন্ধুর মতো। গেলাম তাঁর কাছে পুরনো দিনের কিছু কথা জানতে। আমার ভাল লেগেছিলো তাঁর সঙ্গে সেদিনের সেই আলাপটি, মাত্র অল্পক্ষণের। সেই সাক্ষাতের রোজনামচাটিই বরঞ্চ তুলে দিই।

১৩ . ৭. ৮৩ : গুলশানের কাছেই বনানী। ছোট ছেলে তিতুকে সঙ্গে করে গুলশানে বড় বোনের কাছে বিদায় নিযে বনানী এলাম। বনানীতে বড় ভাই একটি ছোট বাড়ি করেছেন। চাকরি জীবনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে তিনি অবসর নিয়েছেন। সেও অনেক বছর হয়ে গেছে। সাববেজিস্ট্রার এবং পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। উভয় পদমর্যাদায় বিভিন্ন স্থানে, পূর্ববঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গের শ্রীরামপুরেও কিছুকাল নানা দাযিত্ব সততা এবং শ্রমের সঙ্গে পালন করেছেন। চাকরি জীবনে তাঁর সততার নানা ঘটনা পরিচিতজনদের কাছে প্রবাদ কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। চাকবির কোনো এক স্থলে প্রতিবেশী কোনো এক সহকর্মীর কাছ থেকে নাকি সেলাইকরণের জন্য সুই এনেছিলেন একটি, ধার করে। বদলির সময়ে ভুলে ফেরত দেওয়া হয় নি ধার করা সেই সুই। তাতেই মনে শান্তি আসে না। খামে করে চিঠি লিখলেন সহকর্মীকে নতুন জায়গা থেকে এবং খামের মধ্যে ধার করা সেই সুচটি পাঠিযে দিলেন সহকর্মীকে। আমাদের কাছে অতিরিক্ত মনে হতে পারে। কিন্তু তাঁর কাছে একেবারে ফরজ। নিজের চোখে দেখেছি, প্রৌঢ় বয়সে যখন বিশেষ দায়িত্ব পেয়েছেন,

একটি জেলা মিউনিসিপ্যালিটি শাসনের। তখন সেই শহরের টাউন হলের বিদ্যুতায়নের সাজ–সরঞ্জামে যেন না কোন দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়, তাই নিজে দূর ঢাকা শহরে এসে হেঁটে হেঁটে দোকানে দোকানে ঘুরে বাল্ব, তার, সুইচ, কাঠি, বকস্ দর দস্তুর করে ক্রয় করেছেন। সে সব বাকস্‌বন্দী করেছেন। কুলির মাথায় চাপিয়ে লঞ্চে উঠিয়ে নিজে নিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে তদারক করে টাউন হলের ইলেকট্রিকের কাজ সমাধা করেছেন। সাবরেজিস্ট্রার যখন ছিলেন, তখন দু'পয়সা উপরি আয়ের কর্মচারিরা অসুবিধায় পড়ত তাঁর অফিসে। তিনি অফিসে নোটিশ টানিয়ে দিতেন, সরকারি নিয়মের বাইরে কেউ কিছু দাবি করলে দলিল করার জন্য আগত ব্যক্তিগণ যেন সরাসরি তাঁর কাছে অভিযোগ করেন। অথচ রেজিস্ট্রি অফিসের সুপরিচিত রেওয়াজ ছিলো (এবং আজো আছে) কেনা–বেচার দলিলের ব্যাপারে নিচ থেকে উপর পর্যন্ত কর্মচারিগণ উপরি গ্রহণ করবে।

এই কথা বলতে আমার আকস্মিকভাবেই মনে পড়ে গেল আমার একেবারে শিশুকালের কথা। আমার বড় ভাই তখনো নিজের সংসার করেন নি। চাকরি জীবন হয়ত মাত্র শুরু করেছেন। আমি হয়ত বাল্যশিক্ষা শেষ করেছি। শ্রেণী হিসেবে দ্বিতীয় শ্রেণী বলা চলে। মিয়া ভাই (বড় ভাইকে আমরা মিয়াভাই ডাকতাম) তখন বরিশাল জেলার পিরোজপুরের মধ্যকার নাজিরপুরের সাবরেজিস্ট্রার। ডাকবাংলো ধরনের লাল টালির ঘরটি আমি এখনো দেখতে পাচ্ছি। সামনে অদূরে নদী বয়ে যাচ্ছে। বড় বড় পেডাল অর্থাৎ চাকাওয়ালা স্টিমার। যাত্রী কিংবা মালটানা স্টিমার। আমি বলতাম জাহাজ। সামনের নদীর বুক দিয়ে এই জাহাজ যাতায়াত করে। নাজিরপুর স্টেশন পৌঁছার আগে গম্ভীর গলায় দীর্ঘ ভোঁ করে দু'বার আওয়াজ দিতো। অফিস বাংলোর সামনে বড়ো মাঠ। পাশে একটা জোঁকভরতি পুকুর। তারও একটু পরে আর একটা 'রিজার্ভ' পুকুর। এই পুকুরের পানি সবাই খায়। গোছল করা, কাপড় কাচা এতে নিষিদ্ধ। আর একটু দূরে নদীর পারে পোস্টঅফিস। তারও পরে পুলিশের থানার দালান। নদীর ওপারে হাট। হাটের পারেই স্টিমার ভিড়ে এবং ওখান থেকে মোড় ঘুরে ফিরে চলে যায়। আহা! কি সুন্দর ছবি। মনে হয়, সেই জায়গাটিতে, সেই বয়সটিতে আমার বড় ভাইয়ের কাঁধে চড়ে চলে যাই! কিন্তু তাতো সম্ভব নয়। কাঁধে চড়ার কথাটা আক্ষরিকভাবেই সত্য। সেবার হয়ত ১৯৩০ কিংবা ১৯৩১–এ মিয়াভাই এসেছিলেন ছুটিতে বাড়িতে। ছুটি শেষে রওনা হলেন সন্ধ্যার সময়ে আমাদের গ্রাম আটিপাড়া ছেড়ে উজিরপুরের দিকে। হেঁটে যাবেন উজিরপুর। সঙ্গে ছিলো তাঁর অফিসের চাপরাসি, ফজল মিয়া। মিয়া ভাইয়ের এই এক গুণ। যেখানেই কাজ করেছেন, অফিসের কেরানি, কর্মচারি, নিম্নপদের পিয়ন—সবাইকে আত্মীয়ের মতো আপন করে নিয়েছেন । একবার কারুর সঙ্গে দায়িত্বের ক্ষেত্রে পরিচয় ঘটেছে তো সারাজীবন সে পরিচয় সজীব রয়েছে। আঘাত বা শত্রুতামূলক সম্পর্ক কারুর সঙ্গে তাঁর তৈরি হয়েছে, এমন ঘটনা তিনি কখনো বলেন নি। উজিরপুর আমাদের গ্রামের বাড়ি থেকে তিন কিংবা চার মাইল। ওখান থেকে নদীপথে যেতে হবে বানরীপাড়া। বানরীপাড়াতে স্টিমার পাওয়া যাবে সকালে। সেই স্টিমার যাবে হুলার হাট হয়ে নাজিরপুর, মিয়াভাইয়ের যেখানে চাকরি স্থান। আমি তখন বোধ হয় ভাইদের মধ্যে সবচাইতে ছোট এবং স্নেহের। বাড়ি থেকে রওনা হওয়ার মুহূর্তে বায়না

ধরলাম, আমিও যাব বড় ভাইয়ের সঙ্গে। নানা নিরোধ। মা বলেন, তুই কোথায় যাবি? আমি বলি না, আমি যাব। নাছোড়বান্দা। স্নেহপরায়ণ বড় ভাই বলেন: ঠিক আছে, ও যাক। উজিরপুর পর্যন্ত। ওখান থেকে ফেরত পাঠিয়ে দেব বাড়ির লোকের সঙ্গে। কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হলো। আমাকে উজিরপুর থেকেও ফেরত পাঠানো গেলো না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল মিয়া ভাই আমাকে সঙ্গেই নিবেন। হয়তো সেদিন তাঁর প্রশ্ন ছিলো কিরে, তুই পারবি, আমাব সঙ্গে থাকতে? এ প্রশ্নের কি জবাব দিয়েছিলাম আজ আর তা স্মরণে নেই। কিন্তু ফেরত যে পাঠাতে পারলেন না তাতেই জবাবটি যে ছিলো দৃঢ় এবং নাছোড়বান্দা ধরনের তাতে সন্দেহ নেই। সেই রাত্রির কথা আজো মনে ভেসে ওঠে। বড় ভাইয়ের ইচ্ছা ছিলো, উজিরপুর থেকে নৌকা করে বানরীপাড়া যাবেন। কিন্তু নৌকোর কোন মাঝি রাজি হলো না। বলল, নৌকো করে গিয়ে সকালে স্টিমার ধরিয়ে দেওয়া যাবে না।

উজিবপুর থেকে বাড়ির আত্মীযস্বজনরা বিদায় নিলেন। এবার উজিরপুর থেকে হাঁটা পথে রওনা হলাম আমরা তিনজন। মিয়াভাই, তাঁর চাপরাসি ফজল মিয়া এবং আমি। তিনজন বলে কোন লাভ নেই। আসলে দু'জন। পাঁচ বছরেব শিশুকে ঐ রাতে দশ-বার মাইল পথ হাঁটিযে নেওযা যাবে কি করে? কিছু দূব না যেতে শক্ত সবল ফজল মিয়া আমাকে অক্লেশে তাঁর কাঁধে তুলে নিলেন। অন্ধকার পথে হেঁটে ঐ পথে মিয়াভাই কিংবা তাঁর চাপরাসিও যে কখন বানবীপাড়া গিয়েছিলেন তা মনে হয় না। কারণ, কোনো এক পথ ধরে ঘণ্টা খানেক হাঁটাব পবে দেখা গেল, যে-নদীর পার থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিলো সেই নদীর পাবেই তাঁরা আবাব ফিবে এসেছেন। কিছুটা আতঙ্ক নিয়ে আবার হাঁটা শুরু হলো। রাত ৩খন দুপুর পেরিযে হয়ত একটা কিংবা দু'টা বেজে গেছে। কত পথ বাকি তাই বা কে জানে। এবাব হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়লেন তাঁরা দিগন্তবিস্তারী নির্জন মাঠে। এদিকে-ওদিকে ঝাঁকড়ামাথা তালগাছ সেই রাত্রির বুকে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরবাড়িব নাম-নিশানা কোনো দিকে নেই। এরকম মাঠ উজিরপুবের মতো ঘনবসতি এলাকায থাকতে পাবে, তা আমি কোনোদিন কল্পনা করতে পারি নি। পরবর্তীকালেও এই মাঠের রূপটি আমাকে আকর্ষিত করেছে। এই মাঠের নাম নাকি হলুদপুরের মাঠ। সারারাত ধরে এই হলুদপুরের মাঠে এ ভুল ও ভুল করে চলতে চলতে একেবারে ভোরবেলা যে বানরীপাড়া এসে পৌছেছিলাম এবং চাকাওয়ালা যে স্টিমারটি ঘাটে ছিলো সেটি যে ছেড়ে যাওয়ার উপক্রম করে তার সিঁড়ির একটি তক্তা উঠিয়েও ফেলেছিলো এবং আমাকে কাঁধে করে আমার ভাই এবং তাঁর চাপরাসি উর্ধ্বশ্বাসে গিয়ে সেই স্টিমারটিতে উঠেছিলেন---সেই রোমাঞ্চকর দৃশ্যটি আজকের সাতান্ন বছরের জীবনের কত শত বিপদ-আপদের স্মৃতি-বিস্মৃতি ঘটনার মধ্যেও জ্বলজ্বল করে ভাসছে। স্মৃতির এই ব্যাপারটিও বিস্ময়কর। কোন্‌টি যে স্মৃতিতে থাকে, ভেসে ওঠে এবং কোন্‌টি যে থাকে না, তলিয়ে যায়—সে এক অজানিত রহস্য।

এমনি করে সেদিন বড় ভাইয়ের সঙ্গী হয়ে এসেছিলাম তাঁর কার্যস্থল নাজিরপুরে। মিয়াভাইয়ের সঙ্গে শিশু ও কিশোরকালের তাই আমার নানা স্মৃতি। আসলে ভাই হলেও তিনিই ছিলেন আমার এবং অপর সকল ছোট ভাইবোনের নিকট পিতার মতো। তাঁর বয়োকনিষ্ঠ সকলের পড়াশুনার দায়দায়িত্ব তিনিই বহন করেছেন। বাবা-মার কাছে তিনি

ছিলেন ভরসার এবং গর্বের ধন। গ্রামের লোকেরা বাবা-মাকে ডাকতো মৌজালীর (মৌজে আলী) বাবা কিংবা মা বলে। বাবা-মা তাঁদের ছেলেকে ডাকতেন 'মনু' বলে। কথার টানে সে ডাক শোনাত 'মউন্না' বলে।

আজ তিনি সংসারী তো বটেই। প্রবীণ। চাকরি জীবন থেকে অবসর নিয়েছেন। ছেলেমেয়েরা মোটামুটি স্থিত হয়েছে আপন আপন সংসারে এবং অবস্থানে। বড় ছেলে ইংরেজির অধ্যাপক। এক ছেলে ইঞ্জিনিয়াব। মেয়েবাও শিক্ষিত এবং সংসারী। একটি ছেলে '৭১ সালে জীবন বীমায় চাকরি করত। '৭১-এর আগে কোনো রাজনীতি করতো বলে শুনি নি। কিন্তু '৭১ সালে জড়িত হয়ে পড়েছিলো যুদ্ধের সঙ্গে এবং '৭১-এর শেষের দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে কোনো জায়গাতে কোনো কর্মসূচি সম্পন্ন করতে সেই যে গেলো, আব কিন্তু এলো না। মা-বাবা বহুদিন ভেবেছিলেন, ছেলে তাঁদের বেঁচে আছে, ফিরে আসবে। কিন্তু বাংলাদেশের অসংখ্য হাবিয়ে যাওয়া যুবকের ন্যায় সেও আব ফিবে আসে নি। ছেলেটিব নাম ছিল হুমায়ুন। পুরো নাম আহমদ নিয়াজ। শহীদ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ওর একটি ছবি জীবন বীমা কর্পোবেশনের গুলিস্তানের অফিসে এখনো টাঙ্গানো দেখা যায়। তাতে বোঝা যায়, ছেলেটি তাব সহকর্মীদেব মনেও দাগ কেটেছিলো।

বড় ভাইয়ের জীবনে এই এক অবিস্মবণীয় ঘটনা। কোনোদিন রাজনীতি করেন নি। আমার নিজের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতায ক্ষুব্ধ ছিলেন আমাব ওপর। ১৯৪৮ সনে হঠাৎ একদিন আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের শিক্ষকতার চাকবিতে ইস্তফা দিয়ে নিষিদ্ধ রাজনীতিক জীবনে আত্মগোপনে চলে গিয়েছিলাম, সেদিন সেই মুহূর্তে পুলিশের লোক অন্বেষণ করে আমাকে না পেলেও বড় ভাই ঠিকই আমাকে বের করেছিলেন ঢাকার শহরতলির একটি এলাকাতে। দেখা হতেই বলেছিলেন : 'তুমি বোকার বোকা তো বটেই। এখন দেখছি পাগল। বিলেত যাওযার চান্স পেলে। তাও গেলে না। (কথাটা মিথ্যা নয়।) এখন হাতের চাকরিতে ইস্তফা দিলে। এ সবের অর্থ কি?' বড় ভাইয়েব এবকম প্রশ্নেব মোকাবেলা আমাকে আগেও করতে হযেছে। এবং এসব ক্ষেত্রে আমার কৌশলটি কিছুটা ব্যতিক্রমী ধবনের ছিলো। আমার নীতিটি ছিলো: মুরুব্বিজনের সঙ্গে তর্ক করবে না এবং নিজের বিবেকের সিদ্ধান্তে বিচলিত হবে না। আর এই নীতিতে সেদিনও আমি মিয়া ভাইয়ের প্রশ্নের কোনো জবাব দিই নি। শুনেছি, তিনি তখনি ছুটে গিয়েছিলেন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান ডঃ বিনয় বায়েব কাছে। ডঃ বিনয রায আমার নাম ধরে আমার ভাইকে বলেছিলেন : ওকে তো আমরা চিনি। ওতো আমাদের একান্ত স্নেহের ছাত্র। কিন্তু ওর সিদ্ধান্ত থেকে তো ওকে ফেরানো যাবে না। তা না হলে এখনো যদি ও ফিরে আসে, আমরা ওকে আবার সাদরে নিয়ে নেবো।

অধ্যাপক বিনয় রায়ের কথা মিথ্যা নয়। আমার প্রতি এই শিক্ষকদের ছিলো অপার স্নেহ। দর্শনের প্রখ্যাত শিক্ষক, অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্যের, অধ্যাপক বিনয় রায়ের, অধ্যাপক ক্ষিরোদ মুখার্জি বা কেসি মুখার্জির এবং অধ্যাপক রাকেশ রঞ্জন শর্মার স্নেহ। হিন্দু শিক্ষকই তখন সংখ্যায় অধিক ছিলেন। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সনেও। আমাদের দর্শন বিভাগে মুসলিম শিক্ষক ছিলেন হাদি সাহেব। আব্দুল হাদি তালুকদার। এবং পরবর্তীকালে

গোলাম জিলানী, উর্দুভাষী। বোধ হয় লাহোরের। ইনি পড়াতেন মুসলিম দর্শন।

বিনয়বাবুর স্মৃতিটি উল্লেখ করা আবশ্যক। ১৯৪৬ সনে আমি যখন এম.এ পাস করি তখন দর্শন বিভাগের তিনি অধ্যক্ষ। হরিদাস ভট্টাচার্য তখন অবসর নিয়ে চলে গেছেন, কলকাতায়। এম.এ পাসের পরে কোনো আনুষ্ঠানিকতা করে যে আমাকে দর্শন বিভাগের শিক্ষক হতে হয়েছিলো, তা আদৌ মনে পড়ে না। আসলে কেবল আমাদের বিভাগ নয়, তখনকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়টিই ছিল ছাত্রছাত্রীদের কাছে একটি ছোট পরিবারের ন্যায়। আমাদের বিভাগের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অধিকতর সত্য। দর্শনের অনার্সে এম.এতে গুটি পাঁচ–ছয় ছাত্রছাত্রী। শিক্ষকদের সঙ্গে এদের সম্পর্ক ছিলো সন্তানের সম্পর্ক। তাঁদের নিজেদের বাড়ি আর ছাত্রদের ক্লাস,এর মধ্যে কোনো ভেদরেখা ছিলো বলে মনে পড়ে না। হবিদাস বাবু বা বিনয়বাবুর ক্ষেত্রে একথা খুবই সত্য। হরিদাস বাবু ছিলেন সারা ভাবতব্যাপী বিখ্যাত বাগ্মী, দার্শনিক। কলকাতা, লখ্নৌ, বেনারস, দিল্লি, বোম্বে, লাহোর—সকল জ্ঞানকেন্দ্রে তাঁব অবাধ যাতাযাত, অহরহ ডাক।

বিনয়বাবুব সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের স্মৃতি আমার মনে অমলিন হয়ে ভাসছে। সেটিই আমাব শেষ সাক্ষাৎ। (বিনযবাবু ছিলেন ইংরেজির অধ্যক্ষ এস.এন রায়ের ছোট ভাই। এস.এন বায় ছিলেন সেকালের ইডেন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সুজাতা রায়ের স্বামী। আসলে স্বামী–স্ত্রী হওয়ার পূর্বেও এঁরা একই পরিবাবের লোক ছিলেন। আমাদের সামাজিক ভাষায় হয়ত খালাত–মামাত ভাইবোন। হিন্দু সমাজে এত নিকট আত্মীযের মধ্যে নাকি সেকালে বিয়ের সম্পর্ক হতো না। কিন্তু এস.এন রায়-সুজাতা বায় সে সংস্কারকে ভেঙে ছিলেন।)

১৯৪৬–৪৭ সন। কিংবা তাবও কিছু পর ১৯৪৮ এর মধ্যভাগ। তখন বিনয়বাবু ছিলেন দর্শন বিভাগের প্রধান। তাঁর মারফতেই বয়োকনিষ্ঠ বা জুনিয়র শিক্ষকদের নিয়োগ—তথা তাদের সকল আবেদন–নিবেদন : বিদেশ যাওয়ার বৃত্তির দরখাস্ত বা ছুটির প্রার্থনা। আমি তখন বিভাগের একজন তরুণ শিক্ষক। বিনয়বাবু জানতেন, আমার কিছু এদিক-ওদিক চলাচল আছে। পড়াশুনার বাইরে : এই কনফারেন্সে যাওয়া, ঐ মিটিং করা, করোনেশন পার্কে বক্তৃতা দেওয়া, রাজনৈতিক পত্রিকা বিক্রি করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নপদস্থ পিয়ন বা চাপরাসিদের ছেলেমেয়েদের নাইট স্কুল চালানো, এমন কি তাদের নিয়ে বেয়ারার সমিতি গঠন কবা। এসব কিছুকে আমার ছাত্রাবস্থা থেকেই আমার শিক্ষকরা প্রশ্রয় এবং স্নেহের চোখে দেখতেন। মোট কথা, কেবল বই পড়তে ছেলেটি যে ব্যস্ত থাকে না, আবার এটা–ওটা করেও ছেলেটি বেশ ভাল ফল করে পরীক্ষাতে, এটি আমার অধ্যাপক-শিক্ষকদের বেশ আমোদিত করতো। সে যা হোক, ৪৭–৪৮–এ আমি যখন দর্শন বিভাগে শিক্ষকতা করছি, তখন দেশ বিভাগ তথা পাকিস্তান হওয়ার পরে ঢাকার রাজনীতিক পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে জটিল হয়ে উঠছিলো। পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগ সরকার বামপন্থী রাজনীতিকদের বিষয়ে তাদের দৃষ্টি ক্রমান্বয়ে তীক্ষ্ণ করে তুলছিলো। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করা থেকে ধর-পাকড়ও শুরু হয়েছিলো। তখনো বামপন্থী এবং কমিউনিস্ট কর্মীদের অধিকাংশ হিন্দু সমাজভুক্ত। তাঁরাই অধিক পরিমাণে গ্রেফতার হচ্ছিলেন। কিন্তু সরকারের আই.বি তথা গুপ্তচর বিভাগ খোঁজ করছিলো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম ছাত্র–

শিক্ষকদের মধ্যে এমন ধরনের কর্মী আছে কিনা। শিক্ষকদের মধ্যে মুসলিম তরুণ শিক্ষক হিসেবে স্বাভাবিকভাবে এক্ষেত্রে আমি এই বিভাগের নজরে পড়েছিলাম। তাদের এ দৃষ্টি হয়ত আমার ওপর পড়েছিলো বিভাগের পূর্বে, সেই '৪৩ সনের দুর্ভিক্ষ এবং ৪৫-৪৬ সনের সারাদেশব্যাপী ছাত্র এবং শ্রমিক আন্দোলনের আলোড়নের কালেই: নৌবিদ্রোহ, রশিদ আলী দিবস, ঢাকার ছাত্রদের দাঙ্গাবিরোধী শান্তি মিছিল হিসেবে ইতিহাসে যে ঘটনাগুলো পরিচিত হয়ে আছে, তার মধ্যেই। কিন্তু বিভাগের পূর্বে আমার ওপর তাদের দৃষ্টি ততো খর হওয়ার প্রয়োজন ছিলো না। কিন্তু দেশ বিভাগের পরে আমি এমন কর্মীদের মধ্যে প্রায় অন্যতম হয়ে দাঁড়ালাম। পাকে প্রকারে আমি নোটিশ পেলাম: আমাকে তারা অন্বেষণ করছে। এমন অবস্থায় প্রকাশ্য চাকরিরত হয়ে বেশিদিন বাইরে থাকা যাবে না, সংগঠনের এই বিবেচনা থেকে সিদ্ধান্ত হযেছিলো: তুমি চাকরি ছেড়ে আত্মগোপন করবে। সিদ্ধান্তটি কার্যকর করতে আমাব কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব আসে নি। সাংসারিক কোনো দায়-দাযিত্ব আমি কোনো দিন পালন করি নি। একমাত্র আকর্ষণ জন্মেছিলো ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের জন্যে। বেশ লাগছিলো ছাত্র-প্রায় আমার শিক্ষকের মতো বক্তৃতা দিতে। কেমন করে যে সেদিন ছাত্রছাত্রীদের কাছে গুরুগম্ভীর কথা বলতাম, তা স্মরণ কবতে পারছিনে। তবে গোবেচাবী আমার প্রতি ছেলেমেয়েদেরও কিছুটা আকর্ষণ যেন তৈরি হচ্ছিলো। তার একটা কারণ বোধ হয এই যে, এই 'স্যারটি'র যেমন 'অ-স্যারমূলক' নানা আচাব-আচরণের কথা শোনা যায়, তেমনি আবার ব্যতিক্রমহীনভাবে তাকে নির্দিষ্ট সময়ে তার ক্লাসটিতেও পাওয়া যায় আর সেখানে তাকে সাগ্রহে পাঠ্য কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যাতে নিবদ্ধ হতেও দেখা যায়। আর এ কারণেই একদিন আমি তাদের সতর্ক করে দিযেই বললাম : 'আমি আর তোমাদেব ক্লাস নেব না।'

তারা বলল : 'কেন স্যার, কেন স্যার?'

আমি বললাম : 'আমাব জীবনে অ-শিক্ষক কিছু দায়দায়িত্ব আছে। সেটি পালন করে শিক্ষকতার পুরো দায়িত্ব পালনে আমি ব্যর্থ হবো। কিন্তু দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবো না জেনেও চাকরিতে বহাল থাকব, এমন কথা আমি ভাবতে পারিনে।' সেদিনকার সেই পরিবেশে ছেলেমেয়েদের কাছে আমার এমন কথা নিশ্চযই বেশ রহস্যেব সৃষ্টি করেছিলো, কিন্তু কথাটা সঠিকই ছিলো।

দু'দিন পরে আমি এক টুকরা কাগজ নিয়ে অধ্যাপক বিনয় রায়ের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। আমার সাক্ষাৎশিক্ষক এবং বিভাগের প্রধান, যিনি আমাকে ঘরের ছেলের মতো স্নেহ করতেন, তিনি ভেবেছিলেন, কাগজটিতে আমার কোনো আবেদন আছে, কোনো পদোন্নতির, বা বিদেশ গমনের জন্যে বৃত্তির। আমার হাতের কাগজটিতে আবেদন অবশ্যই একটি ছিলো। কিন্তু পদোন্নতির নয়, অব্যাহতির: 'স্যার, আই বেগ টুবি রিলিভ্‌ড্ অব মাই ডিউটিস এ্যাস এ টিচার ইন দি ডিপার্টমেন্ট: স্যার, বিভাগের শিক্ষকের দায়িত্ব থেকে আমাকে অব্যাহতি দিবেন।' সোজা কথায়, পদত্যাগ। বিনয়বাবু আমার হাত থেকে সেই কাগজটুকু নিয়ে বেশ কয়েক মিনিট এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, যেন বাক্যটির মর্ম তিনি অনুধাবন করতে পারছেন না। এবং যথার্থই তিনি আমাকে রাগের স্বরে জিগ্যেস

করলেন : 'এসবের অর্থ কি? তুমি কি পাগল হয়েছো? আর ইউ ম্যাড?' বিনয়বাবুর বিস্মিত হওয়াটা অস্বাভাবিক ছিলো না। তখনকার হিন্দু সমাজের মধ্যবিত্ত কত ছেলে রাজবন্দী হিসেবে জেলে গেছে, এমন কি ফাঁসিতেও ঝুলেছে। আন্দামানে নির্বাসিত হয়েছে, আত্মগোপন করেছে। বিনয়বাবু, এস.এন রায়, পৃথ্বিশ চক্রবর্তী, হরিদাস বাবু। এঁদের কাছে এমন ব্যাপার বিস্ময়কর কিছু ছিলো না। সেকালে তাঁদের কাছে চমক ছিলো : একটি মুসলমান ছাত্রের এমন 'বিপথে' পা বাড়ানোর। সেদিন মুসলমান সমাজে এমন ঘটনা তাঁদের সমাজের ছেলেদের ন্যায় সচরাচর ছিলো না। মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের প্রেক্ষিতে এ ছিলো ব্যতিক্রম।

বিনয়বাবু তারপরে আবার বললেন: 'তোমার এ রেজিগনেশন লেটার আমি ছিঁড়ে ফেলব। এমন পাগলামি তুমি করো না।'

আমি বললাম : 'স্যার আপনি তো আমাকে জানেন। ব্যাপারটাতে একটা সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। এটা তো আর পাল্টানো যাবে না।'

আমি বললাম : 'স্যার, আপনি তো আমাকে জানেন। ব্যাপারটাতে একটা সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। এটা তো আর পাল্টানো যাবে না।'

শুধুমাত্র এই কথা কয়টিই। আর কিছু নয়। আর তারপরেই আমার স্বভাবসুলভ সলজ্জ নিঃশব্দতা ব্যতীত আর কোনো জবাব ছিলো না আমার। আরো কয়েক মুহূর্ত বোধ হয় পার হয়েছিলো। তারপরের ঘটনাটি আজ মনে করতে আমার চোখে পানি আসছে। কিন্তু সেদিন যে কিভাবে ঘটনাটিকে অতিক্রম করে এসেছিলাম, তা আর স্মরণ করতে পারিনে। আমার শিক্ষক ডঃ বিনয় রায়, বিভাগের প্রধান, আমাকে হঠাৎ বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন : তোমার মত পাগল ছেলে আমি আর পাই নি। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি ...।

বিনয়বাবু আজ হয়ত বেঁচে নেই। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেদিনকার সেই পারিবারিক পরিমণ্ডলে শত দ্বন্দ্ব দাঙ্গা, অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধার ক্রমপ্রসার সত্ত্বেও এমন স্নেহ-শ্রদ্ধার সম্পর্ক যে ছিলো, তার কথা আজ যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করা, ব্যক্তিগত আবেগ থেকে স্মৃতিচারণের চাইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার মনে হচ্ছে। সেই বোধ থেকেই ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করার এই দুর্বল চেষ্টা।

এক কিশোরের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি

ধারাবাহিকভাবে স্মৃতিচারণের চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। আত্মজীবনী লেখার মতো 'বড়লোকও' আমি নই। তবু 'চল্লিশের দশকের ঢাকা'র কথা বলার কিছুটা দায়িত্ব আছে। এই দায়িত্ব পালনের জন্য নিজের মনের আলো-আঁধারিতে হাতড়ে বেড়াবার চেষ্টা করছি নিরন্তর। হঠাৎ হঠাৎ কোনো একটা উদ্দীপক বা 'স্টিমুলাসে' তার কোনো কোনো জায়গা যেন আকস্মিকভাবে দ্যুতিময় হয়ে ওঠে। কিছুটা পরিমাণে দেখা যায়। চিত্রবৎ ভেসে ওঠে

১৯৪০, ৪১, ৪২, ৪৩–এর জীবন, তার কোনো ঘটনা, কোনো চরিত্র। তারপরেই আবার হয়ত অন্ধকার। এপ্রায়, অতীত নিয়ে কানামাছির খেলা: এই ছুঁই, এই পাই: এই পাইনে...

খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ পেয়ে গেলাম কয়েকটি হাতে লেখা খাতা। বয়স হয়েছে তার চল্লিশ বছরের ওপর। তারিখ আছে কোনো কোনোটির গায়ে: ১৯৪০–৪১ সনের। একটি কিশোরের খাতা। প্রায়ই ছিন্ন। আবার কোথাও কিছুটা ধারাবাহিকতা আছে। একটি কিশোর ছাত্রের খাতা। কিশোর তো বটেই। মাত্র ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাস করেছে। পনেব বছরও পুরো হয় নি ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময়ে। যে লেখক বর্তমানে এই ভূমিকাটি লিখছে তার নামের সঙ্গে এই কিশোরের নামের অবশ্যই মিল আছে। কিন্তু তাই বলে সেই খাতার মধ্যে যে দুই-একটি সাহিত্যচর্চামূলক লেখার আভাস পাওয়া গেল, সে লেখা বর্তমানের এই লেখকের, এমন কথা বলা অর্থহীন। তার মানে এই নয় যে, বর্তমানে প্রৌঢ় বয়সের এই লেখক সেই কিশোরের চাইতে উচ্চতর স্তরের কোনো লেখক, তাই একটি কিশোরের রচনাকে নিজের বলতে তার সঙ্কোচ। ব্যাপারটি তা নয়। বরঞ্চ সেই কিশোরের কাঁচা হাতের লেখার মধ্যে, শব্দের বানানে ভুল এবং ভাষা ব্যবহারের সাধু চলতির মিশ্রণ সত্ত্বেও যে অকৃত্রিম আবেগের পরিচয় আছে, সেটি বর্তমানের এই তিত–পোড়া প্রৌঢ়ের জীবনে বা তার লেখায় নেই। তাই সে কিশোরের আবেগময় লেখার মালিকানা দাবি করার হক বর্তমানেব একই নামধারী এই লেখকের নেই।

সেই কিশোবেব এই লেখার একটিও সেদিন কোনো সাহিত্যপত্রে প্রকাশিত হয় নি। অপর কোনো লেখা হয়ত ঢাকা কলেজের ম্যাগাজিনে কিংবা 'মাসিক মোহাম্মদী', 'মাসিক সওগাতে' প্রকাশিত হয়ে থাকবে।

কিন্তু অপ্রকাশিত এই পাণ্ডুলিপির একটি রচনা আমার কাছে আজ একটু তাৎপর্যপূর্ণ বলে বোধ হচ্ছে। লেখাটি গল্প। রচনাব কাল ১৯৪১–এর শেষ কিংবা '৪২। খাতার বিভিন্ন চিহ্ন থেকে এমন অনুমানই করতে হয়।

দাঙ্গার শহর, ঢাকা শহর। এই দাঙ্গার পটভূমিতে একটি মুসলমান ডাক্তার ছেলে এবং দাঙ্গায় সদ্য নিহত একটি হিন্দু যুবকের অসহায় বোনকে নিয়ে কিশোর লেখক তার গল্পটি তৈরি করেছে। গল্পটিকে আমি নিচে তুলে দিচ্ছি। সেদিনের ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার মধ্যে একটি মুসলিম কিশোর ছাত্র তার সাহিত্যচর্চার চেষ্টায় হিন্দু–মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি–ভালবাসা তথা হৃদয়গত ঐক্যের সূত্রটিকে যে মূল্যবান বলে মনে করেছিলো, এই ঘটনাটি সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত প্রবাহিত সামাজিক–রাজনৈতিক উথান–পতনের প্রেক্ষাপটে অবশ্যই একটি সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য বহন করে। এবং সে কারণেই সেই কিশোবের এই কাঁচা লেখাটি অভিজ্ঞ–পক্ক এই প্রৌঢ়ের ভাল লেগেছে।

ভূমিকার এই কথাটি বলে আমি গল্পটি তুলে দিচ্ছি। পাণ্ডুলিপিতে গল্পটির কোনো নাম পাওয়া যায় নি। হয়ত কিশোরের এটি খসড়ামাত্র ছিলো। একে মার্জিত করা হয় নি। কিন্তু আজ একে মার্জিত করে কোনো লাভ নেই। সেটি উচিতও নয়। এবং এর নামকরণেরও কোনো প্রয়োজন নেই। পাণ্ডুলিপিতে লেখকের নাম ছিলো না। খাতার উপর তার নিজের নামটি লেখা ছিলো। এবং দ্বিতীয়বার কোনো ব্যাখ্যা না করে বলছি: সে লেখক এই লেখক

নয়। কিন্তু তার নাম এবং বর্তমান লেখকের নামের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। লেখার পুরোটি পাওয়া যায় নি। যেটুকু পাওয়া গেছে তাতে 'শরতী' প্রভাব সহজেই ধরা পড়ে। সে যাক, লেখাটির সাহিত্যিক মূল্য বড় নয়। বড় তার কালগত বৈশিষ্ট্য।

'দাদা, তুমি আমায় ছেড়ে চলে যেও না, যেও না'।

অমল আর সুরমা। দুই ভাইবোন। আত্মীয় বান্ধব বলিতে তখন আর কেহই অবশিষ্ট ছিলো না। মানুষের বাঁচিবার উপায় কম। কিন্তু মরণের পথের অল্পতা নাই। মরণের পথ অসংখ্য। মরণের পথের প্রশস্ততা সত্ত্বেও অমল আর সুবমা এতদিন বাঁচিয়াই ছিলো। পূর্ববঙ্গেরই ওরা মানুষ। বাবা ছিলেন জমিদার। অমল কিন্তু গ্রামের জমিদারি বাদ দিয়া পূর্ববাংলারই ঢাকা শহরে বোন সুবমাকে লইয়া বাড়ি করিয়া বাস করিতেছিলো। যখনকাব কথা বলিতেছি, অমল তখন বি.এ. পড়ে, বোন সুরমা ম্যাট্রিক।

অমল আর সুরমা। এদের একেব বাঁচার জন্য দায়ি অপরে। অমল সুরমার শুধু বড় ভাইই নয়। ছেলেবেলা হইতে অমল সুরমার ভারপ্রাপ্ত। বোন সুরমার একাধারে সে বড় ভাই, মাতা-পিতাব মত রক্ষণকাবী সব। সুবমার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বই অমলের বাঁচার একমাত্র প্রয়োজন।

ঢাকাব ১৯৩৯ সনের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা-হাঙ্গামার কালে অমল পাইল এক ভীষণ আঘাত। হাসপাতালে অমলকে স্থানান্তরিত করা হইল। কিন্তু অবস্থা ক্রমশ খারাপ হইতে লাগিল। সুবমাব সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী ঘুবিতে লাগিল। হাসপাতালে মুমূর্ষু ভাইয়ের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অঝোরে সে অশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিল। সুরমার চক্ষুর সম্মুখে তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ লেপিযা-মুছিয়া একাকাব হইয়া গেল। অমল তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। অথচ অমলেব এই চলিযা যাওয়া সুরমার নিকট যে ভবিষ্যতে কি একটা ভয়াবহ আলোড়ন, একটা ভূমিকম্প আনিয়া উপস্থিত করিবে সে কথা সুবমা ভুলিয়া গিয়াছে। তাহার মনে হইতে লাগিল, অমল তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারে না। অন্তরের নিগূঢ় ক্রন্দন ধ্বনি মুহূর্তে মুহূর্তে সুরমার মুখে প্রকাশ পাইতেছিলো: 'দাদা, তুমি যেও না'...

অমল? নির্বানোন্মুখ প্রদীপ। সুরমার কথা কানে প্রবেশ করিতেই জ্বলিয়া ওঠে। কিন্তু কথা বাহির হয় না। কোমরেব পাশের ক্ষতটার ব্যাণ্ডেজ আবার রক্তে ভিজিয়া উঠিয়াছে। মরণপথের যাত্রীর শেষ নিশ্বাস পড়িতে নিমেষমাত্র বাকি। অমল হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, সুরমা, এই প্রকাণ্ড বিশ্বটায় এমন একটা মানুষও কি নেই যার হাতে তোর ভার আমি ন্যস্ত করে যেতে পারি, নেই?

এতক্ষণ পর্যন্ত হাসপাতালের বারান্দায় একটি মুসলমান ডাক্তার ছেলে রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলো। 'ইমারজেন্সি ওয়ার্ডের' ভারপ্রাপ্ত সে। গত রাত্রি বারটা হইতে কত মানুষকেই তো সে ভর্তি করিয়াছে এই ইমারজেন্সি ওয়ার্ডে। কতজনের শেষ নিশ্বাস তো এরই মধ্যে বাহির হইয়া গিয়াছে। আর একটা কেস এই অমল বাবু। তারও হয়ত আর বেশি বিলম্ব নাই। অথচ অমল চলিয়া যাইবার পরে ঐ পার্শ্বে উপবিষ্ট মেয়েটির অবস্থা এই

দাঙ্গা–হাঙ্গামার কালে কিরূপ নিঃসহায় হইয়াই যে দাঁড়াইবে, সে কথা কি সে এতক্ষণে কম বুঝিতে পারিয়াছে? দাদার মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও যে বলিতে পারে, 'তুমি যেও না', সে যে কতটা আশ্রয়হীন, সমস্ত পৃথিবীটায় যে তাহাব কোথাও মাথা গুঁজিবার এতটুকু স্থানও নাই, সে কি তাহার বুঝিতে বাকি রহিয়াছে? অথচ কিইবা সে করিতে পারে? আজিজ রেলিং–এ ভর দিয়া দূরে রাঙা আকাশটার পানে নির্নিমেষে চাহিয়া থাকিয়া ভাবিতে লাগিল, মানুষে মানুষে এই যে হানাহানি, এই যে লহুর স্রোত দিনরাত বিচারহীনভাবে বহিয়া চলিয়াছে, এব শেষ কোথায়? আজ ভাইয়ের পাশে উপবিষ্ট ঐ নিঃসহায় মেয়েটির আর্তরব, তার বুকফাটা ক্রন্দন কি এই নিষ্ঠুর নির্দয় পশুগুলিকে অভিশাপ দেয় না? আর এই যে বছরে বছবে হিন্দু–মুসলমান দাঙ্গা, এর নিবারণই বা কিসে?

আজিজ ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে পড়ে। ওর এই ডাক্তাবি পড়ার পেছনেও বেশ একটু গল্পের মতো আছে।

বছব দুই পূর্বে আজিজ যখন স্কলারশিপ লইয়া আই.এ পাস করিল তখন সবাই ভাবিয়াছিলো, আজিজ বি.এ পড়িতে আবম্ভ কবিবে। কিন্তু আসলে তা হইল না। পরীক্ষা দিয়া ও বাড়ি যায়। গ্রামে তখন বসন্ত দুর্দম বেগে বহিয়া চলিয়াছে। প্রতিদিন লোক মবিতে লাগিল। মাটি দিবার কেহ নাই। প্রতিষেধক কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য উপদেশ দিতে কোনো লোক নাই। দিনের পর দিন গ্রাম উজাড় হইয়া চলিল। রোগ ছড়াইতে ছড়াইতে ক্রমে আজিজদের বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। ছোট ভাইটি ওর যেদিন ওরই সম্মুখে শত শুশ্রূষা সত্ত্বেও ওষুধ না লইয়া মবিয়া গেল, সেদিন ওর সমস্ত চিত্ত আলোড়িত হইয়া নিজেব বিদ্যাশিক্ষার উপর একটা ধিক্কার আসিল। পরীক্ষার পবে আজিজ ভাবিয়াছিলো, পিতাব সম্মতি লইয়া সে বি.এ পড়িতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু পিতার সম্মতি দেওয়ার সময়ও অতিবাহিত হইয়া গেল। তিনিও তাঁহার ছোট্ট ছেলেটিকে অনুসরণ করিলেন। আজিজের মা ছিলো না। বাপ আর ভাইকে কবরগাহে রাখিয়া আসিবার কালে মনে মনে আজিজ এই প্রতিজ্ঞা করিয়া লইল যে তাহাব ভ্রাতার এবং পিতার আত্মার কল্যাণের জন্য সে ডাক্তারি পড়িবে। রোগে শোকে সে সমস্ত গরিবকে সেবা করিবে। গরিবেরই আশীর্বাদের অশ্রু লইয়া সে বাঁচিয়া থাকিবে।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আজিজ তাহাব পিছনের ইতিহাসটাকেই উল্টাইতেছিলো। নিঃসহায় আজ ঐ মেয়েটির মতো সেও একদিন এমনিভাবে সহায সম্বলহীন হইয়াছিলো। কিন্তু তবুও তো কত তফাৎ। এ যে দুর্বল।

দূরে শহরের মধ্যে 'বন্দেমাতরম' আর 'আল্লাহু আকবরের' চাপা ধ্বনি ভাসিয়া আসিল। একটা বাড়িতে এই মাত্র আগুন দেওয়া হইল। তাহার লেলিহান শিখা সন্ধ্যার আকাশটাকে আরো ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে। আজিজের মুখে একটু ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল, ধর্মের নামে এরা কত অনাচার, কত অত্যাচারই না করিতে পারে। তবুও মনে করে, ইহারা ইহাদের স্বর্গের পথ পরিষ্কার করিতেছে।

হাসি মিলাইয়া যাইতেই ভিতরে অমলের চিৎকারে আজিজের মুখে কালো ছায়া নামিয়া আসিল। অমল তখন বলিতেছিলো, সুরমা, বোন আমার, মানুষ নাই। কার হাতে তোকে

সঁপে দিই...।

অমলের কথা ভালমতো শেষ হইতে পারিল না। মাঝপথে থামিয়া পড়িল। সুরমা চিৎকার করিয়া উঠিল, ওগো কে আছ? দাদা আমার কেমন করছে।

আজিজ তাড়াতাড়ি আসিয়া বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া অমলের হাতের নাড়ি ধবিল। সুরমা বলিয়া উঠিল, ডাক্তার সাহেব, দেখুনতো দাদা আমার—। সুরমার কথা থামিয়া গেল। ডাক্তারের চক্ষে জল।

কি ডাক্তার, দাদা আমার নাই? বলিযা সুরমা অমলের বুকের উপর লুটাইয়া পড়িয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ডাক্তার রুমাল দিয়া চক্ষু মুছিয়া বাহির হইয়া আসিল। এ দৃশ্য সহ্য করা তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া দাঁড়াইল। চক্ষু বাঁধ মানিল না। বারবার ভিজিয়া উঠিতে লাগিল।

আজিজ ডাক্তার। কিন্তু ডাক্তারি মন ওর ছিলো না। একবাব ডিসেকটিং রুমে আজিজ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলো। জ্ঞান হইবার পরে সার্জন আসিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'ইউ শুড নট হ্যাভ কাম টু দিস ডিপার্টমেন্ট মাই বয়। এ ভেরি টেন্ডাব হার্ট ইউ পজেজ।'

রাত্রি তখন নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। সুরমা এখনো ভাইয়ের বুক আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে। আজিজ আসিয়া ডাক দিল, সুরমা দেবী, একটু উঠুন। সুরমা উঠিয়া চাহিল আজিজের পানে। শান্ত সমাহিত সে চাহনি। কত বড় ব্যথা সঞ্চিত হইযা উঠিয়াছে ঐ চক্ষুর কোটবে। আজিজ নিজেব দৃষ্টি নামাইয়া বলিল রাত নয়টা বেজে গেছে। এরপরে সৎকার করানো অসম্ভব হবে। কাকেও পাওয়া যাবে না। এখন কয়েকটি বিশ্বাসী লোক যোগাড় করতে পেরেছি। আপনি একটু আমাব প্রাইভেট রুমটায যেযে অপেক্ষা করুন। আমি ফিরে এসে যা হোক একটা ব্যবস্থা করব।

আজিজেব নতদৃষ্টির উপর একদৃষ্টে সুবমা চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টি তাহার বিস্ময়ের। আজিজ কে? আজিজ ডাক্তার। হাসপাতালেব ডাক্তার। সে কোথায় যাইবে? কেনো যাইবে? কাহার জন্য যাইবে? ইহা কিছুই সুবমা বুঝিতে পাবিল না। ভাইকে তাহার সৎকার কবিতে হইবে। কিন্তু তাহাতে ডাক্তারের কি? সুবমাব মুখ দিযা বিস্ময়েব সহিত বাহির হইলো, আপনি কোথায যাইবেন?

ডাক্তাব ম্লান হাসিয়া বলিল, আমি না গেলে তো সৎকার করা সম্ভব হবে না। আর যার তার হাতে তো আমি এ মৃতদেহকে ছেড়ে দিতে পারিনে। ডোমের নিকট আমি এঁকে দিতে পারব না। তাছাড়া নেবার পথে লাশের উপর আবার আক্রমণ হতে পাবে। কাজেই আমাব না গেলেই নয়। আপনি কিছু ভয় করবেন না। আমার ঘরে একটা ইজি চেয়ার আছে। সেখানে যেয়ে আপনি একটু বিশ্রাম করুন।

তাহার ভাইয়েব শেষ গতি করিতে আজিজ যাইবে? এত দয়া তাহার? সুরমার চক্ষে জল আসিয়া পড়িল।

আজিজ বলিল, আপনি যান সুরমা দেবী। আপনি ঘরে গেলে পরে আমি দাদার দেহটা তুলব।

আবার সুরমার মাথা যেন কেমন হইয়া গেলো। কিছুক্ষণ পূর্বে এই দেহটাই ছিলো

তাহার একমাত্র ভরসাস্থল। এই দেহেরই আত্মা কিছুক্ষণ পূর্ব পর্যন্তও তাহার ভবিষ্যৎ নিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলো। আর এখন কিনা তাহাকে ধরিয়া রাখিবার জোও তাহার নাই। সুরমা আবার অমলের পা জড়াইয়া লুটাইয়া পড়িল। আজিজের চক্ষু ছাপিয়া কান্না আসিল। কিছুক্ষণ পরে আজিজ আবার ডাকিল, সুরমা, সুরমা দেবী, উঠুন।

সুরমা উঠিয়া বলিল, চলুন।

সুবমাকে ঘরের মধ্যে রাখিয়া আজিজ অমলের মৃতদেহকে লইয়া কয়েকজন সাথী সঙ্গে কবিয়া শ্মশানের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল। দূরে 'বন্দেমাতরমের' সাথে সাথে আর একটি বাড়ি জ্বলিয়া উঠিল।

আজিজ চলিয়া যাইবার পরে হঠাৎ সুরমার একটা কথা মনে পড়িল, মৃতদেহেব উপর পথে আক্রমণ চলিতে পারে। ভাবিতেই সুরমা শিহরিয়া উঠিল। তাহার ডাক্তারের কথা মনে পড়িল। যদি ডাক্তারও তেমনি কবিয়া আঘাত পায, যদি ডাক্তারও আর ফিরিয়া না আসে। দাদাকে সে ধরিয়া রাখিতে পাবে নাই। দাদা তাহাব চলিয়া গিয়াছে। তাহার পরে ডাক্তাব একমাত্র আশ্রযস্থল হইয়া আসিয়া দেখা দিল তাহাব ভাইয়ের মৃত্যু সময়ে। নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া সে তাহার দাদার মৃতদেহের সৎকার কবিতে গেল। কিন্তু যদি? সুরমা আর ভাবিতে পারিল না। নিজের মনে মনে বারবার সে আবৃত্তি করিতে লাগিল, না না, ডাক্তারের বাঁচিতে হইবেই। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই অপরিচিত ডাক্তাব ছেলেটি যে তাহার কত বড় আত্মীয, কতদূর নির্ভবস্থল হইয়া দাঁড়াইযাছে, তাহা ভাবিযা এত বড় বিপদের মধ্যেও সুরমার বিস্ময়বোধ হইল।

রাত্রি বারটা পার হইয়া গিয়াছে। আজিজ তখনো অমলের দেহ সৎকার করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারে নাই। সুরমার চিন্তা ক্রমশই বাড়িতে লাগিল। সুরমার পাশেব ঘবে ইমারজেন্সির কেসেব রুগীদের কাতরুক্তি শোনা যাইতেছে। দূবে একটা হল্লার সাথে সুরমা চমকিযা উঠিল। কি একটা অশুভেব সম্ভাবনায় সু‌মার মন শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

রাত্রি একটার কালে আজিজ ফিবিযা আসিল। চিতার আগুনেব হল্কার জন্য তখনো আজিজের মুখ লাল। আজিজ ফিরিয়া আসিতেই সুরমা ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ডাক্তার আপনি ফিরে এসেছেন? কোনো বিপদ হয নি তো?

ডাক্তার একটু হাসিয়া বলিল, না, সম্ভাবনা ছিলো। কিন্তু হয নি। কিন্তু আমি চিন্তিত হয়েছিলুম আপনার জন্যে।

: আপনার মুখ অত লাল কেন?

: আগুনের তাপে বোধ হয়। কিন্তু সুরমা দেবী আপনি তো পরিশ্রান্ত। আপনার বিশ্রামের জন্য আমি কি বন্দোবস্ত করতে পারি? যে ঝড় এইমাত্র আপনার ওপর দিয়ে বয়ে গেল সে ঝড়ের প্রাবল্যই আমায় বুঝিয়ে দিয়েছে কত বড় হয়ে এর আঘাত লেগেছে আপনার ওপরে। কিন্তু কিইবা সাধ্য আছে আমাদের এর বিরুদ্ধে? আচ্ছা সুরমা দেবী, আপনাদের বাসায় কোনো চাকর আছে?

: না, একটা চাকর ছিলো। সেও আজ দু'দিন পর্যন্ত আসে না।

: আচ্ছা সে ব্যবস্থা হবে। আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনি ইজি চেয়ারটায় একটু বিশ্রাম

করে নিন। আমার ওয়ার্ডে আরো প্রায় গোটা বারো কেস এসে জমা হয়েছে। তাদের এ্যাডমিশন করে নিতে নিতে প্রায় সকাল হয়ে যাবে। দেখি তখন একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতে পারি কি না। আমার ডিউটিও তখন শেষ হয়ে যাবে। বলিয়া আজিজ সুরমাকে একটু বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিয়া ডিউটিতে চলিয়া গেলো।

ডাক্তার ফিরিয়া আসিয়াছে। এতক্ষণে সুরমা একটু নিশ্চিন্তে নিজের জীবনটা লইয়া আলোচনা করিবার অবসর পাইল। সুবমা ভাবিয়া পাইল না মানুষের জীবনটা এত দ্রুত পরিবর্তিত হইয়া যায় কেমন করিয়া। তাহা না হইলে গত পরশু যে নিজের জীবন সম্বন্ধে, তাহার দাদার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত কিছুব কল্পনাই না কবিয়াছিলো। আর আজ সে সমস্ত কিরূপভাবে এক নিমেষের ফুৎকারে সব অন্ধকারে লীন হইয়া গেল। সে সমস্তকে আর দ্বিতীযবার কল্পনা করিবার পথও তাহাব বহিল না। ভাবিতে ভাবিতে সুরমা ইজি চেয়ারে হেলান দিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়া আসিযাছে। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে চিৎকার ধ্বনি আর শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না। দূরে কতগুলি বড় বড় কাপড়ের দোকান পুড়িয়া শেষ হইতেছিলো। তাহার মৃদু আলোকরশ্মি কিঞ্চিৎ ধুমের সহিত আকাশের দিকে কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতে উঠিতে সেখানের আকাশটাকে একটু গাঢ়তর করিয়া তুলিতেছিলো। আজিজের ডিউটি শেষ হইয়া আসিয়াছিলো। হাসপাতালেব গাড়িটার ব্যবস্থা করিয়া সুরমার দুযারে আসিয়া আজিজ ডাক দিল: সুবমা দেবী।

সুরমার তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। কবাট খুলিযা বলিল, আপনাব ডিউটি শেষ হলো?

: হ্যাঁ, আপাতত শেষ হয়েছে। একটা গাড়ির ব্যবস্থাও করতে পেরেছি। শহরের দাঙ্গাটা এখন একটু শান্ত আছে। চলুন আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

ডাক্তারের নির্দেশমত সুবমা আসিয়া গাড়িতে উঠিল। আজিজ ড্রাইভারকে রাস্তার কথা বলিয়া গাড়িতে উঠিল।

সুরমা এতক্ষণে অনেকখানি স্বাভাবিক হইয়া উঠিতে পারিয়াছিলো। অমল থাকিতে সুরমা একটা দিনও ভাবিতে পারে নাই যে, দাদার অনুপস্থিতিতে তাহার নিজের কোনো অস্তিত্ব থাকিতে পারে। কিন্তু এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সুরমার অনেকখানি জ্ঞান, অনেকখানি অভিজ্ঞতা হইয়া গিয়াছে। দাদার মতো স্নেহ, দাদার মতো উদাব হৃদয় যে আর কাহারো থাকিতে পারে সে কথাটাও সুরমা এই অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝিতে পারিল। গাড়িতে সম্মুখে ঐ ড্রাইভাবের পাশে বসা ঐ যে ডাক্তার ছেলেটি, ভিন জাতি, ভিন ধর্ম, অথচ কত উদার তাহার হৃদয়, কত কোমল তাহার অন্তর। একথা কি সে এই একটি রাত্রির মধ্যে কম বুঝিতে পারিয়াছে? এব মধ্যেই তো সে সুবমার দাদার অভাব কতটা পূরণ করিয়া দিয়াছে। দাদার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও সুবমা যখন দাদার পাশে বসিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য আকুলভাবে চেষ্টা করিতেছিলো, তখন তাহার সম্মুখে তাহার ভবিষ্যৎটা কত ভয়াবহ হইয়াই না দেখা দিয়াছিলো। আর সত্যই তো, আজ এই আত্মীয়-স্বজনহীন দাঙ্গা-হাঙ্গামার শহরে তাহার ভাইয়ের অন্তিম গতির কে ব্যবস্থা করিত। হাসপাতালের কর্মকর্তারা যদি তাহাব মৃতদেহকে ডোমের হাতেই তুলিয়া দিতেন তাহা হইলেই বা সে

কি করিতে পারিত। এই হাঙ্গামা মাথায় লইয়া কে তাহাকে বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিতো। অথচ বেচারির না হইয়াছে একটু ঘুম, না একটু বিশ্রাম। সারাটা পথ সুরমার চিত্ত ব্যাপিয়া আজিজের কথাই দোল খাইতে লাগিল। তাহার অন্তর আজিজের প্রতি কৃতজ্ঞতায়, শ্রদ্ধায়, অকৃত্রিম সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিল।

বাসায় নামিয়া আজিজ বলিল, সাবারাত্রি আপনি একটুকুও চক্ষু বন্ধ করতে পারেন নি, সে আমি বুঝি। আর যে বিপদ এইমাত্র বয়ে গেল তার পবে একটুও বিশ্রাম করা যে কত দুঃসাধ্য সে কথা ডাক্তার হলেও আমার চেয়ে বেশি কে জানে? আপনি দেরি করবেন না। এখনি স্নানাদি সেরে নিন। আমি এই গাড়িতেই যাচ্ছি। কিছু খাবার যদি কোথাও পাই, দেখি। আর একটি বামুনকে চেষ্টা করে যদি পাই তো আমি এখনি নিয়ে আসব। ...

সুবমা ভারি গলায বলিল, আমি যদি ঘুমোতে না পেরে থাকি, আপনি যে একটু জিবোতেও পান নি। সেও তো আমি নিজের চক্ষেই দেখেছি। না, ডাক্তার সাহেব, আপনি যা কবেছেন, কৃতজ্ঞতা দেখিয়ে সে অমূল্যদানকে আমি মূল্য দিতে চাইব না। কিন্তু আপনিও আব দৌড়াদৌড়ি করতে পারবেন না।

একটু থামিয়া আবার বলিল, আর বামুন ঠাকুরের জন্যও এত ব্যস্ত হতে হবে না। আমি নিজের হাতেই সব আপাতত কবে নিতে পারব। আর আপনি কোথায় পাবেন বামুন ঠাকুব। কে আসবে এই দাঙ্গার কালে নিজের প্রাণটুকু হারাতে। বৃথা চেষ্টা করবেন না। ওর চেয়ে আপনি দেবি না করে হাত-মুখ ধুয়ে নিন। চা বোধ হয় কিছু আছে। বিনা দুধে আমিই সত্বর যোগাড় কবে আনছি। বলিয়া সুরমা আজিজকে কথার অবসর না দিয়া বাহির হইয়া গেল।

আজিজেব সেবার একান্ততায় সুরমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিলো। এই সেবার একাগ্রতাই সুরমাকে তাহার এতবড় বিপদের মধ্যেও সান্ত্বনা আর ভরসা দিয়াছিলো। কিছুটা পরিমাণে সে তাহার নিজের দুঃখও এরই জন্য ভুলিতে পারিয়াছিলো।

আজিজ একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। বাত্রি জাগিবার অভ্যাস তাহার আছে। কিন্তু ঘুমে ক্লান্ত না হইলেও অনেকগুলি অনেক প্রকার চিন্তা আসিয়া তাহার প্রাণশক্তিকে নিস্তেজ কবিয়া ফেলিয়াছিলো। একটি আত্মীয় নাই, বান্ধব নাই, একটি বামুন ঠাকুর পর্যন্ত নাই। একা নির্বান্ধবভাবে কেমন করিয়া সুরমা থাকিবে। এই চিন্তাটাই তাহাকে বড় করিয়া পাইয়া বসিল। আজিজ বুঝিতে পারিযাছে, এই বিপদের সময়ে আজিজের ওপর কতখানি নির্ভর করিয়া আছে সুরমা। কিন্তু সেই বা কি করিতে পারিবে। ক্ষণিকের দেখা। একে স্থায়ী করে রাখার বিপদও কি কম। হাসপাতালের ডাক্তার সে। এই দাঙ্গার কালে এই সাহায্যকে হিন্দু-মুসলমান, কেহই কি ভাল চক্ষুতে দেখিতে পারিবে? অথচ কোন্ হৃদয়েই বা সে সুরমাকে সম্পূর্ণ বিপন্ন করিয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইবে। এই সমস্ত চিন্তা আসিয়া আজিজকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিলো। আজিজ নিজেকে মহা সমস্যায় দেখিতে পাইল।

স্নান করিয়া চায়ের ব্যবস্থা সারিয়া সুরমা চায়ের সরঞ্জাম লইয়া ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। পায়ের শব্দে আজিজ চক্ষু মেলিয়া চাহিল। ডাক্তার আজিজের চক্ষে একটা মস্ত বড়

আর্ট এক্ষণে ধরা পড়িল। সবুজ সাধারণ একখানা শাড়ি পরনে সুরমার। অবিন্যস্ত চুলের কয়েকটি আসিয়া কপোলের দুই পাশ দিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছিলো। অনিন্দ্যসুন্দর মুখে গত রাত্রির বিপদের ছায়া পড়িয়া তাহাকে আরো গম্ভীর, সুন্দর ও শান্ত করিয়া তুলিয়াছিলো। আজিজ বিস্ময়ে মুগ্ধ–প্রায় চাহিয়া রহিল।

সুবমা ঘরে পা দিযাই বলিল, খুব ঘুম পাচ্ছে বুঝি? পাবেই তো। ঘুমের তো আর দোষ নয়। এক নিমেষের জন্য কি চক্ষের পাতা বন্ধ করতে পেরেছিলেন? কিন্তু এখনো মুখ ধোননি যে? যান। আমার চা হয়ে গেছে।

আজিজ সুবোধ ছেলেটির মতো আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত হইয়া উঠিয়া বলিল, যাই।

আবাব প্রশ্ন জাগিল, এতো বিপদের মধ্যে এতো যে স্বাভাবিক, সে কাহাব জন্য, কাহাকে আশ্রয করিযা?

চা ঢালিতে ঢালিতে সুবমা বলিল, আজকেও আপনার নাইট ডিউটি আছে নাকি?

: না, আজ আব নাই।

: আচ্ছা ডাক্তার সাহেব, রাতেব পর রাত, দিনের পর দিন ঐ রুগীদের আর্তধ্বনির মধ্যে থেকে কাজ কবতে আপনার অসহ্য বোধ হয় না?

আজিজ বুঝিল, সুরমা নিজেব দুঃখ ভুলিযা স্বাভাবিক হইতে চাহিতেছে।

আজিজ বলিল, যতক্ষণ হাসপাতালে থাকি ততক্ষণ আমাব হুঁশ থাকে না, আমি কোথায আছি। কোনো দিনই আমি হাসপাতালে বসে নরমাল কনডিশনে থাকতে পারিনে। কি একটা ভাব, একটা ইনস্‌পিরেশন আমাকে রুগীদের ...।

*　　　*　　　*

এখানে এসে পাণ্ডুলিপিব দুটি পৃষ্ঠা পাওয়া গেলো না। ছিঁড়ে গেছে। তারপরে আরো কয়েকটি পৃষ্ঠা আছে। গল্পেব নাযক–নাযিকা পবস্পরেব প্রীতিতে আবদ্ধ হচ্ছে। তবু তাদের দ্বিধা আছে। দ্বন্দ্ব আছে। একের মনে প্রশ্ন: এর শেষ কোথায়? অপবেব মনের প্রশ্ন: 'ভিনজাতের এই যে লোকটি প্রতিদিন যে তাহাকে বিপদের আরম্ভ হইতে আগুলিয়া রাখিতেছে, তাহার বিপদের আরম্ভ হইতে সে যে নিঃস্বার্থভাবে নিজেকে অসংখ্য বিপদের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহাকে বিপদেব আগুনেব হল্কা হইতে আড়াল করিয়া রাখিল, তাহাব কি কোন দাম নাই?...

তারপবে আবাব ছিঁড়ে গেছে কিশোর লেখকের সেই পাণ্ডুলিপি। কেমন করে লেখক গল্পটিকে শেষ করেছিলো, তা আজ আর জানার কোনো উপায় নেই। কিন্তু সেটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। যে কয়টি পৃষ্ঠা পাওয়া গেল এই পাণ্ডুলিপির, তাতে অন্তত চল্লিশ বছর পূর্বের ঢাকা শহরের অধ্যযনবত মুসলিম সমাজভুক্ত একটি কিশোরের মনের কিছু আভাস পাওয়া গেল। হয়ত এর মূল্য আছে কিছু, চল্লিশ বছর পরের প্রবহমান জীবনের নতুন কারিগরদের কাছে। কোনো কিছুই শূন্যের ওপর তৈরি হয না। আর তাই কিছু তৈরির সময়ে তার ভেতরে সন্ধান আবশ্যক তার জমির, সে জমির নরম, শক্ত, গভীর, অগভীর উপাদানের।...

২০. ৭. ৮৩

আবে আইজ আর থাউক্কা

ঈদের পবদিন জিল্লুব রহমান সিদ্দিকী এসেছিলেন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে আমাদেব বাসায়, সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য। এখন অধ্যাপক জিল্লুব রহমান সিদ্দিকীকে কাছে পেলে আমি 'জিল্লুর' বলে ঘনিষ্ঠতার সম্বোধনে ডেকে থাকি।

জিল্লুব রহমান সিদ্দিকী বেশ কযেক বছব যাবৎ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালযের উপাচার্যের দাযিত্ব পালন কবে আসছেন। ইংবেজিব অধ্যাপক। বাংলাদেশের তিনি একজন সুপবিচিত কবি, প্রবন্ধকার এবং চিন্তাশীল সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ। তাঁর আলাপআলোচনা কিংবা বক্তৃতাতেও বেশ একটি চারুশীলতার পরিচয় ফুটে ওঠে। পোশাক-পরিচ্ছদে অনাড়ম্বব, কিন্তু সুপবিপাটি। যে কারুর সঙ্গে আলাপে দুষ্প্রাপ্যরূপে ভদ্র, সুজন।

আমাকে তিনি আগে থেকেই চিনতেন। তাঁরও আগে তাঁব স্ত্রী আমার স্ত্রীকে চিনতেন। তখন অবশ্য এঁবা কেউ কারুব স্ত্রী হন নি। জিল্লুরের স্ত্রী শিক্ষাজীবনে আমাব স্ত্রীব কিছু বযোকনিষ্ঠ বলে আমার স্ত্রী তাঁকে নাম ধরে ডাকেন। এঁদের সাক্ষাৎ ঘটেছিলো যখন এঁবা ইউনিভার্সিটিতে বি.এ এবং এম.এ পড়েন, তখন।

জিল্লুব আমাকে জানেন জেলখাটা লোক বলে। পঞ্চাশেব দশকে জেলখাটা মুসলমান বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের একটা ভিন্নতর সম্মান ছিলো উন্মুখ মুসলমান বুদ্ধিজীবী এবং চিন্তাবিদদেব কাছে।

পঞ্চাশেব দশকেরও বোধ হয় পরের কথা। আমি ছিলাম রাজশাহী জেলে বন্দী। হয়ত '৬০-'৬১-ব দিকে। আমাব স্ত্রী ঢাকা থেকে আমাকে পাঠাতে চেযেছিলেন কিছু খাবাব-দাবার, টুকিটাকি। জিল্লুর তখন রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজিব অধ্যাপক। জিল্লুব আগ্রহ কবে তা সংগ্রহ করে আমার জেলখানাতে পৌছে দিযেছিলেন। এ কাজটি আমার প্রতি তাঁব একটি সশ্রদ্ধ প্রীতিরই পবিচয। তাবপবে আমাব নিজের বর্তমানে, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতাব পর্যায়ে প্রায়ই আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে কোনো আলোচনাব বৈঠকে কিংবা সামাজিক কোনো অনুষ্ঠানে। কিন্তু সম্প্রতি এই পরিচয়টিকে অধিকতর ঘনিষ্ঠ করে তুলল আমাদের উভযেব উত্তর-পুরুষগণ : তথা আমার মেযে এবং তাঁর মেজ ছেলেটি। তারা উভযই চিকিৎসাশাস্ত্রের সঙ্গে জড়িত। ছেলেটি (শাকিল) মাত্র মেডিক্যাল কলেজের শেষ পরীক্ষা পাস কবেছে। আমার মেযেটি শেষ বর্ষে উঠেছে। তাদের নিজেদের জগতের বক্তৃতা, বিতর্ক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাদের পাবস্পরিক পরিচয়। উভয়েরই সরল এবং সহাস্য সামাজিকতার একটি গুণ আছে এবং কিছুদিন পরে উভয়েই সরলভাবে তাদের বাবা-মা'র কাছে বলল : তারা দু'জনে সাংসারিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়। ছেলে, মেয়ে, কোনো পক্ষের বাবা-মা'রই এতে আনন্দ বই আপত্তির কোনো কারণ ছিলো না। এ ক্ষেত্রে জিল্লুরের মন্তব্যটি ছিলো সরস। বলেছিলেন : যা দিনকাল! ছেলে যে বাবা-মাকে জিজ্ঞেস করেছে, এতেই তো বাবা-মা কৃতজ্ঞ।

কাজেই জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী সামাজিক আত্মীয়তার ক্ষেত্রে আজ আমার একান্ত ঘনিষ্ঠ। গতকাল কিছুক্ষণ বসেছিলেন। 'কেমন আছেন' কথার পরেই আমি

বললাম :'চল্লিশের দশকের ঢাকা' সম্পর্কে আপনার কি ধারণা? আপনি কবে এসেছিলেন ঢাকা?' জিল্লুর প্রশ্নটির তাৎপর্য বুঝলেন। সম্প্রতি 'চল্লিশের দশকের ঢাকা' আমাকে প্রায় ভূতের মতো পেয়ে বসেছে। এর ওপর একটি লেখা এবারকার ঈদসংখ্যা 'সংবাদ-এ' দিয়েছি। সবটা বেবোয় নি। তবু কিছুটা বেরিয়েছে। তাতে চল্লিশের দশকের ঢাকার কিছু সামাজিক-রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই একই সংখ্যায় জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর নিজেরও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সমস্যার ওপর একটি লেখা বেরিয়েছে। একই সংখ্যায় একই পৃষ্ঠায় রাজশাহীর অধ্যাপক সনৎকুমার সাহার 'আর এক একুশে ফেব্রুয়ারি' নামে 'তেভাগা' আন্দোলনের প্রসঙ্গ নিয়ে একটি লেখা বেরিয়েছে। এ লেখাটিও ভাল। পুবোন যে ঘটনা ও আন্দোলনে মহৎ ঐতিহ্যের সম্ভার রয়েছে তাকে এ যুগের তরুণ ও সমাজকর্মীদের কাছে তুলে ধবার যে প্রয়োজনের কথা আমি 'চল্লিশের দশকের ঢাকা'র সূচনাতে উল্লেখ করেছি, সেই বোধ থেকেই সনৎও তেভাগার অবিস্মরণীয় কিছু ঘটনাকে আবার স্মরণ কবেছেন এবং আমাদের স্মবণ কবিয়ে দিযেছেন। প্রখ্যাত কৃষকনেতা আবদুল্লাহ রসুল তেভাগার কাহিনী নিয়ে যে গ্রন্থ রচনা করেছেন, তার আলোচনা প্রসঙ্গেই ব্যাপারটি এসেছে।

জিল্লুরের কাছে আমাব প্রশ্নে জিল্লুর বললেন : একে তো ছেলে আমি যশোরের এবং কলকাতার সাথে চলাচলের ক্ষেত্রে আমাদের সম্পর্ক ছিলো সকাল-বিকালের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তায আমার শৈশব যদি বা কেটেছে যশোরে. কৈশোর কেটেছে জলপাইগুড়িতে, আব্বাব সঙ্গে। আবো যখন একটু বড় হলাম, আই.এ পড়ার সময় এল, তখন গেলাম স্বাভাবিকভাবে কলকাতার প্রেসিডেন্সিতে। ঢাকাতে তো আমি আসি নি। কিংবা সঠিকভাবে বলতে গেলে এসেছি ভাঙ্গাভাঙ্গির পরেই মাত্র, '৪৭-এ!

আমি বললাম : তবু কলকাতা থেকে ঢাকাকে সেকালে কি চোখে দেখতেন?

জিল্লুর বললেন : ঢাকার প্রধান পরিচয় ছিলো আমাদের কাছে দাঙ্গাব শহর বলে। তাই ভীতিজনক।

আমি বললাম : অথচ '৪৬-এ সাম্প্রদায়িক গণহত্যা হলো কলকাতাতে। তার প্রতিক্রিয়ায় ঢাকাতেও শুরু হয়ে যেতে পারত নরমেধযজ্ঞ। কিন্তু তা যে হলো না, সে স্মৃতি আমার সচেতন গৌরবের স্মৃতি। ১৬ আগস্টের খবরে আমরাও কেঁপে উঠেছিলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যকাব প্রগতিশীল অংশটি। আমি তখন এম.এ পড়ি এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে বেশ কিছুটা জড়িত হয়েছি। আমরা ১৭ কিংবা ১৮ আগস্ট ঢাকাতে বের করেছিলাম হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি রক্ষার শান্তি মিছিল। সে মিছিলটি স্মবণীয় ছিলো। তার উদ্যোগ এসেছিলো বামপন্থী, সমাজতন্ত্রী মহল থেকে। ঢাকার মুসলিম লীগের প্রগতিশীল কর্মীবৃন্দ যাঁরা বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন, তাঁরাও যুক্ত ছিলেন এই মিছিলে। এ কারণে শাহ আজিজুর রহমান, ফরিদ আহমদ এদের মতো সেদিনকার মুসলিম ছাত্র আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়দের পক্ষে এ শান্তি মিছিলের বাইরে থাকা সম্ভব হয় নি।

শাহ আজিজের কথা উঠতে জিল্লুর বললেন, ঐ প্রেসিডেন্সিতে পড়ার কালে মুসলিম লীগ

এবং শাহ্ আজিজের রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ আমারও একটু ঘটেছিলো। '৪৬ সালে ফরিদপুরের নির্বাচনে ভলান্টিয়ারি করেছি বলে আমারও মনে পড়ে। সেটার নেতৃত্ব শাহ আজিজই দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন আমাদের, মোহন মিয়াকে জেতাতে হবে। মোহন মিয়াই মুসলিম লীগের আসল প্রার্থী। বাদশাহ্ মিয়া নন। বাদশাহ্ মিয়াকে সমর্থন যোগাচ্ছেন জনাব সোহরাওয়ার্দী।

জিল্লুরও যে রাজনীতির কাছাকাছি কিছুটা ছিলেন তা শুনে আমার আনন্দ হলো। শাহ আজিজকে আমি '৪২-৪৩ সাল থেকে দেখেছি। '৪৬ সালে আমার মনে হয়, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। ইংবেজিতে। অবশ্য এর আগে আলীগড়ও হয়ে এসেছেন। তুখোড় বক্তা ছিলেন : ইংবেজি, বাংলা ও উর্দুতে। অবশ্য কারুব মধ্যে এতে বেশি দক্ষতা থাকলে স্বাভাবিকভাবে তার মধ্যে অহমিকা আর দক্ষতার সুবিধাজনক ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি প্রবণতারও প্রকাশ ঘটে। এক্ষেত্রে শাহ্ সাহেব কোনো ব্যতিক্রম ছিলেন বলে আমার স্মৃতিতে তেমন কোনো ঘটনা নেই। শাহ্ সাহেবের সঙ্গে বহুদিন ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ ঘটে নি। সাম্প্রতিককালে তিনি 'রাজপুরুষ' অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সবকাবি নেতার স্থানেও অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

নিজের বন্ধু-বান্ধব কেউ এমন হলে তখনি আমার বেশি করে সঙ্কোচ জাগে। ব্যবধানটা তখনি বৃদ্ধি পায়। অথচ এটা ঠিক যে চল্লিশের দশকের ঢাকার কর্মকাণ্ডে, এর প্রতি-ধারার অন্যতম নেতা হিসেবে শাহ্ আজিজুর রহমানেব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিলো।

দাঙ্গার শহর ঢাকা। একথা ঠিক। 'ক্রনিক' দাঙ্গা। তবু তো ঢাকা থেকে পালালাম না কোথাও। এমন মনে পড়ে না, ঢাকাতে দাঙ্গা লেগেছে এবং সে কারণে হোস্টেল থেকে গাঁটবি-বোচকা বেঁধে ঢাকা ত্যাগ করে নিজ বাড়ির নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেছি। না, তেমন কোনোদিন হয নি। ঢাকার দাঙ্গা আমাদেব সেকালের ম্যালেরিয়ার মতো আমরা সহ্য কবেছি। তা নিয়ে জীবনযাপন করেছি। মহামারী আকারে ঢাকায় কখনো দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে নি। গণহত্যা ঘটে নি। দাঙ্গা বাধলে তার শিকার অবশ্য নিরীহ পথচারীরা হয়েছে। যাবা গ্রাম থেকে হঠাৎ শহরে এসেছে। কোন্‌টা প্রধানত হিন্দুপাড়া, কোন্‌টা মুসলমান পাড়া, তা যাব জানা নেই। ঢাকার মানুষ দাঙ্গায় নিহত হয়ত কমই হয়েছে। দাঙ্গা বেধেছে মহররম বা জন্মাষ্টমী উপলক্ষে। কিংবা ভারতের অপর কোথাও কোনো সাম্প্রদায়িক ঘটনাব প্রতিক্রিয়ায় ঢাকায় যদি কেউ নিহত হয়েছে তবেই বুঝতাম দাঙ্গা বেধেছে। দাঙ্গাব এমন সংবাদে শহরটা বিভিন্ন জায়গাতে দু'ভাগে আপসে ভাগ হয়ে যেতো। যেমন ধরা যাক, ঢাকার মধ্যকার মূল সড়ক নওয়াবপুরের কথা। ঢাকা রেল স্টেশন থেকে নওয়াবপুর ছিলো হিন্দু এলাকা। কিন্তু নওয়াবপুর বোড যেই রায সাহেবের বাজারেব পুল পৌঁছত, অমনি শুরু হত মুসলিম এলাকা। সদরঘাট থেকে তখন আমি মুসলমান যদি রমনা আসতে চাইতাম তবে রায় সাহেবের বাজার পর্যন্ত এসে ঘোড়ার গাড়ির 'খেয়া' ধরতাম। ইংলিশ রোড আর নাজিমুদ্দীন রোড বরাবর এই খেয়া চলত। যেন মাঝখানে একটা নদী বা খাল বিশেষ। ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানরা শেয়ারে যাত্রী নিয়ে ইংলিশ রোডের বিপজ্জনক এলাকা পার করে ফুলবাড়িয়া-নাজিমুদ্দীন রোডে আমাদের পৌঁছে দিত।

দাঙ্গার আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি দেখা দিতো ঢাকার বিখ্যাত দু'টি পর্বের সময়ে। এদের একটি ছিলো জন্মাষ্টমীর মিছিল। 'জন্মাষ্টমী' মানে শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন: ভাদ্র মাসে পর্বটি অনুষ্ঠিত হতো। হিন্দু সম্প্রদায়ের। আর একটি ছিলো মহবরমের মিছিল। হিন্দুদের জন্মাষ্টমীর মিছিলের উদ্যোগ নিত হিন্দু মধ্যবিত্ত তরুণবা এবং শাঁখারী পট্টি বা নওয়াবপুরের স্থানীয় অধিবাসীরা। এই মিছিল হয়ত শুরু হতো সদরঘাট বা তারও পূর্বের লালকুঠি, লোহারপুল ইত্যাদি এলাকা থেকে। বহু চলন্ত মঞ্চে নানা রঙ্গ-তামাশা মঞ্চস্থ হতো। এই সব চলন্ত মঞ্চ আস্তে আস্তে অগ্রসর হত নওয়াবপুর রোডের মধ্য দিয়ে। দু'পাশে রাস্তায় এবং বাড়ির বারান্দা ও ছাদে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই মিছিল দেখত। দূর-দূর গ্রাম থেকে শিশু কিশোর বৃদ্ধ বৃদ্ধারা আসত। জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখা একটা পুণ্যের কাজ বলে তারা মনে করত। মহববমেব মিছিলও তাই। তাজিযা বেরুত। 'হায হাসান, হায হোসেন' কবে শোক মিছিল বেরুত। আজকাল জন্মাষ্টমীব মিছিল একেবারে বিলুপ্ত। মহবরমেব মিছিলেরও সেই শান আছে বলে মনে হয না। এ ব্যাপারে দুটো জিনিস আমার স্মৃতিতে ভাসে। একটি হচ্ছে, চল্লিশেব দশকের মধ্যভাগে এই দু'টি মিছিলের উপলক্ষ এলেই আমরা অর্থাৎ বামপন্থী প্রগতিশীল বাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মহল উদ্বিগ্ন হযে উঠতাম, পাছে না এই উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বেধে যায় এবং যাতে তা না বাধে তার জন্য উভয় সম্প্রদাযেব এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রধানদের নিযে শান্তি কমিটি গঠিত হতো। এমন কমিটি গঠনেব মূল উদ্যোগ আসত সেদিনকার ঢাকার কমিউনিস্ট পার্টি থেকে। তারাই গাযে পড়ে, উদ্যোগ নিয়ে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস নেতাদের যৌথ মিটিং করতেন। এমন মিটিং অনেক সময়ে নওয়াব বাড়িতে কিংবা ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা ঢাকা বিভাগেব কমিশনারেব অফিসেও অনুষ্ঠিত হতো। যখন উত্তেজনা বেড়ে যেত তখন শান্তি কমিটি এবং সবকাবি প্রশাসন উভয়ই যৌথভাবে ব্যবস্থা নিযেছে কিভাবে শান্তি রক্ষা করা যায়। নওয়াবপুব পুল যেন ছিল 'দুই দেশেব' মধ্যকাব সীমান্ত। সরকাবি ফৌজ নওয়াবপুর পুলেব ওপব একদল উত্তরমুখো অর্থাৎ হিন্দু এলাকার দিকে আর একদল দক্ষিণমুখো অর্থাৎ মুসলিম এলাকাব দিকে বন্দুক উঁচিয়ে পাহারা দিচ্ছে। এমন দৃশ্য চোখ বুজলে আমি এখনো দেখতে পাই।

ঠিকই, উত্তেজনা বাজনৈতিক কারণে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ধর্মীয় মিছিল ক্রমান্বযে বাজনৈতিক রূপ গ্রহণ করছিলো: জন্মাষ্টমীব চলন্ত রঙ্গমঞ্চে হযত বা জিন্নাহ সাহেবকে নিয়ে কৌতুক করা হচ্ছে কিংবা অপর কোনো রাজনৈতিক ঘটনাকে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। তাবই পাল্টা মহররমের সময়ে মহবরমের মিছিলে মুসলিম লীগ অর্থাৎ মুসলমানদের প্রধান রাজনৈতিক ধারা যে-সব নেতাকে হেয করতে চাইত তাদের মূর্তি বা কুশপুত্তলিকা দাঁড় করিয়ে মঞ্চ তৈরি কবে তা চালিয়ে নিতো। জিন্নাহ সাহেবকে যেমন হিন্দু সমাজ পছন্দ করতো না, তেমনি মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক গোড়াপন্থীগণ কংগ্রেসের অন্যতম মুসলিম নেতা মওলানা আজাদকে পছন্দ করতো না। তারা তাঁকে মনে করতো কওমের বিশ্বাসঘাতক বা 'গাদ্দার' বলে। আর তাই মহররমের মিছিলে চলন্ত মঞ্চে তাঁকে বিচার করার একটি ব্যঙ্গ অনুষ্ঠানের কথা আমার স্মৃতিতে ভেসে উঠছে।

এসবই ছিলো রাজনৈতিক দাহ্য পদার্থ। আর তাই চল্লিশের দশকের গোড়াতে ঢাকাতে এই দু'টি মিছিল দেখার যদি আগ্রহ ছিল আমার মনে, পরবর্তীকালে একজন সচেতন কর্মী হিসেবে এই দু'টি মিছিলের সময় হলেই উদ্বেগে আশঙ্কায় মন ভরে উঠতো।

যে শান্তি রক্ষার প্রচেষ্টার কথা বলেছি তা সেদিন হয়তো ভয়ানক কিছু ছিলো না। এ সব সত্ত্বেও বিছিন্নভাবে ঘটনা যে না ঘটেছে, তা নয়। তবু জন্মাষ্টমী আর মহররমে যে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ ঘটত ঢাকায়, তাতে অশুভ শক্তির বাইবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি এবং সহনশীলতা এবং আনন্দভোগের মনোভাবটি প্রধান না হলে ১৯৪৬-এর আগস্টে কলকাতায় যা ঘটেছে তা ঢাকায় প্রতিবছর অন্তত দু'বার করে ঘটতে পারতো। তেমন যে ঘটে নি, তাব কারণ নিয়ে আমাদের তরুণ গবেষকদেব কি একটু গবেষণা করা উচিত নয়?

এই প্রসঙ্গে দাঙ্গাব ক্ষেত্রেও ঢাকাব স্থানীয় অধিবাসীদেব রসবোধের যে বৈশিষ্ট্য এককালে সুপরিচিত ছিলো, তার উল্লেখ করা যায়।

আগামসিহ্ লেন মুসলমান পাড়া। বেচাবাম দেউড়ী হিন্দুপাড়া। দাঙ্গা চলছে। দাঙ্গার আবহাওয়া। দাঙ্গা কেবল ছুরি দিয়ে হয না। আগামসিহব ইট পড়ছে বেচারাম দেউড়ীব টিনের চালে। বেচাবাম দেউড়ীব ইট আগামসিহ্তে। বিবামহীনভাবে ইটের উত্তর প্রত্যুত্তর চলতে চলতে বাত দশটা পার হয়েছে। ঘুমের সময় এসে গেছে। তখন আগামসিহ্ ঢাকাইযা ভাষায ডাক দিযে বলছে : আবে, আইজ আর থাউক্‌কা, ঘুমা। আবাব কাইলকা ছুরু করিছ।' বেচারাম দেউড়ী জবাব দিচ্ছে : ঠিক আছে। ...

অগ্রজপ্রতিমকে স্মরণ করি

প্রযাত অধ্যাপক এ কে নাজমুল করিমেব লেখা 'ফাল্গুনকরা'। কিন্তু নাজমুল করিম লেখক হিসেবে স্পষ্টভাবে নিজের নাম ব্যবহার করেন নি। লেখকের নাম লিখেছেন, 'ইবনে বশিদ', অর্থাৎ 'রশীদেব পুত্র'। নাজমুল করিমের পিতা ছিলেন শিক্ষাবিদ আবদুব রশিদ। কুমিল্লা জেলার মানুষ। নাজমুল করিম তাঁর বাবা, মা, দাদা, নানা, পূর্ব-পুরুষদের জীবনের, তাদেব সময়কার সমাজেব ঘটনা, কাহিনী, কিংবদন্তি, সংস্কাব—এই বইতে বর্ণনা করেছেন তৃতীয় পুরুষ হিসেবে। এর মধ্যে ভেসে উঠেছে পূর্ববঙ্গের একটি গ্রামের একটি মুসলিম পরিবারের ক্রমবিকাশের কাহিনী। লেখকের লেখার ধরনটি প্রাঞ্জল। কথা ছোট ছোট সহজ বাক্যে আবদ্ধ। তাঁর বিবৃত কাহিনীতে উনিশের শেষ এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকের গ্রামীণ সমাজচিত্রেরও আভাস পাওয়া যায়।

এই 'ফাল্গুনকরা'র প্রকাশকাল দেখা যায় ১৯৫৮ সন। নাজমুল করিমের একটি সমাজতাত্ত্বিক তথা সমাজের বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর 'ফাল্গুনকরা' বইতে বেশ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি যদি তাঁর জীবনের পরবর্তীকালের কর্মকাণ্ড এবং তার ফলের কথা বাংলাতে প্রকাশ করতেন, তাহলে বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞান প্রভূতভাবে

উপকৃত হতো। নাজমুল করিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালযে এবং মহাবিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানের চর্চাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য একজন মিশনারির ঐকান্তিকতা, উদ্যোগ ও পরিশ্রম নিয়ে কাজ করেছেন। এজন্য বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞানের অগণিত ছাত্র-শিক্ষক তাঁর গুণমুগ্ধ এবং ভক্ত। তাঁরা তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবেন।

নাজমুল করিমের সঙ্গে আমার নিজের সম্পর্ক ছিলো পারস্পরিক স্নেহ-শ্রদ্ধার সম্পর্ক। নিজে অসুস্থ হযে পড়েছিলেন। তাই অসময়ে এবং আকস্মিকভাবে তাঁকে তাঁর জীবনের প্রিয় প্রতিষ্ঠান এবং কর্মপ্রবাহকে পরিত্যাগ করে যেতে হয়েছে। 'ফাল্গুনকরা'-তে যে জ্যেষ্ঠ ভাই সম্পর্কে তিনি এত বিস্তারিত লিখেছেন এবং নিজেকে নেপথ্যে বেখেছেন, তিনি শুনেছি আজো সৌভাগ্যবশত জীবিত এবং কর্মক্ষম রয়েছেন। এটি নাজমুল করিমের পরিবারবর্গের নিকট যেমন আনন্দের, তেমনি নাজমুল কবিম, যিনি তাঁব পরিবাবের অন্যতম গর্ব এবং গৌরবের পাত্র তাঁর এই অকাল বিয়োগ তাঁদের নিকট এক দুঃসহ আঘাত-স্বরূপ।

নাজমুল করিমকে স্মরণ করতে চাইলে আমার নিজের মন চলে যায় দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বছর আগের কালে। সে সমযটা আমার যেমন কিশোবকাল, তেমনি নাজমুল করিমেরও তরুণকাল। ১৯৪০-৪১ সাল আজকের চুরাশি সাল থেকে চুযাল্লিশ বছর পেছনের কাল। মহাকালের পরিমাপে এটি ক্ষণকালও নয। তথাপি আমাদেব ব্যক্তিগত জীবনে এই সময়টাতেই আমাদেব দেশ ও সমাজেব এত বিচিত্র পরিবর্তন এত দ্রুত সংঘটিত হয়েছে যে চুরাশি থেকে পেছন ফিবে তাকালে সেই চল্লিশের ঢাকার পরিবেশ ও জীবনকে এক ছায়াঘেরা, নির্দ্বন্দ্ব রোমান্টিক জীবনের যুগ বলে মনে হয।

আমি নিজে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে বরিশাল থেকে এসে ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম ১৯৪০-এব মধ্যভাগে। ঢাকা কলেজ তখন ১৯০৫-এব বঙ্গভঙ্গের চিহ্নধারক কার্জন হলের অপর পাবে লাটভবনে স্থাপিত। কেবল যে আমি, তা নয। সেদিন যে পূর্ববঙ্গের মুসলিম কৃষক বা মধ্যবিত্ত সমাজের কিশোব ও তরুণবা ক্রমেই অধিক সংখ্যায় ঢাকায আসতে শুরু কবেছিলো এবং এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং শহরের প্রাসাদোপম ভবনরাজিতে প্রবেশ করছিলো, এ ঘটনাও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজেব অভ্যন্তরে পবিবর্তনেব এক স্মারক।

ঢাকা কলেজে আমি নাজমুল করিমের সাক্ষাৎ পাই নি। কিন্তু তাঁব ছোট ভাই লুৎফুল করিমের আমি সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। আমুদে মানুষ লুৎফুল করিম ছিলো আমার সহপাঠী। ঢাকা কলেজের হোস্টেল তথা তার ছাত্রদের আবাসিক ভবন, বর্তমানে ফজলুল হক হলে, লুৎফুল কবিমসহ আমাদেব সমদৃষ্টি এবং মেজাজের একটি কিশোর দল গড়ে উঠেছিলো। এরা এক সাথে উঠত, বসত, জোট করে বই পড়ত, সাহিত্যের মিটিং করতো, হাতে লেখা সাহিত্যপত্র প্রকাশ করত। এদের মধ্যে ছিলো আবুল কাসেম, নাসিরউদ্দিন আহমদ, নূরুল ইসলাম চৌধুরী, আবদুল মতিন, এ এইচ এম কামালউদ্দিন। এঁরা সকলেই পরবর্তী জীবনে শিক্ষা, প্রশাসন এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে নিজ নিজ অবস্থানে প্রতিষ্ঠা

এবং খ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু সেদিনের কথা স্মরণ করলে আজকের সমস্যাপীড়িত আমাদের কোনো মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে না। ভেসে ওঠে সেদিনের জীবনোচ্ছল কয়েকটি তরুণের মুখ।

নাজমুল করিম তখন হয়ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে অনার্স ক্লাসেব ছাত্র। তিনি থাকতেন আজকের মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ভবন এবং সেদিনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের দোতলার একটা দিকে। সেই ভবনেই তখন ফজলুল হক হল ছাত্রাবাসের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে।

কেমন করে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিলো, তা আজ স্মরণে নেই। কিন্তু ১৯৪২ সনে আই.এ পাস করে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার পূর্বে যে ঘটনায আমরা স্নেহ–শ্রদ্ধা এবং হৃদ্যতার বন্ধনে আবদ্ধ হযেছিলাম, সে ঘটনা বিস্মৃত হই নি। বলা চলে সে এক রাজনৈতিক ঘটনা।

নিস্তবঙ্গ ঢাকার বুকেও তখন ছোটবড় ঢেউ জাগতে শুরু করেছিলো। ১৯৪০ সনে ভারতবর্ষেব প্রধান রাজনৈতিক সংগঠন কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলন ক্রমান্বযে তীব্র হয়ে উঠছিলো। তার ঢেউ ঢাকার ছাত্রদেব মধ্যে প্রধানত এসে আঘাত করতো কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির হিন্দু তরুণ–তরুণীদের মধ্যে। তারা ধর্মঘট আহ্বান করতো। মিছিল বের করতো। তাবাই পুলিশেব লাঠি–পেটা খেত। মুসলমান ছাত্ররা তার যে বিরোধিতা কবতো, তা নয়। কিন্তু গভীরভাবে এবং সাংগঠনিকভাবে সেই দৈনন্দিন আন্দোলনে যে তাবা জড়িত হতো না, সে কথাও সত্য। কিন্তু সাধারণভাবে কিংবা সামগ্রিকভাবে মুসলিম ছাত্ররা এতে জড়িত না হলেও ইংরেজ সবকার বিরোধী এরূপ জঙ্গী ছাত্র আন্দোলন মুসলমান সমাজের ছাত্রদের মধ্যে কাবো কারো মনকে যে আলোড়িত করে তুলত না, তাদের মনেও যে প্রশ্নের উদ্রেক করতো না, এমনও নয। এরই প্রভাবে সেকালে মুসলমান ছাত্রদের মধ্যেও, ক্ষুদ্র হলেও, একটা জাতীয়তাবাদী এবং অসাম্প্রদায়িক মনোভাব তৈরি হতে থাকে।

১৯৪০ সনের লাহোব প্রস্তাব তথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব মুসলিম লীগ সম্মেলনে গৃহীত হওয়ার পরে স্বাভাবিকভাবে ঢাকার মুসলমান ছাত্রসমাজ সেই আন্দোলনের আকর্ষণে আলোড়িত হযে ওঠে। কিন্তু '৪২–৪৩ সালে মুসলমান সমাজের রাজনীতিও অখণ্ড ছিলো না। মুসলিম লীগের নেতৃত্বের সঙ্গে বিরোধের ফলে বাংলাদেশের কৃষক ও মধ্যবিত্ত সমাজের অবিসংবাদিত নেতা এ.কে. ফজলুল হক আইন পরিষদে ভিন্ন দল গঠন করেছেন এবং আইন পরিষদে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সঙ্গে মিলিত হয়ে মন্ত্রিপরিষদও গঠন করেছেন। হক সাহেবের সঙ্গে রয়েছে ঢাকার নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ। মুসলিম সমাজের এই বিভেদে ক্ষুব্ধ হয়ে লীগপন্থী ছাত্র এবং তরুণরা নিন্দাসূচক ভাষায় এই মন্ত্রিসভাকে শ্যামা–হক মন্ত্রিসভা বলে অভিহিত করছে। এমনি অবস্থায় হক সাহেবের ঢাকা আসার কথা ঘোষিত হলো। নবাব হাবিবুল্লাহব তখন ঢাকার বাইরে না হলেও ঢাকার স্থানীয় মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা। কেননা তিনি ঢাকার নবাব। আর ঢাকার নবাব তখনো ঢাকার মুসলমানদের সমাজ–নমাজের প্রধান পুরুষ। কিন্তু সে প্রভাব রেল লাইনের দক্ষিণ পারেই সীমাবদ্ধ। ঢাকার রেললাইন ছিলো সেদিন মুসলিম সমাজের

ক্ষেত্রে, অন্তত নতুন পুরাতনের বিভক্তি লাইন। রেললাইনের উত্তর পারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আর তার ছাত্রাবাস সলিমুল্লাহ এবং ফজলুল হক হলে অবস্থান করে মুসলমান ছাত্রবৃন্দ। এদের সকলেই, বলা চলে, অ-ঢাকাবাসী তথা বহিরাগত।

কিন্তু যে কারণে একথার উত্থাপন সেটি হচ্ছে এই যে, নতুন পুরানের দ্বন্দ্ব যে সর্বদা সহজভাবে প্রকাশ পেত, তা নয়। নতুন ঢাকার সকল মুসলমান ছাত্রই যে সেদিন মুসলিম লীগ এবং মুসলিম ছাত্রলীগেব নেতৃত্বে চলত, এমন নয়। তারই প্রকাশ ঘটলো '৪২-এর গোড়ার দিকে, হক সাহেবের ঢাকা আগমনকে কেন্দ্র কবে।

হক সাহেব ঢাকা আসবেন। সবেমাত্র তিনি মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। কাজেই ঢাকার অধিবাসীদের তরফ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা জানাবার আযোজন হলো। এই সংবর্ধনা নিয়েই ঢাকাব মুসলিম ছাত্রসমাজ যেন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ল। এক দল অভিহিত হল প্রো-হক বা হক সমর্থক বলে, অপর দল এ্যান্টি হক বা হক-বিবোধী বলে।

ফজলুল হক হলে নিশ্চয়ই প্রো-হকদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন এ.কে. নাজমুল করিম। নাজমুল করিম তাঁর কলেজ জীবন থেকেই কলেজের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন, আলোচনা, বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করে এসেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়েও তাঁর অনুরক্ত একটি দল স্বাভাবিকভাবে তৈরি হয়েছিলো। এ দলটিব বৈশিষ্ট্য ছিলো, এ দলের ছাত্ররা চিন্তা এবং বুদ্ধিতে তীক্ষ্ণ, মতবাদে সমাজতাত্ত্বিক, অসাম্প্রদায়িক এবং খানিকটা সমাজবাদীও। সংবর্ধনা নিয়ে ফুলবাড়িয়া বেল স্টেশনে প্রো-হক ও এ্যান্টি হকদের মধ্যে সংঘর্ষও ঘটেছিলো। প্রো-হকদের প্রধান জমায়েত ছিলো ঢাকার স্থানীয় অধিবাসী, যারা 'কুট্টি' নামে সাধারণত অভিহিত হতেন এবং এ কাবণে স্টেশনে প্রো-হক পক্ষই ছিলো প্রধান এবং এ্যান্টি হক ছাত্ররা হযেছিলো পরাজিত। কিন্তু পর্যুদস্ত দল অর্থাৎ মুসলিম ছাত্রাবাসের রাজনৈতিক ছাত্রদের অধিকাংশের দল প্রতিশোধ নিল হলে ফিরে এসে প্রোহকদের ওপরে। নাজমুল করিমেব বিছানাপত্র তাবা তছনছ করল, ফেলে দিল উপর থেকে নিচে। ফজলুল হক হলের এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আমার নিজের জানা নেই। কিন্তু ঢাকা কলেজেব হোস্টেলের মুসলিম ছাত্রদের মধ্যেও যে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া পড়েছিলো তা আমি সাক্ষাৎভাবেই জেনেছিলাম। কলেজ ছাত্রাবাসের আমার 'দলটি'ও ঘটনাক্রমে প্রো-হক বলে বাকি ছাত্রদের দ্বাবা অভিহিত হলো এবং এই ছাত্রাবাসের মুসলিম লীগপন্থী ক্ষুব্ধ ছাত্ররা স্টেশন থেকে ফিরে এসে আমাদেব ওপরও রূঢ় আচরণে আঘাত হানার চেষ্টা করল। আমাদেব মধ্যে নাজমুল করিমের অনুজ লুৎফুল করিম ছিলো অধিক পরিমাণে খোলামুখ। খাওয়ার ঘবে যাওয়ার সময়ে আক্রমণ হল তার ওপর। দৈহিকভাবে আঘাত আমার ওপর না এলেও হোস্টেলের পরিবেশ পারস্পবিক দ্বন্দ্বে বেশ গরম এবং পড়াশোনার প্রতিকূল হয়ে দাঁড়াল। এমনি অবস্থাতে হোস্টেল ছেড়ে আমি বরিশালে নলছিটি শহরে আমার চাকরিরত বড় ভাইয়ের কাছে গিযে আই.এ পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে লাগলাম। এ ঘটনা স্মরণে পড়ছে এই জন্য যে, মাস দুই পরে আই.এ পরীক্ষা দিয়ে আবার বরিশাল গিয়ে অপেক্ষা করছি পরীক্ষার ফলের জন্য। তখন একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে নাজমুল করিমই আমার ভাইয়েব ঠিকানায় টেলিগ্রাম করে আনন্দের সঙ্গে আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। আমি

ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষাতে আই.এ-তে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছি, এতে আমার চাইতে তাঁরই আনন্দ এবং গর্ব ছিলো বেশি।

এর পরবর্তী পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাজমুল করিমের অধিকতর ঘনিষ্ঠ সাহচর্য পেয়েছিলাম। ইউনিভার্সিটিতেও নাজমুল করিমকে কেন্দ্র করে একটি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক গ্রুপ তৈরি হয়েছিলো। এবা যে কেবল মুসলিম ছাত্রদের নিয়ে গঠিত ছিলো তা নয়। নাজমুল করিমের সহপাঠী ছিলেন রবি গুহ। তিনি ছিলেন সমাজতন্ত্রবাদী এবং কমিউনিস্ট। তাঁদের মতাবলম্বী ছাত্রদলেব নাম ছিলো ছাত্র ফেডারেশন। রবি গুহ এবং তাঁর অপর বন্ধুরা, যাদেব মধ্যে ছিলেন মদন বসাক, অনিল বসাক, দেবপ্রসাদ মুখার্জি এবং হেসামুদ্দিন আহমদ—এঁরা সকলেই ছিলেন কমিউনিস্ট কর্মী। '৪২ কিংবা '৪৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু-মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হযেছিলো. যাতে প্রাণ হাবিয়েছিলো মুসলিম ছাত্রনেতা নাজির আহমদ, সে দাঙ্গার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওযার চেষ্টা কবেছিলেন নাজমুল করিম, হেসামুদ্দিন (বাহাদুর), রবি গুহ এবং তাঁর অপব বন্ধুবা। এবং দাঙ্গাবিবোধী মনোভাবের কাবণে তাঁরা নিজ নিজ সম্প্রদাযের সাম্প্রদায়িক মনোভাবেব ছাত্রদের দ্বারা নানাভাবে নির্যাতিতও হয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রগতিশীল ও সমাজতন্ত্রী মনোভাবাপন্ন গ্রুপের সঙ্গে পরবর্তীকালে এসে যুক্ত হয়েছিলো মুনীর চৌধুরী। মুনীর চৌধুরী ক্রমান্বয়ে তার বাকশৈলী, তীক্ষ্ণধার বুদ্ধি এবং পরিহাসপ্রিয়তায় সেদিনকার ঢাকা ইউনিভার্সিটির সাহিত্য-সংস্কৃতিব কেন্দ্রমণি হযে দাঁড়িয়েছিল।

আমি নিজে ছিলাম দর্শন বিভাগের ছাত্র। কিন্তু আমার ঘনিষ্ঠতা হয়ত অধিকতর তৈরি হযেছিলো রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগেবই ছাত্র এবং শিক্ষকবৃন্দের সঙ্গে। নাজমুল করিম, রবি গুহ, দেবপ্রসাদ মুখার্জি—এঁরা ছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক ডি.এন ব্যানার্জি, এ.কে. সেন এবং আবদুব রাজ্জাক—এঁরা ছিলেন যেমন নাজমুল করিম, রবি গুহের প্রিয শিক্ষক, তেমনি আমারও। বস্তুত নাজমুল করিম-রবি গুহের মাধ্যমেই আমি পরিচিত হযেছিলাম এই শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের সঙ্গে। আমার অনার্সের অনুষঙ্গী বিষয়েরও একটি ছিলো রাষ্ট্রবিজ্ঞান। নাজমুল করিম তাঁর পরবর্তী জীবনের শিক্ষকতা ও গবেষণার জীবনে এঁদের কথা, বিশেষ কবে অজিতকুমাব সেনের কথা, গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। নিজের একখানি গ্রন্থের উপক্রমণিকাতে বলেছেন : 'আমার সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার অনুপ্রেরণাদাতা হচ্ছেন অজিতকুমার সেন।' অজিত সেন যথার্থই একজন বিশিষ্ট শিক্ষক ছিলেন। আচাব-আচবণে তিনি ছিলেন অভিজাত। শুভ্র ধুতি এবং পাঞ্জাবি ছাড়া অপর কোনো পরিধানে তাঁকে কখনো দেখেছি, এমন কথা স্মরণ করতে পারিনে। কথা বলতেন ধীর উচ্চারণে এবং বাংলায়। কেবল যে ব্যক্তিগত আলাপে বাংলা ব্যবহার করতেন, তা নয়। ক্লাসে আলোচনা করতেন বাংলায়। আমাদের টিউটোরিয়াল খাতা সংশোধন করে তার পাশে মন্তব্য করতেন বাংলায় এবং বিভাগে নিজের চাকরিগত ছুটি বা অন্য কোনো প্রয়োজনের বিষয়ে বিভাগীয় প্রধান বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সম্বোধন করে চিঠিপত্র রচনা করতেন বাংলায়। সুন্দর হস্তাক্ষরে তৈরি তাঁর সেসব মন্তব্য বা যোগাযোগপত্রে কোনো কৃত্রিমতা ছিলো না। বরঞ্চ তাঁর নিজের আচার-আচরণের সরল

ও সতেজ ভাবটি সেদিনকার ইংরেজি বচন-বাচন, পোশাক-আশাক পরিবেশকেই করত ব্যঙ্গ। নাজমুল করিম-রবি গুহের সঙ্গেই আমার যাতায়াত শুরু হয়েছিলো অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের বাসায়। সেকালে আমরা যে শ্রেণীকক্ষেই কেবল আমাদের শিক্ষকদের আলোচনা শুনতাম, তা নয়। সেদিনকার সেই রোমান্টিক পরিবেশকে যে উপাদানটি আরো গাঢ় এবং ঘন করে তুলতো তা শিক্ষক ও ছাত্রদের পারস্পরিক নৈকট্য ও সাহচর্য। ব্যাপারটি হযত ব্যাপকভাবে ঘটতো না। কিন্তু বুদ্ধিমান, লেখাপড়ায় আগ্রহী ছাত্রদের জন্য খ্যাতিমান শিক্ষকদের কেবল দরজা নয়, তাঁদের বাসগৃহের কক্ষও ছিলো অবারিত। অনার্স এবং এম.এ-তে ছাত্রসংখ্যা অবশ্য তখনো কম ছিলো। এবং এদের মধ্যে যারা মেধাবী ছিলো তারা জ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সময়-অসময় নির্বিশেষে চলে যেত শিক্ষকদের রমনার নীলক্ষেতের সড়কের এপাশের-ওপাশের ভবনগুলোতে। আমাব নিজের অনার্সের শিক্ষক হরিদাস ভট্টাচার্য যেমন ছিলেন দর্শন বিভাগেব প্রধান, তেমনি ছিলেন জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ। নিজে থাকতেন যে ভবনটিতে, বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা কেন্দ্রেব রাস্তার বিপরীতে, সেটি আজ বিলুপ্ত। তার জায়গাতে সম্প্রতি তৈরি হয়েছে শিক্ষকদের বহুতল আবাসিক ভবন। কিন্তু সেদিন হরিদাস বাবুর ভবনের সামনে ছিলো একটি পুকুরও। এবং তাতে ছিলো বাঁধানো ঘাট। তাঁর এই ভবনটিতে তিনি আমাদের ডেকে নিতেন অনেক সময়ে ক্লাসেব অসমাপ্ত আলোচনা সমাপ্ত করার জন্য। বলতেন, চলো বাসায় যেতে যেতে কথা বলি। কিংবা বলতেন, কাল সকালে এসো বাসায়। তখন আলোচনাটা শেষ করে দেবো। রাজ্জাক স্যাবের বাসার ছিলো ভিন্ন আকর্ষণ। আপ্যায়ন তো বটেই। সহৃদয়, সমৃদ্ধ আপ্যায়ন। ছুটির দিনে সকাল না হতেই আমাদের মনে একটা টান উঠত। হয়ত নাজমুল করিম বলতেন, তাঁর স্মিত মুখে, কি সরদার যাবেন নাকি আজ রাজ্জাক স্যারের বাসায়? এমন আহ্বানে না বলাব কোনো ব্যাপার থাকতো না। রাজ্জাক স্যার নিজে যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলতেন, তা নয়। কিন্তু তাঁকে প্রশ্ন করতে আমাদেব ভালো লাগত। প্রশ্ন করলেই তিনি আনন্দিত হতেন এবং যে-কোনো বিষয়ে তাঁর প্রিয় ছাত্রদের কেবল যে দরাজ মনে বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা দ্বাবা সাহায্য করতেন, তাই নয়, তাঁর নিজের গ্রন্থ-সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার থেকে অকৃপণভাবে বই দিযে তাঁর ছাত্রদের উৎসাহিত কবতেন। এমন যাতায়াতেব কথায় স্মৃতিতে এখনো ভেসে ওঠে তাঁর জেলখানার দিকে যাওয়ার রাস্তার পূর্বপাশের একটি ছোট ঘরের দৃশ্য। একখানি তক্তপোশে নামমাত্র চাদর বালিশ তাঁর শয্যা। কাঠের চৌকিখানাব কোনো একটি পা হয়তো-বা দুর্বল হয়ে পড়েছে। ঘরে আর যা কিছুর অভাব থাকুক, রাজ্জাক স্যারের ঘরে বইয়ের কোনো অভাব ছিলো না। এমন পরিবেশেই তৈরি হয়েছিলেন নাজমুল করিম। তৈরি হয়ে উঠেছিলাম সেদিন আমরা।

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ঢাকা হল আর জগন্নাথ হলের ছাত্ররাই তাদের বার্ষিক পত্রিকার নাম দিত বাংলা 'শতদল' আর 'বাসন্তিকা'। এবং তাদের তৈরিও করত সাহিত্য পত্রিকার সম্ভার ও সৌকর্য দিয়ে। তুলনাতে মুসলিম ছাত্রাবাস দু'টির বার্ষিক পত্রিকার চেহারা ছিলো দো-আঁশলা তথা দোভাষী। এ মাথায় বাংলা তো, ও মাথায় ইংরেজি। তাছাড়া আকারে প্রকারে তাদের মনে হতো চপল এবং সামান্য। এই ট্রাডিশনে ভাঙন ধরাবারও চেষ্টা

করেছিলাম আমরা, মানে নাজমুল করিম ও তাঁর সঙ্গীসাথীরা। আমরা ফজলুল হক হলের বার্ষিকীর নামকরণ করেছিলাম কেবল হল বার্ষিকী বা হল এ্যানুয়ালের পরিবর্তে 'কলাপী'। ইংরেজিতে কোনো রচনা গ্রহণ করা হয় নি এতে। বাংলাতে যাঁদের লেখা ছিলো তাতে, আমার নিজের একটি লেখা ছাড়া, তাঁদের মধ্যে ছিলেন আহমদ শরীফ, মুজাফফর আহমদ চৌধুরী, সানাউল হক, নাজমুল করিম, সৈয়দ নুরুদ্দিন, নূরুল ইসলাম চৌধুরী, সেরাজুন নূব, মনিবউদ্দিন ইউসুফ, আলীম আল রাজি, আবদুস শুকুব—এঁরা। এঁদের বাংলা রচনায় 'কলাপীর' প্রথম সংখ্যাটিই হয়ে উঠেছিলো সেদিনকার মুসলিম ছাত্রদের সাংস্কৃতিক পরিবেশে এক ব্যতিক্রম সৃষ্টিকারী প্রকাশনা। যথার্থই ব্যতিক্রমী। কারণ আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে চলে আসাব পরে সাহিত্যিক এই উদ্যোগের অনুসরণে 'কলাপী'র দ্বিতীয় সংখ্যাও আর প্রকাশিত হয নি। কেবল হলের এই উদ্যোগ নয। নাজমুল করিম, আহমদুল কবির, সানাউল হক, এ.কে.এম. আহসান—উচ্চতর ক্লাসের অন্য প্রগতিশীল ছাত্রদের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযে কেন্দ্রীয় মুখপত্ররূপে সেদিন অর্থাৎ '৪৪ কিংবা '৪৫ সালে যে সাহিত্যপত্রটি প্রকাশিত হয়েছিলো সেটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাহিত্যপত্র হিসেবে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির রাজধানী কলকাতার প্রগতিশীল সাহিত্যিক মহলে রীতিমত বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিলো।

হয়ত বা এই সাহিত্যপত্রেই প্রকাশিত হয়েছিলো নাজমুল করিমের সেই লেখাটি যার নাম দিয়েছিলেন তিনি 'ভূগোল ও ভগবান'। সেই লেখাটিতেই প্রকাশ পেয়েছিলো নাজমুল করিমেব সমাজ বিশ্লেষণমূলক সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিটি। প্রবন্ধটি হয়ত বা তাঁর পারিবাবিক বইপত্রের মধ্যে আজো পাওয়া যাবে। অন্যত্র পাওয়া যায় নি। আমি উদ্ধার করতে পারি নি। কিন্তু পাবিবারিক সূত্রে পাওয়া গেলে, লেখাটি পুনর্বার মুদ্রণেব উপযুক্ত। লেখাটি যে দীর্ঘ ছিলো, এমন নয। কিন্তু লেখাটির পরিবেশনায় সাবলীলতা এবং রসবোধের পবিচয় ছিলো। তাছাড়া তাব প্রতিপাদ্যটি ছিলো সমাজতাত্ত্বিক। লেখাব গোড়াতেই প্রশ্নটি ছিলো, ভগবান ভূগোল সৃষ্টি করেছেন, না ভূগোল ভগবানকে সৃষ্টি করেছে? নাজমুল করিম প্রশ্নের জবাবে উল্লেখ করলেন : দূব উত্তবের শীতেব জগতের এস্কিমোদের দেশ লাপল্যান্ডের গল্প। খৃস্টান ধর্মপ্রচারকারী এক যাজক গিয়েছেন এস্কিমোদের মধ্যে খৃস্টানধর্ম প্রচারের জন্য। ধর্মের পিতার কাছে সরল, নিরীহ, শীতার্তদের নানা প্রশ্ন, ঈশ্ববের স্বর্গে কি কি দ্রব্য পাওয়া যায়?' খুরমা, খেজুর, মেওয়া, বাদাম, পেস্তা, শরবত : এসব পাওয়া যাবে মৃত্যুর পরে স্বর্গে গেলে। এবং খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করলে স্বর্গে যাওয়া তোমাদের নিশ্চিতই ঘটবে।' ধর্মীয় পিতার এত ওয়াদাতেও শীতার্ত এস্কিমোদের মন ভরে না। তবু তাদের প্রশ্ন থাকে, ঈশ্বরের স্বর্গে অপর যা কিছুই পাওয়া যাক না যাক, তাদের প্রিয় সীল মাছকে পাওয়া যাবে কি না? নাজমুল করিম এ গল্প নিশ্চয়ই শুনেছেন তাঁর প্রিয় অধ্যাপক অজিতকুমার সেনের কাছ থেকে। অজিতকুমার সেন তাঁর প্রিয় ছাত্রদের শুনিয়েছেন সমাজতাত্ত্বিক সেই গ্রন্থের কথা যেখানে উদ্ধৃত আছে সমাজতত্ত্বের এমন তাৎপর্যপূর্ণ সব গল্প। নাজমুল করিম তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন, ধর্ম প্রচারক খৃস্টীয় পাদ্রী এস্কিমোদের আর সব প্রশ্নের জবাব ঠিকই দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বর্গে সীল মাছ পাওয়া যাবে, এমন নিশ্চিত জবাব তিনি সরল

এস্কিমোদের দিতে পারেন নি। এস্কিমোদের জন্যও তাই এমন ধর্মের আকর্ষণ প্রবল হয়ে ওঠে নি। কারণ, যে স্বর্গে সীল মাছ নেই, সে স্বর্গ দিয়ে এস্কিমোরা কি করবে। নিবন্ধের বক্তব্য তাই, ভূগোলই ভগবানকে তৈরি করেছে। তাই কোনো এলাকার স্বর্গে ঠাণ্ডা শরবতের নহর প্রবাহিত হয়, কোনো এলাকার স্বর্গে সীল মাছ থাকার প্রশ্ন আসে।

আমাদের ফজলুল হক হলের ১৩৫১ তথা ১৯৪৪ সনের বার্ষিকীটির নামকরণ করেছিলাম আমরা 'কলাপী'। সে কথা আমি ওপরে বলেছি। এই সংখ্যায় নাজমুল করিমের একটি রচনা প্রকাশিত হয়। লেখাটির নাম 'অবকাশ ও সভ্যতা'। নাজমুল করিম হয়ত তখন এম.এ ক্লাসের শেষ পর্বের ছাত্র। এই লেখাটিতে তরুণ নাজমুল করিমের সমাজবাদ সমর্থনকারী মনোভাবের একটি সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। ৪০ বছর আগের কথা। লেখাটিকে ৪০ বছব পরে আবার পাঠ করে আমার ভাল লেগেছে। মনে হয়েছে, মানুষের যৌবনের সৃষ্টিই তার আবেগে, আন্তরিকতায় শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। নাজমুল করিমের প্রবীণ বয়সে এই লেখাটির কথা তাঁর নিজের মুখে আর শুনেছি বলে মনে পড়ে না। হয়তো লেখাটিকে জীবনের নানা টানাপড়েনে এবং ঘটনা–দুর্ঘটনায় পোড়–খাওয়া অধ্যাপক নাজমুল করিম কিশোবকালের কাঁচা রচনা বলে গণ্য করেছেন। একে নিজের বলে আর গর্ব বা দাবি করেন নি হয়ত এমন আশঙ্কায়, পাছে এই ডান–বামের টানাটানি আর দ্বন্দ্বের যুগে তাঁকে কোনো জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু আজ যদি নাজমুল করিমের দীর্ঘদিনের শিক্ষাদানের দীক্ষায় দীক্ষিত তরুণরা তাঁর গবেষণামূলক অপর রচনায় মুগ্ধ হন তবে তাঁদের যুবক নাজমুল করিমের এই রচনার কথাটিও জানতে হয়। লেখাটি নাজমুল করিম শুরু করেছেন রবীন্দ্রনাথের এই উদ্ধৃতি দিয়ে, 'রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া থেকে এসে বলেছেন, সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম ফসল ফলছে অবকাশের ক্ষেত্রে।' এই সূচনা থেকে নাজমুল করিম তাঁর নাতিদীর্ঘ রচনাটিতে মানুষের সমাজের ক্রমবিবর্তনের ধারাটি বর্ণনা করেছেন, কি করে মানুষ আদিম শিকার আর পশুচারণের যুগ থেকে শুরু করে কৃষি যুগের মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে উৎপাদনের পদ্ধতি উন্নত করে করে ধনবাদী সমাজে এসে পৌঁছেছে। এককালে মানুষের যেখানে অন্নচিন্তা বাদে কোন প্রকার চিন্তার এবং সৃষ্টির অবকাশ ছিলো না, সেখানে মানুষের হাতে আজ সৃষ্টির যেমন নানা উপাদান, তেমনি সৃষ্টির সেই উপাদান মানুষকে সমৃদ্ধি দিয়েছে, দিয়েছে অন্নচিন্তা বাদেও অন্যতব চিন্তা তথা শিল্প–সাহিত্য–সভ্যতা তৈরির অবকাশ। কিন্তু এখনো কি পৃথিবীর সর্বত্র সর্বমানুষের হাতে এসেছে অবকাশের সেই সুযোগ? ধনিক সমাজে এ অবকাশ ধনবানের হাতে। কিন্তু অবকাশভোগী এই ধনবান একেবারে শ্রম–বিচ্ছিন্ন। নাজমুল করিম আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করেছেন যে, এই সনাতনী ধারার ব্যতিক্রম এসেছে মানুষের বিকাশের ক্ষেত্রে নতুনতম সমাজবস্থায়, তথা সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত সমাজব্যবস্থায়।

'ফাল্গুনকরা'র পরে নাজমুল করিমের আত্মজীবনীমূলক আর কোনো রচনা প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তাঁর নিজের বিবর্তন ও বিকাশ তথা তাঁর পরিবারের পরবর্তী বিকাশেও তিনি বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন। বিষয়টি তাঁর প্রিয় ছিলো। নাজমুল করিম আমার অগ্রজপ্রতিম ছিলেন। অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি ফুলার রোডের তাঁর

নিজ বাসা থেকে হেঁটে আমার বাসায় চলে আসতেন। এবং তখন আমরা বর্তমানের চাইতে অধিকতর আবেগে চলে যেতাম সেদিনকার অতীতে। নানা কথায় স্মরণ করতাম চল্লিশের দশকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই দিনগুলোকে, যে দিনগুলোতেই পরবর্তীকালে বিকশিত গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার আন্দোলনের বীজ কিছু উপ্ত হয়েছিলো। নাজমুল করিম আমাকে দেখতে দিয়েছিলেন একখানি পাণ্ডুলিপি। আমি দেখে তা ফেরত দিয়ে অনুরোধ করেছিলাম সেই আত্মজীবনীমূলক পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করার। সে পাণ্ডুলিপির বর্তমান পরিস্থিতি আমি জানিনে। নাজমুল করিমের প্রকাশিত ইংরেজি গ্রন্থের মধ্যে 'চেঞ্জিং সোসাইটি ইন ইন্ডিয়া এ্যান্ড পাকিস্তান' বিশেষ পরিচিত।

অগ্রজপ্রতিম নাজমুল করিমের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালীন ক্রিয়াকর্ম এবং বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে তাঁর সংশ্লিষ্ট থাকার বিষয়ে আমি অজ্ঞ। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালযে দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তন করি শিক্ষকতা নিয়ে, '৭১-এর পরবর্তী পর্যায়ে, তখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁর নিজেব প্রাতিষ্ঠানিক--সামাজিক অবস্থান ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে অপর সকলে যে সবসময়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন, কিংবা পছন্দ করেছেন, এমন নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু এ.কে. নাজমুল করিম যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানমূলক জ্ঞানচর্চার ও গবেষণার আগ্রহ এবং আবহ সৃষ্টির উদ্যোগী পুরুষ এবং পথিকৃৎ, এ বিষয়ে কারুরই কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞানের সকল প্রয়াস, প্রকল্পে তাই নাজমুল করিম অনাগতদিনেও অনিবার্য এক স্মরণীয় নাম হয়ে বিরাজ করবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

১৯৮৪

আমার শিক্ষক হরিদাস ভট্টাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের ষাট বছরপূর্তি উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার অর্থাৎ ১৯৮১-তে কিছু কিছু অনুষ্ঠান হচ্ছে। কোনো কোনো উৎসব বা আলোচনার সঙ্গে 'হীরক জয়ন্তী' কথাটি যুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে। বিষয়টিকে তেমন অনুপ্রেরণাদায়ক করে তোলার চেষ্টা নজরে পড়ে না। কয়েক মাস আগে এ বছরটির উদ্বোধন কবেছিলেন উপাচার্য ফজলুল হালিম চৌধুরী। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন সংলগ্ন মাঠে। সেদিন বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার অন্তর্ভুক্ত ছাত্রাবাসগুলোর পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিলো। আকাশে পারাবত ওড়ানো হয়েছিলো। একটি গেট তৈবি করা হয়েছিলো। পতাকাগুলো এবং প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলরদের উৎকীর্ণ বাণীসহ ফেস্টুনগুলো রোদে-বৃষ্টিতে বিবর্ণ হয়ে আজো দণ্ডের ওপর উড়ছে। ছাত্রছাত্রী মহলে এর কোনো উৎসাহজনক প্রতিক্রিয়া হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট উদ্যোগ নিয়েছেন হলের ষাট বছর পূরণকে স্মরণ করার জন্য একখানি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করার।

জগন্নাথ হলের প্রাক্তন প্রভোস্টদের মধ্যে ত্রিশ এবং চল্লিশের দশকে দর্শনের অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য ছিলেন অন্যতম। হরিদাসবাবু আমার সাক্ষাৎ এবং স্মরণীয় শিক্ষক। আমি দর্শন বিভাগ থেকেই বিএ এবং এমএ পাস করেছিলাম। সে কথা জেনেই জগন্নাথ হলের

প্রভোস্ট বন্ধুবর ডক্টর রঙ্গলাল সেন বারংবার অনুরোধ করেছিলেন হরিদাসবাবুর ওপর একটি প্রবন্ধ তৈরি করে দিতে। হরিদাসবাবু সেই আমলে ক্ষুদ্রায়তন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন, তেমনি অখণ্ড ভারত–উপমহাদেশের বিদ্বজ্জনমধ্যে দার্শনিক এবং বাগ্মী হিসেবে বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন। সেদিন অন্যান্য বিভাগ যেমন, দর্শন বিভাগের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও ছিলো কয়েকজনে মাত্র সীমাবদ্ধ। সেটা একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার ছিলো। তার ফলেই এ রকম গুণী অধ্যাপকদের নৈকট্যে আসা আমাদের পক্ষে সম্ভব হতো। কিন্তু হরিদাসবাবুর দার্শনিক মতামত বা তাঁর জীবনবৃত্তান্ত তৈরি করার মতো তথ্য এবং গ্রন্থ পাওয়া এখন দুষ্কর। তবু জগন্নাথ হলের প্রভোস্টের অনুরোধটি আমাকে আকর্ষণ করেছিলো। হরিদাসবাবুব দর্শনের আলোচনা না হোক, তাঁর একটি আলেখ্য তৈরি করার উদ্দেশ্য নিয়ে খোঁজ করেছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়েব অফিসে তাঁব অধ্যাপনার চাকরিকালীন ব্যক্তিগত নথিটি পাওয়া যায় কিনা। পাওয়া গেল অবশ্য, কিন্তু সবটা নয়। কেবল তাঁর ঢাকা আগমন থেকে ১৯৩৫ সন পর্যন্ত। কিন্তু হরিদাসবাবু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন ১৯৪৫ সন পর্যন্ত। তবু তাঁর ব্যক্তিগত নথির এই অংশটির চিঠিপত্র, আলাপ–আলোচনা ও তথ্যাদির ভিত্তিতে আমি একটি লেখা তৈরি করে জগন্নাথ হলের প্রভোস্টকে দিয়েছি। তাঁবা সেটি হয়তো তাঁদের স্মারকগ্রন্থে প্রকাশ করবেন। লেখাটি সম্পর্কে দর্শন বিভাগের কয়েকজন সাথীকে বলেছিলাম। আশা করেছিলাম, দর্শন বিভাগ যদি এই হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে 'দর্শন বিভাগের ইতিহাস ও ঐতিহ্য'—এই নামে একটি আলোচনাব আয়োজন করে, তাহলে সে সুযোগে দর্শন বিভাগের পুরাতন শিক্ষকদের কথা বিভাগের পুরাতন ছাত্ররা স্মরণ করতে পারবেন। তখন হবিদাস বাবু সম্পর্কেও আলাপ উঠবে এবং আমার না জানা আরো কিছু খবর আমি জানতে পারব। কিন্তু দেখলাম, দর্শন বিভাগ বিষয়টিতে তেমন আগ্রহ বোধ করছে না। কিন্তু বিভাগের অধ্যাপক জহুরুল হক সাহেব বিষয়টি, বিশেষ করে আমার প্রবন্ধটির ব্যাপারে বেশ আগ্রহ দেখালেন। তিনিই উদ্যোগ নিয়ে অধ্যাপক সাইয়েদ আবদুল হাই সাহেবেব বাসায় কযেকদিন আগে এই প্রবন্ধটি শুনবাব জন্য একটি ঘবোয়া আসবের আয়োজন করেছিলেন। হাই সাহেব খুবই সামাজিক এবং অতিথিপরায়ণ প্রতিবেশী। আমার ফ্ল্যাটের বিপরীত ফ্ল্যাটে তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ আছেন। জহুরুল হক সাহেব খবর দেওয়াতে প্রবীণ অধ্যাপক এবং ত্রিশের গোড়াতেই হরিদাসবাবুর ছাত্র দেওয়ান মুহম্মদ আজরফ আসরটিতে এসেছিলেন। তাছাড়া ছিলেন দর্শন বিভাগের জহুরুল হক সাহেব ব্যতীত মিসেস আখতার ইমাম, অধ্যাপক আবদুল মতিন, হাসনা বেগম, কাজি নূরুল ইসলাম এবং জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক আবদুল বারি।

আমার প্রবন্ধটি সকলে বেশ আগ্রহ সহকারে শুনলেন। এবং কেবল একটি নথির ভিত্তিতে করা হলেও এটি যে একটি প্রয়োজনীয় কাজ হয়েছে, সেটা তাঁরা বললেন। উপস্থিত এঁদের মধ্যে আজরফ সাহেব, হাই সাহেব এবং মিসেস আখতার ইমাম হরিদাসবাবুকে সাক্ষাৎভাবে পেয়েছেন। এঁরা সকলেই তাঁর ছাত্রছাত্রী। আমি এজন্যই এঁদের কাছে প্রবন্ধটি পাঠ করে শোনাতে চেয়েছি। এঁদের স্মৃতিচারণে লেখাটিকে আমি আর একটু ভাল করতে পারব। আজরফ সাহেবের বয়স প্রায় সত্তর হলেও তিনি দর্শন ও সাহিত্যচর্চাতে এখনো

বেশ সক্রিয়। নানা সভা-সমিতিতে তিনি আলোচনা করেন এবং পত্রপত্রিকাতে ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য বিষয়ে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেন। হরিদাসবাবু সম্পর্কে তাঁর সপ্রশংস উক্তি এবং স্মৃতিচারণ আমাদের সকলকেই বেশ আনন্দ দিয়েছে। তিনি হরিদাসবাবুর আলোচনা ও বক্তৃতাদানের বেশ কিছু নমুনা এখনো হুবহু উদ্ধৃত করে শোনাতে পারেন। আমাদের শোনালেনও। আমার প্রবন্ধটিতে যেমন, এদিনের শ্রোতা এবং আলোচকদের স্মৃতিচারণেও তেমনি, হরিদাসবাবু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হলেও তিনি যে সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল ছাত্রছাত্রীকে অকৃপণভাবে স্নেহ করতেন এবং জ্ঞানদানের ক্ষেত্রে তিনি যে স্মরণীয়ভাবে উদার এবং তাঁর ছাত্রছাত্রীদের জন্য একাগ্র ছিলেন, সেই চিত্রটিই প্রকাশ পেয়েছে। আজরফ সাহেব বললেন,'একদিন আমি এবং আর এক সহপাঠী, দু'জনে বাসায় গিয়ে বললাম, স্যার, হেগেলকে বুঝিনে। তিনি তখন ধুতি পরে, গলাবন্ধ কোট আর চাদর কাঁধে এবং লাঠি হাতে বেরুচ্ছেন আর এক অধ্যাপকের বাড়ি যাবেন বলে। সেই ত্রিশের দশকে শান্ত, ছায়াচ্ছন্ন নীলক্ষেতের পরিমণ্ডলে। কিন্তু সে অজুহাতে আমাদেব ফিরিয়ে দিলেন না। বললেন, 'চলো, রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে আলাপ করি।' এবং রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে তাঁর অনবদ্য ভাষায় যে আলাপ তিনি করলেন তা সেদিনকার কিশোর আমাদের মনে হেগেলের জটিলতাকে যেমন বিরাটভাবে পরিষ্কার করে দিয়েছিলো, তেমনি আমাদের মনের ওপর একটা স্থায়ী ছাপও কেটে দিয়েছিলো।' অধ্যাপক দেওয়ান মুহম্মদ আজরফের এ বর্ণনা যথার্থ। হরিদাসবাবুর এই বৈশিষ্ট্যটি আমার মনকেও সেদিন মুগ্ধ করেছিলো। দর্শন এবং মনোবিজ্ঞানের নানা কঠিন তত্ত্ব ভাষা ও ব্যাখ্যার গুণে তরুণ শিক্ষার্থীদের কাছে প্রাঞ্জল করে তুলতে পারতেন হরিদাস ভট্টাচার্য। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো তাঁর সেই সম্মোহনী বিনয়সূচক উক্তি, 'আরে, আমিও কি বুঝি এসব তত্ত্ব? এই, তোমাদের সঙ্গে একটু আলোচনা করা, আব কি?' একদিকে রাশভারী ব্যক্তিত্বময় চরিত্র। আবার অন্যদিকে একেবারে আনুষ্ঠানিকতাবিহীন। ক্লাসে তাঁর কক্ষে তাঁর টেবিলের তিনপাশ ঘিরে আমরা বসেছি গুটিকতক ছাত্রছাত্রী। তিনি পড়াচ্ছেন, মানে আলোচনা কবছেন। আলোচনা করতে করতে সময় ফুবিয়ে এল। অন্য কোনো ক্লাস বা কাজ রয়েছে হরিদাসবাবুর। তিনি তাই বললেন, 'এখন এ পর্যন্ত রইল। কাল সকালে এসো তোমরা, আমার বাসায়। তখন বাকিটুকু সেরে দেবো।' এমনি করে সেদিনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশকে এই শিক্ষকবৃন্দ একেবাবে সেই প্রাচীনকালেব ভারতের আশ্রম-প্রায় করে তুলেছিলেন। সেদিনকার ক্রমাধিক পরিমাণে অসঙ্গতিপূর্ণ দেশ এবং সমাজে এও ছিলো আর এক অসঙ্গতি। মাঝে-মাঝেই শহরে দাঙ্গা ঘটত। সম্প্রদায়গতভাবে মুসলমান-প্রধান পূর্ববঙ্গের ঢাকা শহর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু তখনো, আমার অধ্যয়নকালেও, চল্লিশের দশকে, সংখ্যায় হিন্দু ছাত্রছাত্রীই বেশি। মুসলমান ছাত্রী তো কুল্লে ডজন খানেক। রমনা নতুন শহর। রেললাইনের দক্ষিণ পাড়ে পুরনো শহর। রমনা যদি বা মুক্ত, কিছুটা উদার, ঢাকা রক্ষণশীল। মুসলমান ছাত্রী যারা ঢাকা থেকে আসত, তারা আসত বন্ধ দরোজা— ঘোড়ারগাড়িতে। রেললাইন পেরুলেই মাত্র গাড়ির দরজা আর মাথার ঘোমটা ফেলে দিতে সাহস পেত। কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটি অভিহিত হত 'মক্কা ইউনিভার্সিটি' বলে। তবু

'মক্কা ইউনিভার্সিটির' শিক্ষকদের বেশির ভাগ তখনো হিন্দু। দাঙ্গা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যেও যে দু'এক সময় না হয়েছে তা নয়। পাকিস্তান আন্দোলনে যত জোর বাড়ছিলো, দাঙ্গারপ্রকোপ ততো বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। সম্প্রদায়গত উভয় দিকের জঙ্গীবাজদের কারণে। চারদিকের আবহাওয়া ক্রমান্বয়েই অসহিষ্ণু আর আতঙ্কজনক হয়ে পড়ছিলো। তবু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাঁদেব তরুণ ছাত্রছাত্রীকে স্নেহ করতেন। কে কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত সে বিবেচনা তাঁদের ছিলো না। আমার প্রবন্ধটি পাঠের উপলক্ষে মিসেস আখতার ইমামও সে কথা বললেন। তিনি নানা পারিবারিক অসুবিধার মধ্যে এসেছিলেন দর্শনে এম.এ পড়তে। মিসেস ইমামও প্রবন্ধটি শুনে বললেন, 'আমাকেও তিনি নিজের মেয়ের মতোই দেখতেন।'

আমি নিজে যে খুব বিশিষ্ট ছাত্র ছিলাম, এমনও নয়। তবে একটু 'বেলাইনের' বটে। যত না রীতিমাফিক পড়াশোনা করতাম, তাব চাইতে একটু 'রাস্তার' বাইর দিয়ে হাঁটতাম। রাজনীতি আর ছাত্র আন্দোলনের বৃহৎ দু'টি ধারা, কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগপন্থী ধারা, তখন বেশ প্রবল। আমি কোনো ছাত্র নেতা ছিলাম না। তবু যে ভাল করে পড়াশোনা না করে, বিশ্ববিদ্যালয়েরই অল্প বেতনের কর্মচারিদের সঙ্গে মিশতাম, তাদের পাড়ায় গিয়ে নানা রকম কথা বলতাম, তারা আদাব জানাত, নিজেদের লোক বলে মনে করত, এটি হারিদসবাবুর দৃষ্টি এড়ায় নি। আমি এ ভয়েই হরিদাসবাবুর কাছে ততো ভিড়তে সাহস পেতাম না। পাছে ন্যায়শাস্ত্র, দর্শন আর মনোবিজ্ঞানের কঠিন কোনো প্রশ্ন করে আমাকে বিপাকে ফেলেন ! কিন্তু না, তেমন কোনোদিন করেন নি। মনে হতো যেন 'বেলাইনের' এই চলার জন্যই আমার প্রতি তাঁর স্নেহ আর কৌতুকমিশ্রিত একটা প্রশ্রয় ছিলো। কখনো কোনো সম্মেলনের কারণে দু'দিন ক্লাসে উপস্থিত না হয়ে তৃতীয় দিনে হাজির হলে বলে উঠতেন, 'কি দেশোদ্ধার হলো!' একবাব হরিদাসবাবু নিয়ে গেলেন বিভাগের আমাদের সবাইকে সঙ্গে করে লখ্নৌতে। দর্শন সম্মেলনে। সে সম্মেলনে বোধ হয় তিনি সভাপতি ছিলেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তখন লখ্নৌ বিশ্ববিদ্যালয়েব অধ্যাপক। আমাদের সকলকে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর সঙ্গে। আলাপআলোচনায় রাজনীতির কথা উঠলে রাজনীতিতে আমাদের কিছুটা সংস্রবকে একেবাবে নিন্দা করলেন না। বললেন, 'শ্লোগানও অহেতুক নয়। তারও প্রয়োজন আছে।' আমি কাছে যাই নি তেমন। কিছুটা দূর থেকে লক্ষ্য করেছি হরিদাসবাবুকে। কিশোব মনের বিস্ময় আর শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে। কিন্তু আজ তাঁকে স্মরণ করতে মনে বেশ আবেগেরও সৃষ্টি হচ্ছে। মনে আছে, কখনো কলকাতা, দিল্লি, বম্বে থেকে কোনো উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বিভাগ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির জন্য সংগ্রহ করে নিয়ে এলে আমাকে ডেকে বলতেন, 'এ বইটি বেশ ভালো। তোমার ভালো লাগবে। তুমি আগে পড়ো, তারপরে আমি লাইব্রেরিতে জমা দেব।' অনার্স পরীক্ষার ফলেব ওপর কিছু বই প্রাইজ পাওয়ার ভাগ্য হলো। হরিদাসবাবু বললেন, 'কি হে মার্কসিস্ট! কি বই কিনবে ?' আমি সলজ্জভাবে বললাম, 'ঐ মার্কসিস্ট বই স্যার।' প্রশ্রয় দিয়ে বললেন, 'আমাকে লিস্ট দিও। এখানে কোথায় পাবে? আমি কলকাতা কিংবা বম্বে যাব। নিয়ে আসব তোমার জন্য।' ...

... কিন্তু একাল সেকাল নয়। একালের তরুণদের সেকালের এই স্মৃতিচারণ দিয়ে উদ্বুদ্ধ করা যাবে না। এবং একালের আমিও আর সেকালের শিক্ষক নই। তাই আফশোস আর অভিযোগের দিকে গিয়ে লাভ নেই। তবু একালের মন্দ-ভালো, যা বৈশিষ্ট্য তাতে সেকালের অবদান নিশ্চয়ই আছে। সেকালের ওপরই একালের আগমন। সে সত্যটি স্মরণ করার জন্যই এসব কথাব উল্লেখ। ...

২০. ৩. ৮১

হরিদাসবাবুকে ব্যক্তিগতভাবে স্মরণ করতে গেলেই আমার যে ভবনটির কথা মনে পড়ে সেটি আজ আর নেই। বর্তমানে যেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাকেন্দ্র তার ঠিক বিপরীতে একটি দোতলা দালান ছিলো। এটিই ছিলো জগন্নাথ হলের প্রভোস্টের ভবন। ভবনটি সম্প্রতি ভেঙে ফেলা হয়েছে। তার জায়গাতে শিক্ষকদের একটি বহুতল ভবন তৈরি হয়েছে।

খুব যে দীর্ঘ ছিলেন, এমন নয়। কিন্তু গায়ের রঙটি ছিলো খুবই ফরসা। গায়ের রঙ-এর মতোই ধবধবে সাদা ধুতি-চাদর পবতেন। স্যুট-টাইতে কখনো দেখি নি। গলাবন্ধ যে কোট পরতে দেখতাম তাকে আজকালকার ভাষায় বলা চলে 'চীনা কোট'।

হবিদাস ভট্টাচার্যের বাড়ি কোথায়, তাঁর অধ্যয়ন জীবনের কৃতিত্ব কি ছিলো, কি ছিলো না, তা আমি কিছুই জানতাম না। ১৯৪২ সনে ঢাকা কলেজ থেকে আই.এ পাস করে যখন বিশ্ববিদ্যালয়, মানে বর্তমানের মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ভবনে বি.এ পড়তে এলাম তখন প্রথম চোটে আমি দর্শন শাস্ত্রে ভর্তির আবেদনও করি নি। আবেদন করেছিলাম ইংরেজি সাহিত্যে। কিন্তু মাঝখানে করিডোর আর দু'পাশে ক্লাসরুম। এই ভবনের করিডোর দিয়ে যাওয়াতে যে শিক্ষক-বক্তার দর্শন, জ্ঞান, সত্য-মিথ্যার ওপর দরাজ গলার আলোচনা আব যে-কোনো ছাত্রের মতো আমাকেও চমকিত এবং আকর্ষিত করেছিলো— সে গলা ছিল হরিদাস ভট্টাচার্যের। আর সেই আকর্ষণেই ইংরেজি সাহিত্য পরিত্যাগ করে দর্শন শাস্ত্রে ভর্তি হবার আবেদনপত্র নিয়ে একদিন হাজির হয়েছিলাম অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী সেই বাগ্মী হরিদাস ভট্টাচার্যের সামনে। এখনও মনে ভেসে উঠছে, আমার সাক্ষাৎকারটি ঘটেছিলো দর্শন বিভাগের প্রধানের দপ্তরে নয়, ঘটেছিলো জগন্নাথ হলের প্রভোস্টের দপ্তরে। আমার আবেদনটি হাতে নিয়ে আই.এ পরীক্ষার নম্বরাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করে যে কথাটি বলেছিলেন, সেটি এখনো কানে বাজছে, 'ফিলসফি পড়তে এসেছ? কিন্তু টিকবে তো?' এ এক কঠিন প্রশ্ন। এর সরাসবি কোনো জবাব নেই। মুখচোরা গোবেচারী আমি সেদিন তাঁকে কি জবাব দিয়েছিলাম, কিসে তিনি খুশি হয়েছিলেন, তা আজ মনে নেই। তবে সেদিন অচেতনভাবে বুঝেছিলাম, একটি কিশোর ছাত্র বা ছাত্রীকে কেবল যে জ্ঞানের একটি শাখাই অপর শাখা থেকে কম কিংবা বেশি আকর্ষণ করে, তাই নয়। কোনো বিভাগের প্রতি কম কিংবা বেশি আকর্ষণ করে তার কোনো বিশেষ শিক্ষকও। ব্যাপারটি আজ বিরাট আকারের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে হয়তো ততো জোরের সঙ্গে বলা যায়

না; কিন্তু সেদিনকার সেই আশ্রম কিংবা পরিবার প্রায়–ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে অনেকখানি সত্য ছিলো। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন বিজ্ঞানী সত্যেন বসু, দার্শনিক হরিদাস ভট্টাচার্য, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপক এস.এন রায়, গণিতের এস.এন বসু, অর্থনীতির এইচ এল দে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ডি এন বানার্জী, এ কে সেন, অবণীভূষণ রুদ্র, আবদুর রাজ্জাক, বাংলার মোহিতলাল মজুমদার, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, জসীমউদ্‌দীন প্রমুখ।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবী বিখ্যাত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে একটি প্রশংসাবাক্য প্রচারিত ছিলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড। অক্সফোর্ডের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কি, আমার জানা নেই। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযেব শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে যে তখনকার ভারত উপমহাদেশেব জ্ঞানী–গুণীদেব মধ্যে বেশ কিছু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটেছিলো তাতে সন্দেহ নেই। আর ছাত্র হিসেবে সেটিই ছিলো আমাদের গর্ব এবং গৌরবেব বিষয়। তা না হলে কলকাতা বা লখ্‌নৌ বা কাশী বা আগ্রা ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালযেব কাছে অজ-পাড়াগাঁ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দাঁড়াবার উপায ছিলো না।

কিন্তু যে কথা আজ এই হীবক জয়ন্তীতে ভাবতে গিয়ে চমৎকৃত হতে হয়, সেটি হচ্ছে, সমাবেশেব এই ঘটনাটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে নি। এমন নয় যে হবিদাস ভট্টাচার্য, সত্যেন বসু, রমেশ মজুমদার, এফ রহমান এরা কোথাও বেকার বসেছিলেন, আর চাকরি খালির বিজ্ঞাপন দেখে তাঁরা কলকাতাকে ছেড়ে ঢাকাতে দৌড়ে এসেছিলেন। তাঁদেরকে খুঁজে পেতে সংগ্রহ করা হয়েছিলো। আর তাব প্রতিষ্ঠানগত কৃতিত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালের সাংগঠনিক কমিটির হলেও, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজেপত্রে যে ব্যক্তির ঐকান্তিক আগ্রহ, পরিশ্রম ও চেষ্টার পবিচয় পাওয়া যায় তিনি না বাঙালি, না ভারতীয় এবং না হিন্দু, না মুসলমান। তিনি ইংবেজ—পি জে হারটগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম ভাইস চ্যান্সেলর বা উপাচার্য। তিনিও বেকাব ছিলেন না। হযত ছিলেন ভারতীয় শিক্ষা সারভিস বা আই.ই.এস–এর অভিজ্ঞ এবং উচ্চতব সদস্য। কিন্তু ঢাকাতে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি, তার সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, আইন—সকল বিভাগের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক অন্বেষণের যে প্রচেষ্টা হাবটগ সাহেব চালিযেছিলেন, সেটি তাঁকে একজন যথার্থ কর্মী, জ্ঞানী, এবং উদ্যোগী সংগঠক হিসেবে প্রমাণিত করে। আজকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উচিত সেই গোড়াকার সকল প্রয়াস ও প্রচেষ্টার মধ্যে যাঁরা ছিলেন, পি জে হারটগ এবং তাঁর অন্য সহকর্মীদের পবিচয় বিবরণী সংগ্রহ করে প্রকাশ করা।

শুধু বিজ্ঞাপনের জবাবে আবেদনকারীদের সাক্ষাৎকাব নিয়ে নিয়োগপত্র দেয়ার মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেদিনকার সংগঠন, বিশেষ করে ভাইস চ্যান্সেলব হারটগ সাহেবের কাজ সীমাবদ্ধ ছিলো না। হরিদাসবাবুর ব্যক্তিগত নথির কিছুটা মাত্র এখনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন কাগজপত্রের মধ্যে রক্ষিত আছে। তা নাড়াচাড়া করতে গিয়েই দেখলাম, ১৯২১ সালের জানুয়ারি মাসেও কলকাতা শহরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের ক্যাম্প-অফিস চালু রয়েছে। আর সেখান থেকে ২৯ জানুয়ারি (১৯২১) তারিখে হারটগ সাহেব হরিদাস ভট্টাচার্যকে তাঁর কলকাতাব ৩৬ নম্বর আমহার্স্ট রোডের

ঠিকানায় ব্যক্তিগত চিঠি পাঠিয়ে লিখছেন :

"Dear Mr. Bhattacharyya,

I am authorised by His Excellency the chancellor to offer you the Post of Reader in Philosophy in the University of Dacca at an initial salary of Rs. 500/- per mensem rising by annual increments of Rs. 50/- per mensem of a maximum which has not yet been fixed, but which I hope will be fixed shortly. I should be glad to hear from you at your early convenience that you will accept the Post. It will be necessary for you to join the University not later than 13th June in order to complete the arrangements preparatory to the beginning of the session on July the 1st...."

হরিদাস ভট্টাচার্য তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফিলসফি এ্যান্ড একসপেরিমেন্টাল সাইকোলজির' লেকচারার। তিনি অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযে 'প্রফেসর' পদেব জন্যই একটি আবেদন পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু হাবটগ সাহেবের এই পত্রের উত্তরে তিনি জানিযেছিলেন, 'রিডার'-এর পদ গ্রহণেও তাঁর আপত্তি নেই। হরিদাসবাবুর বাংলা হস্তাক্ষরের সাক্ষাৎ পাওয়া ভার। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত নথিতে শুরু থেকে, অর্থাৎ ১৯২১-এর জানুয়ারি থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত রক্ষিত নথিতে (১৯৩৭ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত সমযেব নথির খোঁজ আমি পাই নি) তাঁর নিজের অত্যাশ্চর্য ইংরেজি হস্তাক্ষর এবং ইংবেজিতে লেখা সাবলীল পত্রাদির কোনো অভাব নেই।

ভাইস চ্যান্সেলর হাবটগ সাহেবেব এই প্রশ্নেব জবাবে তিনি যে পত্র লিখেছিলেন তাতে স্যার আশুতোষ মুখার্জির উল্লেখ দেখা যায় : "But before putting into your hands the formal letter of acceptance I think I ought to see the President to the Post-Graduate Department, Sir Ashutosh Mukherjee. I wish you could have told him that you wanted me just as he did to Dr. Urquhart. It is always so very delicate to touch upon the subject of resignation and departure before one with whom I am on cordial terms and who during the last month made me a paper-setter in B.A. Philosophy (Pass and Honours) unasked...".

স্যার হারটগের পক্ষে এমন অনুবোধ রক্ষা করার তেমন কোনো বাধ্যতা ছিলো না। কিন্তু হরিদাস ভট্টাচার্যের ব্যক্তিগত নথিতে রক্ষিত পত্রাদির মধ্য দিয়েও বোঝা যায় স্যার হারটগ (পদবিসহ যাঁব নাম ছিলো Sir P. J. Hartog Kt. CIE LLD, M.A, B.Sc) যথার্থই ভদ্র এবং দক্ষ সংগঠক ছিলেন। হরিদাসবাবুর সঙ্কোচের কারণটি তিনি বুঝেছিলেন এবং যথার্থই স্যার আশুতোষকে হরিদাসবাবু সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন।

এরপরে স্যাব হারটগকে যে দীর্ঘ পত্র হরিদাসবাবু লিখেছিলেন তাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে শিক্ষকতার ক্ষেত্রে তিনি স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবেন কিনা সে প্রসঙ্গটি বেশ

উল্লেখযোগ্য :

... (2) The facility for research and freedom in teaching. It has been hinted to me that the freedom and leisure for study that I enjoy here may be denied me there. Personally I do not put much credence in these statements but I should like to be assured that I shall not be unnecessarily dictated to by the professor or by anybody else in matters of study and teaching. There must certainly be consultation and mutual arrangement and agreement but that should be all. I have already told you that here I am absolutely free to teach as I like and have to report only at the end of the year what and how much I have taught. I have never abused that privilege, in fact, both at Scottish Churche's College and at the University. I have taken extra classes on my own initiative, and I shall justify your confidence in me on that point there too...".

চাকবিতে স্থায়ী হতে কত দিন লাগবে, প্রভিডেন্ট ফান্ডের কি সুযোগ পাওয়া যাবে, থাকার ব্যবস্থা কি হবে প্রভৃতি সব বিষয়েই তিনি ভি.সি-র কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন এবং এতদিন পরে একজন গবেষককে যা চমৎকৃত করবে সে হচ্ছে ভি.সি স্যার হাবটগও বিস্তারিতভাবে হরিদাস ভট্টাচার্যের সকল প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছেন।

৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১ তারিখে স্যার হারটগ হরিদাসবাবুকে লিখলেন :

"Dear Mr. Bhattacharyya,

Many thanks for your letter of February 7. As you will learn from my letter no. 89/C dated the 7th February, 1921, I have already written to Sir Ashutosh Mukherji in regard to your appointment. I now deal with your various queries: (1) With a record like your own I anticipate that confirmation after the Probationary period would be merely normal. However I will put your points before the Chancellor; (2) The University will enter into a written contract with you and will be obliged to carry out the obligations of the contract. This is required under the Dacca University Act.

(3) One of the main objects of the University is to provide every facility for research and freedom in teaching. If you will consult the Dacca University Act, you will see what a large space the teachers will occupy in the management of the University. The post of Reader would be one of dignity and importance and your letter seems to me to indicate the exact spirit in which the department should be

conducted. Mutual arrangement and agreement are of course necessary, but you ought certainly not be hampered in any way in your teaching...".

হরিদাসবাবু নিজে স্যার হারটগকে যে চিঠি লিখেছিলেন তার গোড়াতেই দেখা যায়, তিনি ১৯২১ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে যেমন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, তেমনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে, খুব সম্ভব ১৯১৭ সন পর্যন্ত স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হরিদাসবাবুর নথিতে কোনো আবেদনপত্র এবং তার সঙ্গে তাঁব জীবনের কোনো বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। কিন্তু স্যার হারটগের সঙ্গে এই পত্রালাপের উল্লেখে মনে হয়, হরিদাসবাবুর জন্ম হয়ত ১৮৯০ কি ৯১ সনে। হরিদাসবাবু শিক্ষাগতভাবে ছিলেন এম.এ.বি.এল। অর্থাৎ এম.এ পাসকরে হয়ত তিনি দু'বছব ল' পড়েছিলেন এবং আনুমানিক হিসেবে ১৫ বছরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ১৯০৫-এর দিকে এম.এ পাস করেছেন। তারপবে ল' শেষ করে হযত স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যাপনার চাকরি গ্রহণ করেন।

হবিদাসবাবু কলকাতায় বসেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে যোগদানের পত্র পাঠান এবং দর্শন বিভাগে আব কোন্ উপযুক্ত সহকর্মীকে গ্রহণ করা যায় এবং মনোবিজ্ঞানেব গবেষণাগাবের জন্য কি যন্ত্রপাতি কিংবা দর্শনের জন্য কোন্ কোন্ গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ করা যায তাব প্রচেষ্টাতে নিজেকে অবিলম্বে নিযুক্ত করেন।

হবিদাসবাবু তখন তরুণ অধ্যাপক। কিন্তু স্যার আশুতোষের মতই স্যার হারটগও যে নির্বাচনে ভুল করেন নি তা বিশ্ববিদ্যালয়েব গোড়ার দিকেব যে-কোনো দলিলপত্র বা প্রকাশনা ওল্টালেই বোঝা যায়। নিজের দাবিদাওয়া আদায়েব ব্যাপারে হরিদাসবাবু যে 'দার্শনিক রকমেব' নিরাসক্ত ছিলেন, তা নয়। তিনি তাঁব প্রাপ্য আদায় করতে জানতেন। কিন্তু তাঁর পত্রালাপ বা দাবি উথ াপনের মধ্যে যুক্তির জোর এবং মর্যাদাপূর্ণ প্রকাশের চিহ্ন স্পষ্ট। বস্তুত প্রতিষ্ঠাব পরবর্তীকালেই কেবল দর্শন বিভাগের নয়, বিশ্ববিদ্যালয়েব অরডিন্যান্স ও বেগুলেশনসমূহ সুবিন্যস্ত করার দায়িত্ব পড়ে হরিদাসবাবুর ওপর। ১৯২৪ সনেব একটি পত্রে দেখা যায়, হরিদাসবাবু ভাইস চ্যান্সেলবের নিকট একটি দাবি জানিয়েছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অবডিন্যান্সসমূহ সম্পাদনাতে তাঁর যে কষ্টকর পরিশ্রম করতে হয়েছে সেজন্য তাঁর কিছু প্রাপ্য হওয়া উচিত। এবং পরবর্তী সময়ে একসিকিউটিভ কাউন্সিল হরিদাসবাবুকে এ পরিশ্রমের জন্য পাঁচশ' টাকার একটি সম্মানী প্রস্তাব করে মঞ্জুর করে।

হরিদাসবাবু দর্শন বিভাগের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। কিন্তু গোড়াতে তিনি দর্শন বিভাগের হেড ছিলেন না। হেড ছিলেন অধ্যাপক জি.এইচ. ল্যাংলী এবং তিনি যখন ১৯২৪ সনের এপ্রিল মাসে ছুটিতে যান তখন মাত্র হরিদাসবাবু বিভাগের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন।

এই সময়কার চিঠিপত্র পাঠ করতে গিয়ে একটি বিষয়ে আমার বেশ আমোদ লেগেছে। ঢাকায় আসার পূর্বে হরিদাসবাবু ভিসি হারটগ সাহেবকে চিঠিতে ঢাকার মশার আতঙ্কের

কথা উল্লেখ করেছিলেন। হারটগ সাহেব তার জবাবে লিখেছিলেন: "I am told that although there are mosquitoes in Ramna, there is no malaria and many people who have lived here for years had never had an attack. The situation is open and healthy." অর্থাৎ ঢাকার মশা তোমাকে কামড়াবে বটে কিন্তু ম্যালেরিয়ার রুগী করবে না। ঢাকার মশা ভদ্র এবং রসিক। সে গুণ তার এখনো আছে। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণদের নিবাসস্থল ভাটপাড়ার টিকিধারী তরুণ ব্রাহ্মণ অধ্যাপক হারটগ সাহেবের এই অভয়তে ঢাকা এসেছিলেন। তাছাড়া হারটগ সাহেবের আনুষ্ঠানিকতাবর্জিত ব্যক্তিগত পত্রালাপ এবং ঢাকাতে আগমনে ইচ্ছুক একজন তরুণ শিক্ষকের সকল সঙ্কোচ কাটিযে দেবাব প্রয়াসও নিশ্চয়ই কম আকর্ষণীয ছিলো না।

কিন্তু বাদুড়ের উৎপাতের কথা তরুণ অধ্যাপক বাইরে থেকে আঁচ করতে পারেন নি। আজকেব ঢাকাবাসীরা যদিও মশাকে ভালোভাবেই চেনেন তবে বানর আর বাদুড়কে তাঁরা তেমন জানেন না। কিন্তু হরিদাসবাবু খুবই বিব্রত হয়েছিলেন বাদুড়ের উৎপাতে, যখন তাঁকে বিশ্ববিদ্যালযেবই নিকটবর্তী 'চামেবী হাউস' ভবনটি থাকার জন্য দেওযা হয়। এই 'চামেরী হাউস' থেকে ১৯২৪ সনের দিকে হরিদাসবাবু ভি.সিকে লিখলেন :

"My dear Sir.
I am afraid, I shall have to think seriously of vacating University Quarters next session. The unbearable stench of bat's excreta returned with the summer heat in spite of last year's renovation of the ceiling cloth and the P.W.D. people practically told me that they would be unable to drive the bats away".

এ রকম ব্যক্তিগত অসুবিধাব কথা উল্লেখ করে কোনো শিক্ষক আজকের দিনের একজন ভিসিকে পত্র দিলে তিনি তার জবাব ব্যক্তিগতভাবে এবং লিখিতভাবে দেবেন কিনা এবং কি জবাব দেবেন তা আমি নিশ্চিত জানিনে। তবে হারটগ সাহেব অবিলম্বে কেবল যে হরিদাসবাবুকে জবাব দিয়ে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন তাই নয়, তিনি নিজে পি, ডব্লিউ ডি'ব ইঞ্জিনিয়ারকে চিঠি লিখে বললেন :

"My dear Stein,
Mr. Haridas Bhattacharyya who lives in the Chummery tells me that the stench of the bats in the house is so unbearable that he wishes to leave it. Is it not possible to keep the bats out of the house? At one time they used to come into this house but since wire-netting has been put in the holes through which the electric wires pass, they have been kept out completely. I know that the Chummery is differently constructed, but it is difficult to believe that it is impossible to keep bats from entering above the ceiling cloth."

হরিদাসবাবু কেবল যে বিভাগের অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করেছেন, ল্যাংলী সাহেবের

পরে দর্শন বিভাগের প্রধান হয়েছেন, তাই নয়। একাধিকবার তিনি ডেপুটি রেজিস্ট্রাব বা রেজিস্ট্রারের দায়িত্বও পালন করেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, যে সেদিনকার বিশ্ববিদ্যালয়েব পরিমণ্ডলে হরিদাসবাবু একজন প্রথম সারির ব্যক্তিত্ব হিসেবেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের কিছুকালের মধ্যেই পরিগণিত হয়েছিলেন।

'হরিদাস ভট্টাচার্য, এম.এ, বি.এল, পি.আর.এস, দর্শন সাগর। পি. আর. এস বা প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার' তো আমাদেব নিকট আতঙ্কজনক ব্যাপার ছিলো। যিনি এই বৃত্তির অধিকারী হন তিনি অবশ্যই মহাপণ্ডিত। তার ওপর 'দর্শন সাগর'! এবং অপ্রতিরোধ্য এক ব্যক্তিত্ব। এসবই সেই কিশোরকালের আমাকে চল্লিশের দশকে মুগ্ধ করেছিলো। বৃহত্তর বিশ্ব, কোলকাতাতে লেখাপড়া কবতে না যাওযার্ব জন্য আমার কোনো আফসোস ছিলো না। কিন্তু হবিদাসবাবুর টিকি এবং উপবীত বা পৈতা (পৈতা অবশ্য বাব থেকে দেখা যেতো না) আমাকে বিস্মিত করেছিলো। দর্শন বলতে তো জিজ্ঞাসা আব সংশযকে বোঝায। হবিদাসবাবুব দরাজ বক্তৃতাতেও দর্শনেব এই অর্থই আমি উপলব্ধি করেছিলাম। তাহলে এই 'জিজ্ঞাসা এবং সংশয়ের' সঙ্গে দার্শনিক হরিদাসবাবুর 'টিকি এবং পৈতা'র সঙ্গতি কোথায়? এ প্রশ্ন সেদিনও আমার মনে জেগেছিলো। কিন্তু এমন প্রশ্ন তাঁকে জিজ্ঞেস করাব সাহস হয় নি। অসঙ্গতি কেবল এ ক্ষেত্রে নয়। অসঙ্গতি এখানেও যে, হরিদাসবাবু বাড়ির বাইবে অপব কারুব পাক করা অন্ন গ্রহণ করতেন না। শুনেছি বাইরে কোথাও গেলে তিনি নিজেই বান্না করে খেতেন। একেই বোধ হয় বলে 'স্বপাক ব্রাহ্মণ'। কিন্তু এই হরিদাসবাবুর বাড়িতে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত অধ্যাপক হুমায়ুন কবির যখনি ঢাকা এসেছেন কোনো পবীক্ষা কার্য ব্যপদেশে, তখন তাঁর স্থান হয়েছে। অপর কোথাও তাঁকে তিনি থাকতে দেন নি। এও কম বিস্ময়ের ব্যাপাব ছিলো না আমাদের কাছে। আসলে হরিদাসবাবু শুধু দর্শনেব ছাত্র এবং অধ্যাপক ছিলেন না। ছিলেন মনোবিজ্ঞানেরও। আর তিনি আমাদের শিখিয়েছিলেন, 'যে ব্যক্তিকে তোমবা বাইরে থেকে আস্ত কিংবা অখণ্ড দেখ, সে আসলে আস্ত কিংবা অখণ্ড কোনো সত্তা নয়। নানা খণ্ডিত, পরস্পববিরোধী ব্যক্তিত্বের অর্থাৎ বিশ্বাস, অবিশ্বাস, আচরণ, সংস্কারের টুকবো নিয়ে বাহ্যত অখণ্ড ব্যক্তির সৃষ্টি। এই পবস্পর-বিরোধী সত্তাতেই ব্যক্তির মধ্যকার অসঙ্গতি আর দ্বন্দ্ব। এটা যে কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রেই সত্য। কেবল এই পরস্পরবিরোধী সত্তাগুলো যখন এমন তীব্রতাপ্রাপ্ত হয় যে ব্যক্তির সর্বমোট নিয়ন্ত্রণটা নষ্ট হয়ে যায, তখনি আমরা এমন ব্যক্তিকে 'এ্যাবনরম্যাল' বা মানসিক রোগী বলে আখ্যায়িত করি।' এমন শিক্ষা এবং সত্যকেই বোধ হয় হরিদাসবাবু সচেতনে নিজের মধ্যে ধারণ করতেন। তাই তাঁর ব্যক্তিগত নথি ওল্টাতে ওল্টাতে যখন দেখলাম, কলকাতায় বালিগঞ্জে তৈরি নতুন বাড়ির 'গৃহপ্রবেশ' অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ছুটির আবেদন করে ৫-১১-৩১ তারিখে তিনি লিখেছেন : ..."The earliest possible date is the 11th instant. The only other date is 20th instant. The astrologers consulted have vetoed these two dates after consulting my horoscope and in the matter I am absolutely in their hands." তখন আর বিস্মিত হই নি। 'জ্যোতিষীদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তারা আমার কুষ্টি দেখে

বলেছে ১১ কিংবা ২০ তারিখে গৃহপ্রবেশ করা চলবে না। এ ব্যাপারে আমি একেবারেই তাদের হাতে বন্দী।' দর্শন সাগর হরিদাস ভট্টাচার্য এমন সত্য স্বীকারে কোনো অস্বস্তি বোধ করেন না। কারণ, ব্যক্তি তো অখণ্ড সত্তা নয়, খণ্ডিত সত্তাসমূহেরই সমন্বিত প্রকাশ।

হরিদাসবাবু বাগ্মী হিসেবে সেদিনকার সারা–ভারতেই বিখ্যাত হয়েছিলেন। ইংরেজি বাংলা উভয় ভাষাতে বিরামহীনভাবে বক্তৃতাদানের অসাধারণ ক্ষমতা তাঁকে যেমন ছাত্র, সহকর্মী এবং দেশবাসী সকলের নিকট প্রিয় করেছিলো, তেমনি বোধ হয় সে কারণেই রীতিসিদ্ধ গবেষণাকর্মে বা একাধিক গ্রন্থ রচনাতে তিনি নিবদ্ধ থাকতে পারেন নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং সেদিনকার সমাজের নানা প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বে তিনি ব্যাপৃত রয়েছেন। এক সময়ে তিনি 'বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক' নামক একটি ব্যাঙ্কের অন্যতম ডাইরেক্টর নির্বাচিত হয়েছিলেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মের বাইরে বলে তিনি তা গ্রহণ করেন নি।

হরিদাসবাবু একবার লখ্‌নৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করেছিলেন সেখানে 'ফিলসফির প্রফেসর' হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার জন্য। তাঁর নথিতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ল্যাংলী সাহেব হরিদাসবাবুর যোগ্যতার প্রশংসা করে তাঁর সে আবেদন লখ্‌নৌ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠিয়েছিলেন, এ তথ্য পাওয়া যায়। এটা ১৯২৯ সালেব ফেব্রুয়ারি মাসের কথা।

হবিদাসবাবুব ব্যক্তিগত নথিতে তাঁর সম্পর্কে ভারতের বিখ্যাত দার্শনিক আচার্য ব্রজেন্দ্র–নাথ শীলেব একটি প্রশংসাপত্র রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পর হরিদাসবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে এই প্রশংসাপত্রের একটি কপি পাঠিয়েছিলেন এবং এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন :

"On perusing certain portions of my scientific work, The Evolution of Individuality and of my philosophical work, The Principle of Activism, Dr. Brojendra Nath Seal under whom I had the honour of serving in the Philosophy Department of the Calcutta University for about three years has sent a certificate ...."

স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলেব প্রশংসাপত্র পাওয়া একজন ছাত্র কিংবা শিক্ষকেব পক্ষে অবশ্যই গর্বের বিষয়। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তখন মহীশুর বিশ্ববিদ্যালয়েব ভাইস চ্যান্সেলব। সেখান থেকে ৭ আগস্ট ১৯২২ তাবিখে তিনি হরিদাসবাবুকে নিম্নোক্ত প্রশংসাপত্রটি পাঠিয়েছিলেন :

Mysore

7th August, 1922.

I have known Professor Haridas Bhattacharyya for the last eight years in various capacities and I have had ample opportunities of judging his personal worth, his mental calibre and his attainments in philosophy. He has a full mind, a rapid sweep of thought which does

not however miss the significant details in the ensemble and a marked gift of lucid and interesting exposition. He has studied with great profit the foundations of recent philosophical thought in physical and biological sciences and kept himself abreast of the modern developments of experimental and comparative psychology. I have no hesitation in stating that alike by his metaphysical acumen and his strenuous thinking, by his clearness of ideas, his knowledge of the principles and methods of physical and biological sciences and his gift of exposition he is exceptionally fitted to occupy the chair of professor of Philosophy in any Indian University.

Brojendra Nath Seal
Vice chancellor,
Mysore University

হরিদাসবাবুর বৃহৎ আকারের গ্রন্থের মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ হয়ে আছে তাঁর Foundations of Living Faiths। এছাড়া ১৯২৭ সনের ২৯ এপ্রিল তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরকে হরিদাসবাবুর শিক্ষাগত অভিজ্ঞতার যে বিবরণ দেন তাতে নিম্নোক্ত কথা ক'টি অন্তর্ভুক্ত হতে দেখা যায়:

"(1) Teaching Experience: that Mr. Bhattacharyya was professor of Philosophy in the Scottish Churche's College, Calcutta and Lecturer in Philosophy and Experimental Psychology, Calcutta University before entering the service of the Dacca University in 1921..." হরিদাস বাবুর নথির মধ্যে Inferiority Complex নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধের কপি রক্ষিত হতে দেখা যায়। ঐ প্রবন্ধটি ব্যক্তির হীনম্মন্যতা বোধ, তার প্রকাশ প্রভৃতির ওপর মনোহর ইংরেজিতে লিখিত একটি আকর্ষণীয় রচনা। প্রবন্ধটি পঠিত হয়েছিলো ১৯২৭ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের 'সাইকোলজি সেকশনে' এবং 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকার জানুয়ারি ১৯২৭ সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়। লেখাটির প্রাঞ্জল-উপস্থাপনায় যথার্থই মুগ্ধ হতে হয়। আমাদের দর্শন বিভাগ তাঁদের কোনো মুখপত্র বা বার্ষিক প্রকাশনায় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি পত্রিকায় আজো লেখাটি হরিদাসবাবুর নথি থেকে উদ্ধার করে পুনর্মুদ্রণ করলে আমাদের ছাত্রছাত্রী এবং পাঠকসাধারণ একটি সুন্দর রচনা পাঠে উপকৃত বোধ করবেন।

Foundations of Living Faiths-এর প্রথম খণ্ডের একটি কপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে এখনো রক্ষিত আছে। এর দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছিলো কিনা তা আমার জানা নেই। এ গ্রন্থের প্রকাশক ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রকাশকাল ১৯৩৮। গ্রন্থখানির নাম পৃষ্ঠাটি ছিলো নিম্নরূপ। এই নাম পৃষ্ঠায় তিনি যে জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট সে কথারও উল্লেখ দেখা যায় :

STEPHANOS NIRMALENDU GHOSH LECTURES
THE FOUNDATIONS OF LIVING FAITHS
(An Introduction to Comparative Religion)
by
HARIDAS BHATTACHARYYA
Provost, Jagannath Hall
and
Head of the Department of Philosophy
University of Dacca
First Volume
Published by the University of Calcutta
1938

গ্রন্থখানি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর পিতার নামে। উৎসর্গ বাক্যটিতেই হরিদাসবাবুর পিতার নাম পাওয়া যায়:

"To the sacred memory of my father,
Pandit Ramprasanna Sruti Ratna Battacharyya
whose life has ever been to mean ideal and an inspiration"

এই গ্রন্থ মূলত ছিলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত একটি বক্তৃতামালার ভিত্তিতে রচিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত 'স্টিফানোস নির্মলেন্দু ঘোষ লেকচার্স' সেকালের একটি মর্যাদাবান বক্তৃতা ছিলো। এ বক্তৃতাদানের আহ্বান যখন ১৯৩২ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্যের নিকট আসে তখন তাঁর বয়স হয়ত ৪২ বছর। কিন্তু সে বয়সের জন্যও এমন গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতাদানের আহ্বান একটি সম্মানের বিষয় ছিলো। এই বক্তৃতাদানের জন্য তাঁকে সম্মানী দেওয়া হয়েছিলো ৯০০০ টাকা, আজকের মূল্যমান হিসেব করলে নিশ্চয়ই এটিকে লক্ষ টাকা বলে উল্লেখ করা যায়।

Foundations of Living Faiths বা 'জীবন্ত ধর্মসমূহের ভিত্তি'। বিষয়টি হরিদাসবাবুর বিশ্বাস ও প্রজ্ঞার সঙ্গে অবশ্যই সঙ্গতিপূর্ণ ছিলো। আগ্রহী গবেষক বা পাঠক এই গ্রন্থখানার সঙ্গে প্রাথমিকভাবেও পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করলে একদিকে যেমন মুগ্ধ হবেন হরিদাসবাবুর সকল ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানের বিস্তার এবং গভীরতা দেখে, তেমনি চমৎকৃত হবেন একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ইসলাম ধর্মের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা তাঁর উদারতা এবং পারদর্শিতা দেখে।

'স্টিফানোস বক্তৃতা' দানকে হরিদাসবাবু নিজেও বিশেষ সম্মানের বিষয় বলে বিবেচনা করেছিলেন। সেই বোধেরই প্রকাশ দেখা যায় তাঁর এই গ্রন্থের 'প্রিফেস'–এর মধ্যে।

I am much flattered to think that the distinction of a fairly orthodox Brahmin being appointed to a christian endowment during the regime of a Muslim Vice-Chancellor should have fallen first on me.

By a curious coincidence I had the unique privilege of being born in one of the greatest strongholds of Sanskrit learning and Hindu orthodoxy in Bengal, of being educated in one of the oldest Missionary colleges of Calcutta and of spending the greater part of my teaching career at one of the most important centres of Muslim Culture in India. ..." (P. Viii, Preface Foundations of Living Faiths.)

এই প্রিফেস-এর মধ্যেই ধর্ম সম্পর্কে তাঁর নিজের অভিমতেব উল্লেখ করতে গিয়ে হরিদাসবাবু বলেছেন:

"... I have also made no secret of my belief that most, if not all, religions fight ignorance half heartedly for fear lest a widespread culture should mean the disowning of all spiritual obligations and a gradual loss of influence of those new in spiritual power over the uneducated masses. I have not subscribed, however, to the view that religion as a distinctive attitude towards life and reality is ultimately destined to pass away with the growth of education and the development of industry ... (ঐ P. IX)

'প্রিফেস'-এর এই মন্তব্যটিও উল্লেখযোগ্য যে বক্তৃতাগুলো তিনি লিখিতভাবে পাঠ কবেন নি, উপস্থিত বক্তৃতা হিসেবে দিয়েছেন: ... Following my usual practice, I delivered the entire series of lectures extempore in order to be better able to adjust my discourse to the actual audience of the day..." (ঐ P.IX). এও তাঁর স্বভাবসুলভ। আমার ছাত্রজীবনেব এমন কোনো দিনকে স্মবণ করতে পাবিনে যেদিন হরিদাসবাবু তাঁব স্বতঃস্ফূর্ত বাগ্মিতা বাদ দিয়ে লিখিত কোনো কিছু আমাদেব পাঠ করে শুনিয়েছেন।

ইসলাম ধর্মকে সুবিস্তারিতভাবে যে তিনি আলোচনা করেছেন তাঁর এই গ্রন্থে তার পরিচয় পাওয়া যায় এ থেকে যে 'গড ইন ইসলাম' এই শিরোনামের প্রায় ৬৫ পৃষ্ঠাব্যাপী অধ্যায়তে। তিনি ইসলাম-পূর্ব যুগের শক্তিসমূহ থেকে শুরু করে 'ইসলামের রহস্যবাদ ও হিন্দু সর্বেশ্বরবাদ' শিরোনামে বিভিন্ন উপ-অধ্যাযসমূহে যে আলোচনা কবেছেন সে উপ-অধ্যায়গুলোর সংখ্যা হচ্ছে চৌষট্টিটি। এই উপ-অধ্যায়গুলোর আকার যে বৃহৎ, তা নয়। কিন্তু এতে ইসলাম ধর্মের এবং মুসলিম দর্শনের যে সমস্যাসমূহের তিনি আলোচনা করেছেন তার মাঝেই তাঁর জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় মেলে। হরিদাসবাবুর আলোচিত সমস্যাগুলোর মধ্যে

'Pre-Islamic Religious Forces', 'The Quranic Revelation', 'The Last Prophet', 'Christ and Muhammad as rival Prophets', 'Muhammad's miracles', 'Islam as the universal religion', 'The Nature of Islamic

Toleration', 'The Quran and the Bible', 'The Quranic view of God', 'The Mutazilite view of God', 'The ninety nine names of Allah', 'Divine Will and Human Destiny', 'Human Freedom', 'Divine Forgiveness', 'Divine Mercy', 'The orthodox and Mutazilite views', 'Al-Asharis opinion', 'Islamic mysticism', 'Islamic mysticism and Hindu Polytheism'— প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ করা যায়। এ গ্রন্থটিকেও পুনর্মুদ্রিত আকারে বাংলাদেশের আজকের ছাত্র, শিক্ষক এবং পাঠক-সাধারণের কাছে পৌঁছাবার দায়িত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার দর্শন বিভাগের পালন করা উচিত। হরিদাসবাবুর ব্যক্তিগত নথিটি তাঁব মনোহর হস্তাক্ষবে লিখিত নানা মন্তব্য, স্লিপ, পত্র, স্মাবক ইত্যাদিতে পূর্ণ। হযত হস্তাক্ষর সবচেযে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে পাঠানো তাঁর ছুটিব আবেদনে। তার সংখ্যাধিক্যে এই নথিটির পাঠকের মনে হতে পারে যে হবিদাসবাবু অসংখ্যবার ছুটি নিয়েছেন। আসলে ব্যাপারটি তা নয়। কিন্তু অসংখ্য এই ছুটিব আবেদনেব যে বৈশিষ্ট্যটি আমাকে বিমোহিত করেছে সে হচ্ছে তাঁর কর্তব্যপরায়ণতা এবং দাযিত্ব পালনে নিয়মনিষ্ঠা। নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে না পাবলে অবশ্যই পদাধিকাবীকে নিয়মমাফিক সকাবণ ছুটিব আবেদন করতে হবে এবং ছুটি এ্যালাউ করতে হবে। 'ফ্রেঞ্চ লিভ' বলে ইংরেজিতে একটি কথা আছে। সেটি শব্দগতভাবে আমরা যতো না ব্যবহার করি, কার্যগতভাবে তার অধিক যে তাকে ব্যবহার করি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু হবিদাসবাবু নিশ্চয়ই 'ফ্রেঞ্চ লিভ' ব্যাপারটি সম্পর্কে চরিত্রগতভাবে জ্ঞাত ছিলেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের অফিসও হয়ত হরিদাসবাবুর এমন নিয়মনিষ্ঠায় কিছুটা বিব্রত হযেছিলো। তাই হরিদাসবাবু যখন একদিনের ছুটির আবেদন করে একটি দরখাস্ত পাঠিয়েছিলেন তখন দেখা গেল রেজিস্ট্রার সাহেবের অফিসে এক সহকারী হরিদাসবাবুকে লিখে পাঠাচ্ছেন : 'V.C. says that you do not really require the leave.' কিন্তু এব উত্তরে হবিদাসবাবু লিখে পাঠালেন: 'I was obliged to cut two classes from 10-30 to 12-30. So formal leave would still be required'. এই মনোভাবেরই পরিচয পাওয়া যায আব একটি চিঠিতে যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি.সিকে তিনি চিঠি লিখে বলেছেন : (১.৩.৩৫):

"Dear Mr, Vice-Chancellor,

As I was detained too long at the Court to be able to take my class, I pray that duty leave for this day only be granted to me....

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিস্মৃত তথ্য হিসেবে এখানে একটি কথা বলা যায়। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠানগতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষকদের সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, সে সিন্ডিকেট বা ভিসি যিনিই হোন, তিনি নিয়োগকারী, এমপ্লয়ার এবং শিক্ষক হচ্ছেন এমপ্লয়ী। সেদিন অর্থাৎ বিশের বা ত্রিশের দশকে অন্য কর্মচারিদের ক্ষেত্রে কি ছিলো তা জানিনে। কিন্তু শিক্ষকদের বিশ্ববিদ্যালয় সরাসরি 'ইউ আর এ্যাপয়েন্টেড' বলে কোনো নিয়োগপত্র দিতেন না।

শিক্ষক আর বিশ্ববিদ্যালয় এরা উভয় ছিলো দু'টি পক্ষ, সমপক্ষ। তাদের মধ্যে চুক্তি হতো। উভয়পক্ষের জন্য চুক্তির শর্ত উল্লেখ থাকত। এবং উল্লেখ থাকত যে, এক পক্ষ চুক্তির কোনো শর্ত ভঙ্গ করলে অপর পক্ষ তার প্রতিবিধানের কি পথ গ্রহণ করতে পারবে। আজো অবশ্য পক্ষ দু'টি। তবু সেদিন 'চুক্তির' পদ্ধতিতে আজকের প্রভু-ভৃত্যের দিকটি এত প্রকট হয়ে চোখকে বিদ্ধ করতো না।

একেবারে গোড়াতে অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে এমন চুক্তিপত্রও শিক্ষকদের জন্য তৈরি হযেছিলো না। ভাইস চ্যান্সেলবের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছিলেন। ১৯২৩ সালের দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে উভয় পক্ষে চুক্তিপত্র সম্পাদিত হতে শুরু করে এবং এরূপ চুক্তিপত্রে মাহিনার শর্তে যে গোড়াকাব প্রতিশ্রুতির পবিবর্তন ঘটেছিলো তার আভাস পাওয়া যায় হবিদাসবাবু ১৯২৩ সনে বেজিস্ট্রারকে যে প্রতিবাদপত্র লিখেছিলেন, তা থেকে। হবিদাসবাবুব নিকট প্রেবিত চুক্তিপত্রের গোড়াতে ছিলো :

'Where as the Executive Council of the Dacca University in exercise of the powers conferred on them by the Dacca University Act have engaged the party of the first part (Mr. Haridas Bhattachayya) to serve as a Reader in Philosophy in the University of Dacca till he attains the age of fifty five and subject to the conditions and agreements herein contained ...

3. That from the first of July nineteen hundred and twentyfour the University will pay him, so long as he shall remain in the said service and actually perform his duties, a salary at the rate of Rupees 700/- Seven hundred (fixed) per mensem.

'৭০০' টাকা নির্দিষ্ট মাহিনাব এই শর্তের প্রতিবাদে হরিদাসবাবু রেজিস্ট্রারকে লিখেছিলেন : (১৮.১২.১৯২৩)

" This is the first official intimation that I have received from the University that the maximum has been reduced from Rs 1200/- to Rs 700/- in the case of Readers ... ... Taking all the facts together the matter comes to this that instead of a maximum of 1200/- pay and 120/ - as P.F. contribution of the University I am being offered now practically half of what was in the original offer and this inspite of the fact that I wanted a definite assurance from the Vice-Chancellor that the maximum offered would not be varied from ... ..."

আমার স্মরণমতে হরিদাসবাবু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'রিডার' হিসেবেই অবসর গ্রহণ করেন ১৯৪৫ সনে। অর্থাৎ তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো ৫২ বছর। (সে হিসেবেও হরিদাসবাবুর জন্ম সন নির্দিষ্ট করা যায় ১৮৯০ সাল।) এই দীর্ঘ সময়ে অর্থাৎ ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় পঁচিশ বছর কার্যকালে তাঁর মাহিনার সেই নির্দিষ্ট ৭০০ টাকার কোনো পরিবর্তন ঘটেছিলো কিনা, আমার জানা নেই।

বাংলাদেশের যেমন রাজনীতি আছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরও তেমনি রাজনীতি আছে। ইংরেজিতে আমরা বলি 'ইউনিভার্সিটি পলিটিকস'। এটি নিশ্চয়ই কোনো আধুনিক উপাদান নয়। এটি সেকালেও ছিলো। তবে একালের মত হয়তো সেকালে এত প্রকট বা পোশাক-আশাকবিহীন ছিলো না।

এই রাজনীতির আভাসই পাওয়া যায় হরিদাসবাবুর জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের একসিকিউটিভ কাউন্সিলের ১০.২.১৯৩৭ তারিখের কার্যবিবরণী থেকে।

হরিদাসবাবু ১৯৩৫ সনে কলা অনুষদের ডীন নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৯৩৭ সনে অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত হলে জগন্নাথ হলের জন্য নতুন প্রভোস্ট নিয়োগেব প্রয়োজন দেখা দেয। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এতদিন জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট ছিলেন। সেকালে হলের প্রভোস্ট পদও স্থাযী চাকরি বলে গণ্য হতো এবং সেই হিসেবেই প্রভোস্ট নিযুক্ত হতেন।

উল্লিখিত তারিখে একসিকিউটিভ কাউন্সিলে বিষয়টিকে আলোচ্য বিষয় করা হয়। সভার কার্যবিববণীটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে সেকালের বিশ্ববিদ্যালয় পলিটিক্স-এর পরিচায়ক হিসেবে। বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন উদ্যোগী এবং কর্মীপুরুষ হরিদাস ভট্টাচার্য যে অজাতশত্রু ছিলেন, এমন মনে করা যায় না। তবে তাঁর গুণগ্রাহীরও অভাব ছিলো না। তাই দেখা যায়, সে সভার শুরুতে হরিদাস ভট্টাচার্যকে জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট পদে নিয়োগের প্রস্তাব উথাপন কবেন ডঃ এন.এম. বসু এবং ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। কিন্তু এ প্রস্তাবের বিরোধিতা আসে জনাব এস.এ. সেলিম এবং সুলতান উদ্দিন আহমেদের কাছ থেকে।

তাঁরা কয়েকটি নামের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের সুপারিশ করে সেই কমিটির কাছে জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনার জন্য প্রেরণ করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু যাঁদেব নিয়ে এই কমিটি গঠনের প্রস্তাব হয় তাঁদেব মধ্যে পি.এন. রায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে কমিটি গঠনের প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায় এবং মূল প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় :

"Original motion was put to vote and carried, eight members voting for it and three members against. Messrs Fazlur Rahman, Sultan uddin Ahmed and S.A. Salim voted against the motion"

এই সভারই শেষে অবশ্য ফজলুর রহমান এবং সেলিম সাহেবও হরিদাসবাবুর প্রভোস্ট নিয়োগে সম্মত হয়েছিলেন।

একসিকিউটিভ কাউন্সিলের এই প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার হরিদাসবাবুর নিকট ১০.২.৩৭ তারিখে প্রেরণ করে লিখেছিলেন :

Dear Sir,
I am directed to communicate to you the following resolution of the Executive Council adopted at its meeting on 10th February, 1937:

"That Mr. H. D. Bhattacharyya, M.A.B.L. Head of the Department of Philosophy, be appointed Provost of the Jagannath Hall on an allowance of Rs. 150/- per mensem and free quarters for a period of two years in the first instance, with effect from the 11th February, 1937 and that with approved service the appointment may be renewed up to the end of the session in which he will attain the age of 55 years."

১৯৪৫ সনে হবিদাসবাবু চুক্তি মোতাবেক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযেব দর্শন বিভাগের রীডার হিসেবে অবসর গ্রহণ করে কলকাতা চলে যান। পঞ্চান্ন বছব তখন তাঁব বয়স। সে বয়স কর্মক্ষম থাকার বযস।

হরিদাস ভট্টাচার্যের জন্য অবসরগ্রহণেব বয়স ছিলো না। হবিদাসবাবু কি তাঁব চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য কোনো আবেদন বা চেষ্টা করেছিলেন? সেদিনকার গোবেচারী ছাত্র আমার তা জানা নেই। হরিদাসবাবুর ব্যক্তিগত নথিটিও '৩৭ সনের পর থেকে নিরুদ্দিষ্ট। হযতো চেয়েছিলেন, কিংবা ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক আবহাওয়ার তিক্ততায় তাব ভরসা পান নি। যেমন ভরসা পান নি বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তিনিও তাঁব পঞ্চান্ন বছর বয়সের পূর্তি বা তার পূর্বেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ কবেছিলেন, কারণ আচাব-আচরণে যথার্থ দার্শনিক অধ্যাপক বসু তাঁর চাবপাশে গুঞ্জন শুনছিলেন। সে গুঞ্জনেব প্রধান উৎস ছিলেন কবিৎকর্মা মুসলমান রাজনীতিক জনাব ফজলুর রহমান। তিনিই সরবে দাবি তুলেছিলেন, 'আমাদের একজন মুসলমান পদার্থবিজ্ঞানী আবশ্যক। সত্যেন্দ্রনাথ বসু হিন্দু।' অবশ্য অধ্যাপক বসুকে আবো কিছুদিন রাখারও যে প্রচেষ্টা চলে নি তা নয়। কিন্তু অধ্যাপক বসু চান নি তাঁকে নিয়ে এপক্ষে ওপক্ষে টানা-হ্যোচড়া হোক। তাই তেমন প্রচেষ্টার উদ্যোক্তাদেরও নিবৃত্ত করে তিনি ঢাকা ত্যাগ করেছিলেন।

হরিদাস ভট্টাচার্যের আলেখ্য একটি প্রবন্ধে উপস্থিত করা সম্ভব নয়। এ কেবল তাঁকে স্মরণ করার প্রয়াস। হরিদাসবাবু ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই প্রসঙ্গে সেই কালের একটি কৌতুকজনক তথ্যের কথা উল্লেখ করা যায়। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ধর্ম হিসেবে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ কিংবা খৃষ্টান বলে তালিকাভুক্ত করা হয়। কিন্তু ১৯২১ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কার্যবিবরণীতে ছাত্রদের, বিশেষ করে হিন্দু ছাত্রদের কেবল হিন্দু বলে শ্রেণীভুক্ত করা হয নি। তাদেরকে ব্রাহ্মণ এবং অ-ব্রাহ্মণ বলেও ভাগ করা হয়েছে। এই তথ্যটি কালের নির্দেশক হিসেবে তাৎপর্যপূর্ণ। ছাত্র বিবরণীর চার্টটি তাই তুলে দেওয়া গেল :

RACE OR CREED OF PASSED SCHOLARS	HONS BA	PASS BA
Europenas & Anglo Indians	X	X
Indian Christians	X	X
Hindus : Brahmans	5	12
Non-Brahmans	21	69
Muhammedans	11	20

হরিদাসবাবু সম্পর্কে এই আলোচনাটি ব্যক্তিগত একটি বিষয়ের উল্লেখে শেষ করা যায়। হরিদাস ভট্টাচার্য আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ছাত্র ছিলেন। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল অকৃপণভাবে তাঁর পরিশ্রমী, ধীমান ছাত্র হরিদাস ভট্টাচার্যের জন্য প্রশংসাপত্র দিয়েছেন। অধ্যয়ন শেষে শিক্ষক তথা বিভাগীয় প্রধানের কাছ থেকে প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করা ছাত্রদের পক্ষে একটি বোধ্য প্রয়াস। হরিদাসবাবু সম্পর্কে তাঁর ছাত্র হিসেবে আমার এই স্মৃতিটি আনন্দের এবং অনুপ্রেরণার যে,তিনি ঢাকা থেকে চলে যাবার পরেও ১৯৪৭ সনে তাঁর কলকাতার বাড়ি থেকে নিজের টাইপ মেসিনটিতে নিজের হাতে টাইপ করে তাঁর সেই পরিচিত 'এইচ ডি, ভট্টাচাবিয়ার'স্বাক্ষরে আমাকে একটি প্রশংসাপত্র পাঠিয়েছিলেন। সে প্রশংসাপত্র পেয়ে আমি যেমন অনুপ্রাণিত হয়েছি, তেমনি তাঁর প্রশংসাবাচক উক্তির উপযুক্ত নই বলে বিব্রত বোধ করেছি। এমন প্রশংসাপত্র ব্যবহার বা বিক্রি করে কোনো জাগতিক উন্নতি লাভ করতে আমি সঙ্কোচ বোধ করেছি, কিন্তু প্রশংসাপত্রটি তার মূল কাগজ খণ্ডটিতে রক্ষা করতে পেরে বিশেষ আনন্দ লাভ করেছি। এ প্রশংসাপত্র টিকিধারী ব্রাহ্মণ দার্শনিক অধ্যাপক হবিদাস ভট্টাচার্য যে তাঁর স্নেহভাজন একটি কিশোর ছাত্রের প্রশংসায় তাঁরই শিক্ষক আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মতোই অকৃপণ এবং উদার ছিলেন সেই সাক্ষ্যই বহন করছে, আমার নিজের কোনো কৃতিত্বের স্বাক্ষব নয়। ইতিহাসেব বিষয় বলেই তাঁব কয়েকটি ছত্র এখানে উদ্ধৃত করা গেল :

"Apart from his intellectual briliance, Mr. Sardar has been a steadying force in the Department. Genial by temperament and social to a fault, Mr. Sardar has proved a cementing force among various sections of students, belonging to different halls of the university and I can testify from personal knowledge to his popularity as a student of the university. He was also noted for his social service and his sympathy for the poor and the needy. His teachers are all praise for him and justifiably so."

দুই পৃষ্ঠাব্যাপী এমন প্রশংসাপত্রের পুরো উদ্ধৃতিতে প্রায় চল্লিশ বছর পরে আজো আমি সঙ্কুচিত। তবে এতে মনোবিজ্ঞানী হরিদাস ভট্টাচার্যের এমনপ্রত্যয়টিও ধরা পড়ে যে, তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রশংসা করেই মাত্র স্নেহভাজনকে প্রশংসার যোগ্য হওয়ার প্রয়াসে উদ্বুদ্ধ করা যায়।

হরিদাস ভট্টাচার্য আজ বেঁচে নেই। কবে তিনি প্রয়াত হয়েছেন, তার তারিখ বিনা অনুসন্ধানে বার কবা ঢাকায় তাঁর পুরাতন ছাত্রদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। ১৯৫৫ সনের ৯ সেপ্টেম্বর হরিদাস ভট্টাচার্যের মৃত্যুর তারিখটি সেদিনের পাকিস্তানভুক্ত ঢাকার কোনো কাগজে সংবাদ হয়েছিলো কি না, আমার জানা নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা দর্শন বিভাগ প্রতিষ্ঠানগতভাবে তার প্রতিষ্ঠাকালের অন্যতম সংগঠক শিক্ষক হরিদাস ভট্টাচার্যকে স্মরণ করেছিলো কিনা সেটিও আমার অজ্ঞাত। জগন্নাথ হলের বর্তমান প্রাধ্যক্ষ সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ রঙ্গলাল সেন অনুসন্ধান করে জানিয়েছেন, তখনকার ঢাকা–জগন্নাথ হলের যুক্ত ছাত্রাবাসের প্রভোস্ট এবং ছাত্রগণ একটি শোকসভায় মিলিত হয়ে হরিদাস ভট্টাচার্যকে সেদিন স্মরণ করেছিলেন। ইতিহাসকে বিস্মরণের প্রবাহে তাঁরা সেদিন অন্তত একটি ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত স্থাপন কবেছিলেন, হরিদাসবাবুর একজন ছাত্র হিসেবে এজন্য জগন্নাথ হলেব ছাত্রদের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

মিস এ.জি. স্টকের স্মৃতিকথা

শুনলাম, ঢাকা ইউনিভার্সিটিব ইংবেজি বিভাগের এক সময়কার ইংরেজ অধ্যাপিকা মিস এ.জি. স্টক কয়েকদিনেব জন্য আবার ঢাকায বেড়াতে এসেছেন। আমি নিজে তাঁর নিকট পরিচিত নই। তাহলে আমি গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে আসতাম। ইংরেজি বিভাগ থেকে, শুনেছি, একটি সংবর্ধনা জানানো হবে। তাতে জোর করে উপস্থিত হওয়াটা ঠিক হবে না। কিন্তু সেটি বড় কথা নয়। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় অপরিচয় বড় নয়।

মিস স্টকের নামের সঙ্গে আমি সেই '৪৭ সালেব দিকেই পবিচিত হয়েছিলাম। অবশ্য তিনি যখন ভারত বিভাগেব সমযে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েব ইংরেজি বিভাগে এসে যোগ দেন, তখন একদিকে যেমন আমার নিজের বিশ্ববিদ্যালয়েব ছাত্রজীবন শেষ হয়েছে, তেমনি অপরদিকে আমার রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছে। পুলিশের দৃষ্টি আমার ওপব পড়তে শুরু কবেছে। এর ফলেই ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি আমি নিজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপনার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে একেবারে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যাই। আর তারপরে ১৯৪৯–এর ডিসেম্বরে গ্রেফতার হওয়া থেকে আমার দীর্ঘ বন্দীজীবনের শুরু হয়। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক মিস স্টকের সাহচর্যে আসা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি।

কিন্তু যে সাহচর্য আমি সাক্ষাৎভাবে লাভ করি নি সেটিই পেয়েছিলাম আজ থেকে বছরখানেক আগে তাঁর ঢাকার স্মৃতিচারণমূলক 'নাইনটি ফরটি সেভেন টু ফিফটিওয়ান মেময়েরস অব ঢাকা ইউনিভার্সিটি' শিরোনামে বইখানি যখন পড়ি। তাঁর এই স্মৃতিচারণের মধ্যে মিস স্টক একজন দরদী ও জনপ্রিয় শিক্ষক হিসেবে কেবল প্রকাশিত হন নি, তিনি পূর্ব বাংলার সে সময়কার ছাত্র–শিক্ষক–মধ্যবিত্তের প্রগতিশীল ভাষা–সংস্কৃতির আন্দোলনের

একজন অকৃত্রিম সুহৃদ হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করেছেন।

বইখানা প্রথমে যখন পড়ি তখন আমার খুবই ভাল লেগেছিলো। এর প্রধান কারণ, ১৯৪৭–৫১—এই সময়কার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনকে জানার আমারও একটি আগ্রহ আছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আমি ছাত্র ছিলাম। কিছুকাল এর শিক্ষকও ছিলাম। আজ আবার এর সঙ্গে শিক্ষক হিসেবে জড়িত হয়েছি। অধ্যাপিকা মিস স্টকের সরস ও সুন্দর অর্থময় উক্তিপূর্ণ স্মৃতিচারণ আমাকে সেই সময়কাব জীবনে ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষমতায় ঋদ্ধ এবং সে কাবণে এই স্মৃতিচাবণ পাঠে একটা আনন্দ ও কৃতজ্ঞতাবোধ আমার মনকে পূর্ণ কবে তুলেছিলো। রোজনামচার আকারে লিখিত এ স্মৃতিচাবণে অধ্যাপিকা স্টক তাঁর সেই বিলেত থেকে ঢাকা এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি গ্রহণ করা থেকে ১৯৫১ সালের শেষে পূর্ব পাকিস্তান ও পাকিস্তান সরকারের নির্বোধ আচরণের ফলে ক্রমাধিক পরিমাণে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক হত্যা এবং রাজনৈতিক উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে ঢাকা ত্যাগের সময় পর্যন্ত তাঁব অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন। কেমন কবে ধীরে ধীবে তিনি পরিচিত হয়েছেন পূর্ববঙ্গের জীবনের সঙ্গে। তার আবহাওয়া–রাস্তাঘাট–মানুষের সঙ্গে। কেমন করে হৃদ্যতা তৈবি হযেছে তাঁর বিশ্বস্ত বাবুর্চি আবদুল থেকে ছাত্র, শিক্ষক সম্প্রদায়েব বুদ্ধিমান, সমাজসচেতন চরিত্রসমূহের সঙ্গে। মুনীর চৌধুরী, সারওযার মুর্শিদ, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, ডঃ পি সি চক্রবর্তী, কবি জসিমউদ্‌দীন, ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ মাহমুদ হাসান এঁবা সবাই অন্তরঙ্গ বেখাচিত্র হিসেবে তাঁর বোজনামচায় ফুটে উঠেছেন। রচনার সমগ্রটিতে একজন দরদী সুহৃদেব মনোভাব প্রকাশ পেযেছে। অধ্যাপিকা মিস স্টকের এ রচনা ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ সালের হলেও এটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৩ সালে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি যে একটি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তৈরি করেছিলেন সেটি তিনি কখনো বিস্মৃত হন নি। তাঁব সেই অকৃত্রিম সম্পর্কের টানেই তিনি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আবার ঢাকা এসেছিলেন ভিজিটিং প্রফেসব হিসেবে। তখনি তিনি এই পাণ্ডুলিপিটি ঢাকার গ্রীন বুক হাউজের রুচিবান প্রকাশক মাহমুদ সাহেবের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। গ্রন্থে লেখিকা তাঁব মূল রচনার পববর্তীকালের ঘটনাবলির আভাসও তাঁব ভূমিকাতে দিয়েছেন। সে ভূমিকায় তিনি লিখেছেন :

... I had reached the language riot of nineteen fortyeight when the war brokeout in march 1971 and the present came horryfyingly to life on screen, radio and the newsprint smothering memories. It was months before I learnt anything of the fate of my friends Jyotirmoy guha thakurta was killed in the presence of his students, Munir chowdhury, with his gallantry and gaiety was a body among many bodies in the brickfield ...

আমার স্মৃতিচারণে আমি ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনে যখন পৌঁছি তখন ১৯৭১-এর মার্চে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। এবার অতীতকে আচ্ছন্ন করে মর্মান্তিক বর্তমান আমার সামনে এসে হাজির হলো। ছবিতে দৃষ্ট সে দৃশ্য, বেতারে শ্রুত তার কাহিনী আর

নিউজপ্রিন্টে মুদ্রিত তার বিবরণ আমার অতীতের স্মৃতিকে একেবারে রুদ্ধ করে দিল। কিন্তু বেশ কয়েক মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে আমি জানতে পারলাম না আমার সেদিনের বন্ধুদের কার ভাগ্যে কি ঘটেছে। অবশেষে জানলাম জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে হত্যা করা হয়েছে, তাঁর ছাত্রদেরই সামনে। সদাহাস্য মুনীর চৌধুরী একটা ইটের ভাটিখানায় বহু মৃতদেহের একটি মৃতদেহে পর্যবসিত হয়েছেন।...

মিস এ জি স্টকের এই স্মৃতিচারণ একখানি মূল্যবান গ্রন্থ। সাহিত্যপত্র এবং সাহিত্যিক মহলে বইখানির আলোচনা হওয়া উচিত। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের যেমন এ একটি উত্তম সৃষ্টি, তেমনি পূর্ববাংলার ১৯৪৭–৫১ সময়কালের জীবন ও নানা চরিত্রের অন্তরঙ্গ আলেখ্যে এ গ্রন্থ অনন্য। বাংলা অনুবাদে মিস স্টকের প্রকাশ মাধুর্য হয়ত বক্ষিত হবে না, তবু ১৯৪৭ থেকে '৫১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের জীবনের একখানি অনুপ্রেরণাদায়ক অন্তবঙ্গ ইতিহাস হিসেবে এব অনুবাদ হওয়া প্রযোজনীয় বলে আমার মনে হয।

সানাউল হক : চল্লিশের দশকের অন্যতম সাথী

প্রায ১২ বছব আগে, '৮১ সালের জানুয়ারি মাসের এক রাতে আকস্মিকভাবে টেলিভিশনের আওয়াজে শুনেছিলাম সৈয়দ নূরুদ্দিনের প্রয়াণের কথা। ১২ বছব পবে '৯৩–এব ৪ ফেব্রুয়ারি বাতে টেলিভিশনের শেষ সংবাদ পাঠিকাব কণ্ঠে খবব পেযে চমকে উঠলাম: আমাদের চল্লিশেব দশকেব অন্যতম সুহৃদ, সাথী, কবি সানাউল হকও চলে গেছেন।

সানাউল হক অসুস্থ ছিলেন। বেশ কযেক বছর আগে যখন দেখা কবতে গিয়েছিলাম তখনো তিনি আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক জীবনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলছিলেন। বাংলা একাডেমির তিনি সভাপতি ছিলেন। বোধ হয একুশের এক বক্তৃতায় তিনি অপ্রত্যাশিত সাহসী বক্তব্য উপস্থিত করে আমাদের চমকে দিয়েছিলেন। আমাব নিজের সাংসারিক জীবনেব নানা সঙ্কট ও সীমাবদ্ধতাব কাবণে মনেব ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সানাউলের কাছে গিয়ে বসতে পারি নি। অথচ নিজেব মনে তাব সঙ্গে কখনো আমার অন্তবের কথা বন্ধ হয় নি।

সানাউল, নূরুদ্দিন: দু'জন বোধ হয একই বয়সেব ছিলেন। বয়সে আমাব জ্যেষ্ঠ। কিন্তু সম্পর্কে আমাদের পরস্পরের মধ্যে কখনো বয়সের কোনো প্রশ্ন আসে নি। আসলে আমরা সেদিন, সেই রূপকথার যুগে, জানতামই না আমাদেব কার বয়স কত। আমরা কেউ কারুর চাইতে ছোট কিংবা বড় ছিলাম না। সকলেই সকলের সমান। নূরুদ্দিন তো বটেই, সানাউল হকের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক ছিলো পরস্পরের 'তুমি' সম্পর্ক। কেমন করে আমরা সেদিনই, এই পূর্ববঙ্গের উত্তর পশ্চিম পূর্বদক্ষিণ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আশ্রমে' এসে মিলিত হয়েছিলাম তার কোনো হদিস আজ চেষ্টা করেও আমি বার করতে পারছিনে। জল যেমন নিঃশব্দে জলের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায়, নদী যেমন পূর্ণতার টানে সাগরে মেশে, আমরাও সেদিন জল আর নদীর মতো নিজেদের অজান্তেই পরস্পরের অন্বেষণে

ছিলাম এবং সেই অন্বেষণে পরস্পরকে লাভ করেছিলাম। আর তাতেই তৈরি হয়ে উঠেছিলো নতুন জীবন ও স্বপ্নের বোধে উদ্বুদ্ধ সুহৃদ ও সাথীর একটি গোত্র। সেই গোত্রের পরস্পরের মধ্যকার ঘনিষ্ঠতা আর হৃদ্যতার কথা একালের তরুণ-তরুণী, এমন কি বয়স্কদেরও বুঝিয়ে বলা, লিখে জানানো একেবার অসম্ভব। আর তাই আমি যখন সানাউলের বাড়িতে গিয়েছি, কিংবা টলস্টয়ের জন্মের ১৫০ তম বার্ষিকীতে একই মঞ্চে যে যার ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেছি, তখন আমাদের পারস্পরিক দৃষ্টিতে যে প্রীতি ও স্মৃতির আবেগ উদ্ভাসিত হতো, তা অপর কারুর পক্ষে বুঝতে পারা সম্ভব হতো না।

পূর্ববঙ্গের এমন অঞ্চল আছে যে অঞ্চলেব দুই সুহৃদ একান্তভাবে পরস্পর সংলাপে রত হলে অপর অঞ্চলের মানুষের পক্ষে তার মর্মার্থ অনুধাবন করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে ওঠে। তেমনি আমাদের অবস্থা হতো যখন সানাউল, নুরুদ্দিন, মতিন, মুনীর, কামাল, নূরুল ইসলাম, বাহাদুর একালেও মিলিত হতাম এবং একে অপরকে প্রীতির আলিঙ্গনে আবদ্ধ কবতাম। তখন একালের পারিপার্শ্বিক যেন অবাক হযে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকত। তাদের চোখে ভেসে উঠত জিজ্ঞাসা, এরা কারা, এদের এমন গভীর প্রেম আর প্রীতিব বহস্য কি?

নূরুদ্দিন চলে যাওযার পরের দিনও আমার এই কথাগুলো মনে হযেছিলো। আজ ৫ ফেব্রুযারি তারিখে সানাউলের জানাজায শরিক হয়ে মসজিদ থেকে নেমে আনমনে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে সে কথাগুলোই মনে পড়ছে। ক্রমান্বয় একটা সঙ্গীহীনতার অসহায়তা যে বৃদ্ধি না পাচ্ছে, তা নয়। যথার্থই ক্রমান্বয়ে সঙ্গীহীন হয়ে পড়ার একটা অসহায় এবং অনিবার্যতাব বোধ মনটাকে আচ্ছন্ন কবে ফেলছে।

না, দিনক্ষণ মনে করতে পাবছিনে। আনন্দে বিষাদে সঙ্কটে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ফজলুল হক হলেব বাঁধানো ঘাটের সিঁড়িতে, যুদ্ধেব মধ্যে লাভ করা আমেরিকা আর ইংল্যান্ডের সৈনিকদের মধ্যে সাম্যবাদী আদর্শের 'কমরেডদের' সঙ্গে সাহিত্যের আসরে, কিংবা তাদের উদ্যোগে ক্যান্টনমেন্টের সেনাছাউনিতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থনে সংগঠিত বিতর্কে আমবা কে কি বলেছি তা স্মরণ করতে পারছিনে। এমন কি '৪৬ সালেব কলকাতার গণহত্যাব খববে উদ্বেগে অস্থির হয়ে আমবা কেমন কবে ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে চক-ইসলামপুর-পাটুয়াটুলি-নবাবপুরের মধ্য দিয়ে যে শান্তি মিছিল সংগঠিত করেছিলাম, তাতে সানাউল আমার সামনে কিংবা পেছনে ছিলো তা কেমন করে বলব? কিন্তু আমাদের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক সমগ্র উদ্যোগ ও আয়োজনে যে সানাউল থাকত, থাকত, মুনীর, নূরুদ্দিন, মতিন : এতে কোনো সন্দেহ নেই।

একটা কথা ভাবতে আমার অবাক লাগে। কোনো বর্তমানই সমস্যা ও সঙ্কটমুক্ত নয়। তাই কোনো বর্তমানেব মানুষই নিজেকে নিশ্চিন্ত আর সুখী বোধ করতে পারে না। কিন্তু চল্লিশের দশকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয ও ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করে তার সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক জীবনে লালিত-পালিত হচ্ছিলাম যে-আমরা, তারা রাজনৈতিক সঙ্কটে উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হলেও, নতুন স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ আমরা নিজেদের সেই জীবনকে মনে করতাম ভাগ্যবান জীবন। মানুষের মুক্তির তত্ত্বের সন্ধান লাভে আমরা ভাগ্যবান ছিলাম।

সোমেনকে লাভ করার আমাদের ভাগ্য হয়েছিলো। আশ্রম–সম বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে আমাদের তথা সানাউলের, নূরুদ্দিনের, মুনীরেব, মতিনের, নাজমুল করিমের, মুজাফফর আহমদ চৌধুবীব, আমার ভাগ্য হযেছিলো বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন বসুকে লাভ করার, ভাগ্য হয়েছিলো জ্ঞানতাপস ডঃ শহীদুল্লাহর স্নেহ সাহচর্যে ধন্য হওয়ার, ভাগ্য হয়েছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সমগ্র বঙ্গদেশ এবং ভাবতের প্রগতিপন্থী চিন্তাধারার অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে তৈরি করাব উদ্যোগ নেওয়াব। এ কেবল স্মৃতির কথা নয়। এ আমাদের সকলেরই সেইকালেরই সচেতন বোধের ব্যাপাব ছিলো।

আর সে কাবণেই অসুস্থ শরীরে সানাউলেব মন যখন ভেঙে পড়ল, যখন তার একটি প্রকাশিত কবিতার প্রধান অনুবণন ছিলো, 'আমি নিঃশেষ হয়ে গেছি', তখন সে কবিতা পাঠ কবে বন্ধুবর মতিনেব মতো আমার মনও বেদনায ভবে উঠেছিলো। একথা জানতাম, সেই অসুস্থ অবস্থায সানাউল হকেব কাছে গিযে সান্ত্বনা বা আশার কথা বলা নিরর্থক ছিলো। তবু সানাউল তথা আমরা, সেই চল্লিশেব দশকের সুহৃদরা, সাথীরা তাদেব স্বপ্ন ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কি নিঃশেষ আব ব্যর্থ হয়ে গেছি? শবীর দুর্বল হলে অনিবার্যভাবে মনও আমাদের দুর্বল হয়ে পড়ে। তবু সেই অসুস্থ শরীবের হাহাকার এবং আফসোস কি একদিনকার আশাবাদী তরুণ সানাউলদের নিষ্ঠা, আদর্শ ও স্বপ্নের অবদানকে মিথ্যে করে দিতে পারে? যদি আমার সাধ্য থাকত তবে আমি সেই কবিতাটি পাঠ কবার পরে সানাউলকে গিয়ে বলতাম, না, তুমি নিঃশেষ হয়ে যাও নি, তুমি ব্যর্থ হয়ে যাও নি। তুমি মানেই আমবা, আমরা মানেই তুমি। আমি নিজে সেদিন সানাউলেব কাছে যেতে পারি নি। এই না পাবার অক্ষমতাব দুঃখই আজ সানাউলের মৃত্যুর খবব হঠাৎ ৪ তারিখে শুনে আমার মনে বড় হয়ে বাজল।

এই বোজনামচাটি শেষ করার মুহূর্তে হাসনাতের কাছ থেকে ১৯৯০ সালে নওরোজ কিতাবিস্তান থেকে প্রকাশিত সানাউল হকের 'তারুণ্যের দিনলিপি ও অন্যান্য' বইখানা পেলাম। বইখানাকে সানাউল উৎসর্গ কবেছেন একালেব মননশীল সাহিত্যিক–সাংবাদিক আবুল হাসনাত ও সংস্কৃতিবান কর্মী আফজাল হোসেনকে। এই উৎসর্গটিতে কবি সানাউল হকের প্রিযজনদের জন্য স্নেহ ও মমতাব একটি অনাবিল প্রকাশ ঘটেছে।

আমার আফসোস, সানাউলেব জীবৎকালে এই গ্রন্থখানির আমি খবর রাখতে পারি নি। তাঁর ছেলেবেলার কাহিনী বেবিয়েছিলো, তা আমি জানতাম। কিন্তু সানাউল তার সেই চল্লিশেব দশকের তারুণ্যে, কলেজে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযে অধ্যয়নকালে, দিনের পর দিন জীবনের নানাদিকের ওপর তার চিন্তাপূর্ণ মন নিয়ে সুন্দর কাব্যময় গদ্যে দিনলিপি রচনা করে যে ভবিষ্যৎকালের জন্য রক্ষা করেছেন, তা আমি জানতাম না। তাঁর এ দিনলিপি সমগ্র বাংলাসাহিত্যে একটি মূল্যবান ও তাৎপর্যময় সংযোজন বিশেষ। সানাউলের এই দিনলিপি নিয়ে উপযুক্তভাবে কি ঢাকার সাহিত্যিক মহল আলোচনা করেছেন? আমি তেমন আলোচনা সম্পর্কে জ্ঞাত নই।

আমি এখনো সানাউলের দিনলিপি পাঠ শেষ করতে পারি নি। তবু তার মধ্যে থেকে ১০ বৈশাখ ১৩৫০ তথা ১৯৪৩ সালে লিখিত এবং ২৪.৭.১৯৪৩ তারিখে লিখিত দু'টি

দিনলিপির পাঠ মুহূর্তে আমার এই প্রৌঢ়ত্ব থেকে ৫০ বছর ছেঁটে ফেলে আমাকে পৌছে দিল একেবারে কিশোর তারুণ্যে।

'বৈশাখ দশ, ১৩৫০, সাতগাঁও

ভারতের কথা ভাবলে দুঃখ হয়। বর্তমান শতকে এমন বহুধাবিভক্ত আর দুর্দশাগ্রস্ত দেশ হয়তো একটিও নেই। পৃথিবীর আর সব দেশ যখন নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির প্রয়োগে নব নব সম্ভাবনাকে রূপ দিচ্ছে তাদের কর্মে ও চিন্তায়, ভারত তখন পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান, এই দোটানায় পড়ে পড়ে দিন দিন নির্জীব ও শ্রীহীন হয়ে পড়ছে। তার অখণ্ডত্বের ও দ্বিখণ্ডত্বের মধ্যে দর কষাকষি হচ্ছে বিস্তর, অথচ যাকে নিয়ে এ তোলপাড় তার দিকে নজর নেই কারো—এ যেনো মার্কামারা থান কাপড়ের মতো। তাকে ছেঁটেকেটে টুকবো কবলেও যা, আস্ত বেখে ফরাশ পাতলেও তা। যে ব্যবহার করবে, তাব রুচিতেই নির্ধারিত হবে সব কিছু, যাকে ব্যবহাব কবা তাব 'জো হুজুব' কবা ছাড়া যেনো নিস্তাব নেই। ধর্ম ও সংস্কাব তীক্ষ্ণ কাঁচিব মতো হাঁ করে আছে কাব হাতে শিকার পড়বে, শুধু এই ভাবনা। জিন্না ও সাভাবকর, দুই ভিন্ন স্বার্থের প্রধান ভূমিকায় অভিনয় কবছেন। একজন কথাব তুবড়িতে আর একজনকে উড়িযে দেন—দলের লোক চেঁচিয়ে বলে, শাবাশ নওজোয়ান জিতে রাহো। সাগর পাড়েব মুরুব্বিরা আশ্বস্ত হযে, একের অগোচবে অন্যকে উৎসাহ দেন।'

আবাব ২৪.৭.৪৩ তাবিখের দিনলিপিতে সানাউল আমাদের নিযে যান সেকালেব প্রতিক্রিয়া ও বক্ষণশীল শিক্ষাব্যবস্থা এবং তার কর্মকর্তাদেব বিরুদ্ধে সানাউল ও তার 'কমরেডদের' সাহসী উদ্যম উৎসাহ, প্রযাস-প্রচেষ্টার জমিনটিতে।

২৪. ৭. ১৯৪৩

'আমাদের হলেব জনৈক বিলাত-ফেরত উচ্চ শিক্ষিত (?) হাউজ টিউটর আমাদের কমবেড ববিগুহ ও প্রত্যক্ষ দত্তের হলের প্রবেশাধিকাব নিয়ে যে তুমুল হৈ চৈ কবে আমাকে ধমকালেন, তা শালীনতা, ভদ্রতা ও ভব্যতাব বাইবে। তার কথাগুলো এতো জ্বালাময়ী যে তা শুনে আমি বিস্ময়ে হতবাক হতে বাধ্য হলাম। মানুষের চরমতম নিচাশযতার পবিচয় জীবনে আমি বহুবার দেখেছি, কিন্তু তাতে মনে এতোটা বাজে নি। কিন্তু আজ যখন হিন্দু-মুসলমান উভয়ের শিক্ষাদান-কর্তব্যে নিযুক্ত এই শিক্ষক এ বিশ্ববিদ্যালয়েরই দু'টি ছাত্রের হলের আগমন নিয়ে এমন কাণ্ড বাধালেন, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা তথা শিক্ষাগার সম্বন্ধে আমি ঘোর সন্দিহান হয়ে উঠতে বাধ্য হলাম। আমাদেব আজ বুঝিয়ে বলতে হবে যে, শুধু বিধর্মী হলেই মানুষ মানুষের শত্রু নয়, অন্যপক্ষে এক ধর্মাবলম্বী মানুষই পরস্পরের বন্ধু নয়।'

সানাউলের সংযত রুচিপূর্ণ বাকভঙ্গিটি চোখের সামনে আজ ভেসে উঠছে। আমি যেন আমার সদ্যপ্রাপ্ত তাঁর 'তারুণ্যের দিনলিপি' নিয়ে তাঁকে অবাক করে দেওয়ার জন্য রহস্য করে বলছি, দেখতো, এই লেখকটিকে তুমি কি চিনতে পারো?

সানাউল অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আনন্দপূর্ণ আবেগে অসুস্থ শরীরেও হেসে ওঠার চেষ্টা

করে বলছেন, আরে সরদার! এ বই তুমি কোথায় পেলে? তোমাকে দেব বলে ভেবেছি। কিন্তু দেওয়া তো হয় নি।...

আমি সানাউলকে বলছি, তাতে আমার কোনো অভিমান নেই। তোমার এ বই নিয়ে আমাদের অবশ্যই আলোচনা করতে হবে। ...

আমার আফসোস এজন্য আরো যে, সানাউল বেঁচে থাকার সময়ে আমি তাঁর ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'বিরতিবিহীন'–এর উৎসর্গপত্রটি দেখি নি যেখানে তিনি তাঁর চল্লিশের দশকের সতীর্থদের উল্লেখ কবে বলেছেন:

"কবীর চৌধুরী
ওয়াদুদুল হক
সরদার ফজলুল করিম
চল্লিশের দশকেব সহমর্মিতার বন্ধুত্রয়—"

৭.২.৯৩

ওজনের বেলা করিও না হেলা

'ওজনের বেলা করিও না হেলা,
মাপকাঠি তব রাখিও সমান...'

শুধু এই বযাতটিই আমাব মনে আছে। সেই ছোটকাল থেকে। তখন আরো বয়াত আমার মুখস্থ ছিলো। কোরানের সুরা 'আর রহমান'–এর বোধ হয় একখানি কাব্যিক অনুবাদ মিযা ভাই সাহেব এনে দিয়েছিলেন। সে বইয়েব সবটাই আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিলো। বাড়ির সকলে ডেকে ডেকে আমাকে বলতেন, তুমি পড়োত একটু সেই বইখানা। কিন্তু বড় হয়ে, সব ভুলে গেছি তার পদ। কেবল মনে আছে এই দু'টি ছত্র। 'ওজনের বেলা করিও না হেলা, মাপকাঠি তব রাখিও সমান।' কথাটি সুন্দর। মনকে উদ্বুদ্ধ করে। ওজনেব বেলা সতর্ক থেকো। দেখো, যেন সেখানে কোনো এদিক–ওদিক না হয়। যার যা প্রাপ্য তাকে তা ঠিকমতো দিবে।'

জীবনের জন্য এ এক মৌলিক নির্দেশ। আর এই নির্দেশ পালনেই আমাদের যত ব্যর্থতা। মিয়া ভাই সাহেব নিশ্চয়ই আজো জানেন, কোরানের এই কবিতার অনুবাদের অনুবাদক কে? এ বই কি এখন পাওয়া যায়! গতকালের (১৩.৭.৮৩) সাক্ষাতে তাঁকে প্রশ্নটি করেছিলাম। আমার প্রশ্নে মিয়া ভাই খুশি হলেন। বললেন, 'মীর ফজলে আলী অনুবাদ করেছিলেন। কেবল সুরা আর রহমান নয়। আরো বেশ কিছু সুরা। তাই নিয়ে বই বার করেছিলেন। নাম 'কোরানকণিকা'। বইখানি এখন আবার ছাপা হয়েছে। এসলামী বইয়ের দোকানে তুমি পাবে। আমারও বোধ হয় আছে একখানা। কোথায় আছে ঠিক নেই। পেলে তোমাকে আমি দিয়ে দেবো।'

বইখানাকে খোঁজ করে দেখতে হবে, পাই কিনা। বইখানি আবার আমার পড়তে ইচ্ছা হচ্ছে।

বরিশাল শহর থেকে আট মাইল পশ্চিমে রহমতপুর। রহমতপুরে আমার বড় ভাই

সাবরেজিস্ট্রার ছিলেন। ১৯৩৪–৩৫ সালের কথা। জমিদার বাড়ির কাছে হাই স্কুল। বেশির ভাগ ছেলেই হিন্দু। মুসলমান কম। হেডমাস্টার উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। দীর্ঘদেহী, গৌরবর্ণ পুরুষ ছিলেন। সেকালের হেডমাস্টাররা সবাই প্রায় বড় ছিলেন। আজকাল তেমন বড় হেডমাস্টার খুব পাওয়া যায় না।

কিন্তু রহমতপুর স্কুলকে আমার যে কারণে স্মরণ হয় তার একটি: যে বাড়িটিতে আমরা থাকতাম সেই বাড়িটির কারণে। আর দ্বিতীয়টি আমার ক্লাসের বন্ধু কানাইয়ের কারণে। গ্রামের মধ্যে আমাদের সেই বাড়িটি, অর্থাৎ বড় ভাই–এর অফিস–কাম–বাসা বাড়িটি ছিলো সুন্দব দোতলা দালান। সেকালে এমন বড় দোতলা দালান হিন্দু পাড়া ব্যতীত কোনো মুসলমান পাড়া বা বাড়িতে ছিলো না। কিন্তু এই বাড়িটি ছিলো বরিশালের ওয়াহাব খান সাহেবের বাবার। ওয়াহাব খান ববিশালেব উকিল ছিলেন। আরো পরবর্তীকালে তিনি হক সাহেবের দলের নেতা ছিলেন এবং ১৯৫৬–৫৮ সালে পাকিস্তান গণপবিষদের স্পিকার হযেছিলেন। তাঁদের বাড়িটি, আমি যেকালেব কথা বলছি, সেকালে প্রায পোড়ো বাড়ি হয়েছিলো। কারণ এ রকম কথা শুনেছিলাম যে, পারিবারিক কোনো বিবাদের কারণে ওয়াহাব সাহেবদের কোনো নিকটজন এই বাড়িতে নিহত হযেছিলেন। সামনে বাঁধানো ঘাটের বড় পুকুর। পেছনে আম–সুপারির বড় বাগান। পেছনে আর একটি বাঁধানো ঘাটেব পুকুর। মেযেদের জন্য। চারদিকে দেয়ালঘেরা। মোটকথা, জমিদারের এক বাগান বাড়ি–প্রায। বাড়িব সামনে পাকা দোতলা মসজিদ।

কিন্তু মারাত্মক ঐ ঘটনার পর থেকে বাড়িটি খালি পড়েছিলো। ওয়াহাব খান সাহেবেব পবিবার–পবিজন গ্রাম ছেড়ে ৭/৮ মাইল দূরে বরিশাল শহরে স্থায়ীভাবে উঠে গেলেন। পরে সরকারের তরফ থেকে বাড়িটিতে রেজিস্ট্রেশন অফিস বসানো হলো। দোতলা দালানের নিচতলাতে অফিস। ওপবেব তলাতে সাবরেজিস্ট্রারের বাসা। এ বাড়িটা কেবল পোড়ো এবং ভূতুড়ে ছিলো না। সত্যি এতে ভূত ছিলো। কোনো সাবরেজিস্ট্রার এখানে বদলি হযে আসতে চাইতেন না। এলেও বেশিদিন থাকতেন না। আমাব বড় ভাই ধার্মিক পবহেজগাব মানুষ। ভূতে বিশ্বাস কবেন না। বাড়িব বদনাম সত্ত্বেও তিনি আগ্রহ কবে বদলি হয়ে এ বাড়িতে এসেছিলেন। তিনি এসে ভূত তাড়িয়েছিলেন।

একদিন রাতে, দোতলাতে আমি এবং আমাব বোন ঘুমাতাম যে ঘরে এবং যে ঘরের পাশে বড় ভাই থাকতেন, সেই ঘরের সামনে বারান্দায় একটি ভূতকে চক্রবন্দী করা হয়েছিলো। চকের রেখা দিয়ে, ভূত আমাদের পড়শি যে যুবকটির ওপর ভর করেছিলো, সেই যুবকটির চারদিকে মন্ত্রপূত খড়ির রেখার চক্র কেটে তাকে আটক করে এক জবরদস্ত দরবেশ তাকে জেরা করছিলো। জেরায় সে নানা অদ্ভুত কথা বলেছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দরবেশের দাবড়ানিতে তাকে কথা দিতে হয়েছিলো যে, সে আমাদেব এই বাড়ির চারপাশে আর থাকবে না। তার যাওয়ার চিহ্ন হিসেবে দক্ষিণ পাশের আমগাছের একটা ডাল সে ভেঙে দিয়ে যাবে। সেদিন এই পুরো অনুষ্ঠানটির পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে কিশোর মনে যতো না ভয় বা বিশ্বাস জন্মেছিলো, তার চাইতে বেশি কৌতুক আর কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছিল।

কিন্তু রহমতপুরকে মনে রাখার বা মনে পড়ার এটাই বড় কারণ নয়। রহমতপুরের হিন্দু একটি পরিবারের এক পুত্র-শোকাতুরা মা, যে আমার ধর্মভক্ত বড় ভাইকে একেবারে সন্তানের মতো গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই পবিবারের আম-তেঁতুলের আচারে আমার এবং আমার সহপাঠিনী মেজ বোনের যে অবাধ অধিকার ছিলো, স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসা-ভরা সেই স্মৃতি আমাকে রহমতপুবকে ভুলতে দেয় না।

এবং আমাকে ভুলতে দেয় না আমার অন্তবঙ্গ কিশোর বন্ধু কানাই। এক কিশোরের আর এক কিশোর বন্ধু। কানাইয়ের পুরো নাম ছিলো ফণীভূষণ কাঞ্জিলাল। কানাইদের হিন্দুপাড়াটি ছিলো আমাদের রেজিস্ট্রি অফিসের বাসার মুসলমান পাড়ার একেবারে পার্শ্ববর্তী। কিন্তু কানাই সম্পর্কে আমার স্মৃতিব মধ্যে একটি বেদনার ভাব আছে। কানাই যখন স্কুলে আসত তখন ওর কাছে ওদের গবিব মধ্যবিত্ত পরিবাবের দুঃখেব কাহিনী শুনতাম। কিন্তু কেবল দুঃখেব নয়, গর্বেবও। কানাই গর্ব করে বলত, 'জানিস আজ আমাব 'ডেটিনিউ' দাদাব কাছ থেকে চিঠি পেযেছি।' 'ডেটিনিউ', 'রাজবন্দী', 'ইন্টাবন্ড্','অন্তরীণাবদ্ধ' রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ এই শব্দগুলো সেই কিশোর বযসে আমি কানাইয়েব কাছ থেকেই শুনেছিলাম। কানাইয়ের এক ভাই বৃটিশ সরকার দ্বারা কোথাও 'ইন্টারন্ড' বা রাজনৈতিকভাবে 'অন্তরীণবন্দী' ছিলো। কানাইযের কাছ থেকে একথা শুনে আমার দুঃখ হতো। কানাইযের পবিবারটিকে আব পাঁচটি পরিবাব থেকে ভিন্ন মনে হতো। সেদিনও আমি জানি নি, আজো জানিনে কানাইযের দাদাব বয়স কত ছিলো, কোন্ দলের সে কর্মী ছিলো এবং কবে সে মুক্তি পেয়েছিলো। কিন্তু সেই নিষিদ্ধ রাজনীতির রোমান্টিক একটি আকর্ষণ যে আমার সেই কিশোব বয়সেব জীবনেই অনুপ্রবেশ করেছিলো, সে কথাটির উল্লেখ করতে হয।

আমি ক্লাস সিক্সের পরেই রহমতপুর থেকে চলে আসি। কাবণ আমার বড় ভাই তার পরেই রহমতপুর থেকে বদলি হয়ে গিয়েছিলেন দক্ষিণ বরিশালেব গলাচিপাতে।

কানাইযের মা আমাকে কোনো দিন সঙ্কোচ করেন নি। মুসলমান বলে পর মনে করেন নি। ছেলের বন্ধু। ছেলে সাথে কবে নিয়ে গেলেই ঘরে তুলে পুজোর নাড়ু, মুড়কি, মোয়া বার করে দিয়েছেন। আমার কোনো সঙ্কোচ, আপত্তি মানেন নি। আমাকে খেতে হযেছে।

জীবনেব স্রোতে কানাই কোথায় ভেসে গেছে, তা আমি জানিনে। একদিন যে হিন্দু পাড়াগুলো সাজানোগোছানো ছোট ছোট শহবের মতো ছিলো, আজ সেগুলো পোড়ামাটির ভিটে। ঘরবাড়ি সব উৎসাদিত। ইট-কাঠ-টিনের চিহ্নমাত্র নেই। কোনোদিন যে এমন পাড়া সুন্দর লোকালয় ছিলো, তা বোঝাও সহজ নয়।

আসলে মানুষের জীবনে, সামাজিক রাজনৈতিক আলোড়নে এক একটা লোকবসতি যে একেবারে নিশ্চিহ্ন হযে যেতে পারে, সে কথা আমি আমার কিশোরকালের পরিচিত হিন্দু বন্ধু এবং পরিচিতজনদের বাসের জায়গাগুলো স্মৃতির টানে আবার দেখতে না গেলে এত মর্মান্তিকভাবে বুঝতেই পারতাম না।

১৪.৭.১৯৮৩

আমার মিয়া ভাই

'৮৩ সালের জুলাই মাস। তখনো আমার বড় ভাই, যাঁকে আমি 'মিয়া ভাই' বলে সম্বোধন করতাম, তিনি বেঁচে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের রোজনামচা হিসেবে নিচের লেখাটি তুলে দিচ্ছি।

গুলশান বড় ভাগ্নের বাড়ি থেকে বনানী। মাইলখানেক পথ। ছোট ছেলে তিতুকে সাথে করে মিযাভাই সাহেবের বনানীর বাড়িটিতে এলাম ঈদের আগের দিন : ১১ জুলাই, '৮৩। মিয়া ভাই সাহেবের দেখা পাবো কি পাবো না, এই এক চিন্তা ছিলো। আজকাল প্রায়ই তিনি তবলিগে যান। তাঁর ভাষায় 'জামাতের দাওয়াতে' যেতে হয়। ৪০ দিন ৪৫ দিন বাসার বাইবে থাকেন। মসজিদে মসজিদে। সঙ্গে দলের আবো মুসল্লি, মোযাল্লাম থাকেন। খাবারের চিন্তা করেন না। যে যেখানে যা দেয়, তাই খান। সাধারণ কিছু জামাকাপড় সাথে রাখেন। আর কিছু নয়। সবাব সঙ্গে নরম হয়ে কথা বলেন। এই তবলিগের মসজিদ আছে কাকরাইলে। বছরে একবার টঙ্গীতে আন্তর্জাতিক জামাত হয়। লক্ষ লক্ষ লোক তাতে জমায়েত হয়। সুশৃঙ্খলভাবে তাদের খাওয়া-দাওয়া, ধোয়া-মোছার কাজ পরিচালিত হয়। বড় ভাবী আজ আর নেই। দু'বছর আগে তিনি মারা যান। কিন্তু তিনি থাকতেও মিয়াভাই এভাবে তবলিগে বাব হযে যেতেন। আমাদেব 'ধর্মেব পুনরুত্থান' জাতীয় একটা ব্যাপার চলছে। জাতীয় আন্তর্জাতিক নানা শক্তি এতে যোগান দিচ্ছে। আমার বড় ভাই সরল মানুষ। ধর্মপ্রাণ তো বটেই। ধর্মেব আচার-আচরণ সেই তাঁর শৈশব জীবন থেকেই পালন কবে এসেছেন। যুবক বয়স থেকে মুখে দাড়ি রেখেছেন। সেও ধর্মীয় নিয়ম বলেই। কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত ব্যবহাবে, বিশেষ করে ছোট ভাই আমার সঙ্গে তাঁর বিনয়নম্র ব্যবহার আমাকে বিস্মিত করে দিযেছে। আমাব অভিভাবক হিসেবে ছোটকালে তম্বি কবেছেন। পড়াশোনায় অবহেলা দেখলে দণ্ড দিযেছেন। এমন কি বড় হয়ে কলেজে পড়ার সময় থেকে আমার যখন কিছুটা সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন ও ঘটনাতে জড়িয়ে পড়াব ব্যাপাব ঘটে, তখনো তিনি আমার ওপর রাগ করেছেন, কড়া নসিহত করেছেন। কিন্তু সবসময়ই স্নেহ বোধ করেছেন। দীর্ঘদিন যখন কারাগারে ছিলাম তখন দু'এক সময়ে কর্তৃপক্ষেব অনুমতি নিয়ে জেলখানায় গিয়ে আমাকে দেখে এসেছেন। কিন্তু সাম্প্রতিককালে তাঁর এই তবলিগের দিকটি নজবে পড়েছে। এখন আর আমার সঙ্গে কখনো রাগ করে কথা বলেন না। এখনো নসিহত করেন। কিন্তু সে এক মিশনারি বা ধর্মপ্রচারকারীর বিনয়নম্র মনোভাব থেকে। আজো যখন দেখা হলো এবং জানলেন, রোজা রাখি নি, তখন বললেন রোজা রাখতে পার নি বুঝি। কিন্তু নামাজটা আদায় করো। তুমি তো কত জান। কিন্তু একথা তো মানবে যে, দুনিয়ার শেষ থাকলেও আখেরাতের শেষ নেই। সেই আখেরাতে আমাদের সকলেরই তো জবাব দিতে হবে।

আজ আমি মিয়াভাই সাহেবের সঙ্গে একটা উদ্দেশ্য নিয়েই দেখা করতে এসেছি। তাঁর বয়স হয়েছে। এখন তিনি বৃদ্ধ। অবশ্য এই বয়সেও তিনি যেরূপ চলাচলতি কবেন, তাতে

আমাদের অবাক হতে হয়। হাঁটতে পারলে রিকশা নেবেন না। দূরের পথে ভিড়ের মধ্যেও বাসে যাবেন। গ্রামের সঙ্গে আমাদের যেখানে নিশ্ছিদ্র বিচ্ছেদ ঘটেছে, সেখানে তিনি এখনো গ্রামের বাড়িতে যান। নিজেদের বাড়িতে সকল জ্ঞাতি ভাই কিংবা ভাইযের ছেলেদের সাংসারিক অবস্থা খারাপ। যে-বাড়িতে এককালে উঠোনে ধানের স্তূপ জমে উঠত, সেখানে অনেক ঘরেরই রোজকার খাবার জোটে না। যারা একটু লেখাপড়া শিখেছি তারা তাদেব ছেলেমেয়েসহ প্রবাসী হযেছি, শহববাসী হয়েছি। কিন্তু মিযাভাই ব্যতিক্রম। তিনি গ্রামে যান। বাড়িতে নিজের আগ্রহে বাবা-মার কবর দু'টিকে বাঁধাই করেছেন। নিজে নানাভাবে টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করে টিনের মসজিদখানিকে পাকা দালানে পরিণত কবেছেন। বাড়ির দরজাতে একটি মাদ্রাসা তৈরি করেছেন। তার জন্য পাকা দালানও উঠিযেছেন। একবাব হজ কবে এসেছেন। গ্রামে সকলে চেনে। 'ডেপুটি সাহেব' নামেই তিনি পরিচিতি। এই মাদ্রাসার এ্যফিলিযেশন, তার জন্য অর্থ সাহায্য ইত্যাদি সংগ্রহে সর্বক্ষণই ব্যস্ত থাকেন। এই ব্যস্ততার কাবণেই মনে অপব কোনো চিন্তা প্রবেশ করতে পাবে না। তাই বয়সের তুলনাতে তিনি ভাল আছেন এবং একথা ভাবতে আমার বেশ ভালো লাগে।

তিনি যখন ধর্মের কথা তুলে আমাকে নসিহত কবেন তখন আজো আমি নীববে নতমস্তক হয়ে থাকি। তিনি মুরব্বি মানুষ। তাঁর সঙ্গে তর্ক চলে না। তা ছাড়া ধর্ম নিয়ে আদপেই কোনো তর্ক চলে না। আজো যখন তিনি আমাব মঙ্গলেব জন্য নামাজ-রোজা পালনের কথা বললেন, তখনো আমি স্মিতমুখে চুপ কবে রইলাম। তারপরে বললাম, মিয়া ভাই, আপনার এখন বয়স কত?

আমাব প্রশ্নটিতে তিনি একটু চকিত হলেন। হয়ত বুঝলেন, আমি কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে চাচ্ছি। তাই হাসিমুখে বললেন, তা ৭৯ চলছে...

তাঁব বযস হয়েছে জানতাম। কিন্তু তিনি যে ৭৯ বছরেব মানুষ এটি আমি কোনোদিন ভাবতে পারি নি। এখনো তাঁর শরীরের ঋজুতা সে কথা বিশ্বাসে আনতে দিতে চায় না। বললেন, ১৯০৫-এ জন্ম। তারপর হিসেব করে দেখ। ১৯২৩-এ ম্যাট্রিক পাস করলাম। বি.এম স্কুল থেকে। ১৯২৫-এ আই.এ পাস করলাম আর ১৯২৭-এ বি.এ পাস কবে ঢাকা এলাম এম.এ পড়তে।

আমি বললাম আপনি ইংরেজিতে এম.এ নিলেন। এত সুন্দর আপনার ইংরেজির হাত। কিন্তু শেষ করলেন না কেন?

নতুন করে জানা নয়। যথার্থই আমি এসব কথা জানতাম না। আজ দেখছি, এ তথ্যগুলোর একটা তাৎপর্য আছে। আমার ভাইয়ের লেখাপড়া তথা সেদিনকার হাই স্কুলে পড়া মানে একটি মুসলিম গরিব কৃষক পরিবারে প্রথমবারের মতো আধুনিককালের শিক্ষার প্রবেশ ঘটা। সেই পরিবারের এই ছেলেটি কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক পাস করেছে। আই.এ এবং বি.এ পাস করে ঢাকা এসেছে এম.এ পড়তে, এটার মধ্যে একটা সামাজিক রূপান্তরের আভাস আছে। শুধু একজন ব্যক্তির জীবনযাপন নয়। যুগ পরিবর্তিত হচ্ছিল, একথা সত্য। তাই এই শতকের গোড়ার দিক থেকেই মধ্যবিত্ত এবং গরিব ঘরের কৃষকের ছেলেও শুধু

মক্তব নয়, হাই স্কুল আর কলেজে আসছিলো, উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য।

মিয়াভাই সাহেব তাঁর এই পাসের কথায় দুঃখ করে বললেন, কলেজে তো আমাকে সকল প্রফেসররা অসম্ভব স্নেহ করতেন। সলিল চৌধুরী, তিনি পরীক্ষার পরে আমার খাতা দেখে বলেছিলেন, 'ইওরস ইজ দি বেস্ট।' তবু তো রেজাল্ট ভালো হলো না। এক নম্বরের জন্য সেকেন্ড ক্লাস পেলাম না। অথচ প্রফেসরদের কাছে শুনেছিলাম আমার খাতায় 'হাই সেকেন্ড ক্লাস' উঠেছে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, এর কারণ কি?

মিয়াভাই বললেন, কারণ, মুসলমান ছেলে ভালো কেন করবে?

মিয়াভাইয়ের এমন অভিযোগের কথাতেও বিস্ময়বোধ ছিলো। আমি বললাম, কিন্তু আপনার গুণের কারণে হিন্দু শিক্ষকরা তো আপনাকে সন্তানের মতো স্নেহ করতেন।

একথা তিনি স্বীকাব করলেন। মনে করে বললেন, বি.এম স্কুলের হেডমাস্টার অমৃতলাল দাশগুপ্ত, নিজের ছেলের চেয়েও বেশি স্নেহ করতেন আমাকে।

ধর্মপরায়ণ মিয়াভাইয়ের এই আর একটি দিক। একদিকে যেমন হিন্দুরা মুসলমানদের ছোট ভেবেছে, তাদের হেয় জ্ঞান করেছে, এ অভিযোগ তিনি বিভিন্ন সময়েই করেছেন এবং এর তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন, তেমনি এরূপ ধর্মপরায়ণ, আচার-আচরণ লেবাসে মুসল্লি মুসলমান একজন তরুণের যে হিন্দু অভিভাবক থাকতে পারে তা কল্পনাই করা যায় না। অথচ আমার ছোটকালের রহমতপুরের সে ছবি তো আমি আজো ভুলতে পারি নি।

১৯৩৩-এর দিকে মিয়াভাই বদলি হয়ে এলেন রহমতপুর সাবরেজিস্ট্রি অফিসে সাবরেজিস্ট্রার হিসেবে, নাজিরপুর থেকে।

রহমতপুর ছিলো একটি হিন্দু-প্রধান এলাকা। রহমতপুব বাজার বসত সে এলাকার জমিদার বাড়ির দরজায়। তার কাছের স্কুলে আমি এবং আমার বড় বোন এক সঙ্গে পড়তাম। তখন আমার ক্লাস ফাইভ এবং সিক্স। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৫ সন পর্যন্ত বোধ হয় বড় ভাই ছিলেন রহমতপুরে।

এই রহমতপুরের জমিদার বাড়ির এক জমিদারের নাম ছিলো বোধ হয় কালু বাবু। কালু বাবুর স্ত্রী আমার বড় ভাইকে নিজেব ছেলে বলে ডাকতেন। এই বাড়িতে আমাদের যাতায়াত কেবল যে অবাধ ছিলো, তাই নয়। এদের কোনো অনুষ্ঠান আমাদের বাদে হতো না।

এই বাড়ির কথা মনে হলেই আমার চোখে যে ছবিটি ভেসে ওঠে সে হচ্ছে : কালু বাবুর বাড়িতে মিয়াভাই বেড়াতে গেছেন। সন্ধ্যায় পুজার ঘণ্টা বাজছে এক ঘরে। এদিকে মগরেবের নামাজেরও সময় হয়েছে। মিয়া ভাই তাঁর 'মাকে' বললেন, মা একখানা ধোয়া কাপড় দিন। আমি পাশের ঘবে নামাজটা আদায় করে নিই। মা স্নেহে এবং আগ্রহে ধোয়া কাপড় বার করে দিয়েছেন। তাঁর মুসলমান 'পুত্র' একঘরে মগরেবের নামাজ পড়ছে এবং আর একঘরে সন্ধ্যা আহ্নিকের আয়োজন হচ্ছে। এ এক অনির্বচনীয় দৃশ্য। আমার কিশোর মনকে ঘটনাটির এই সহনশীলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির দিকটি সেদিনও অভিভূত

করেছিলো।

কিন্তু একথা ঠিক যে ত্রিশের এবং চল্লিশের দশকে সাম্প্রদায়িক দ্বেষই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এমন প্রীতির সম্পর্ক বিরল হয়ে আসছিলো। কিন্তু মিয়াভাই সাহেব একদিকে যেমন কোনোদিন হিন্দু সমাজের যারা তাকে স্নেহপ্রীতি দিয়েছেন তাদের কথা ভুলতে পারেন নি, তেমনি সমাজে সাধারণভাবে যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব ছিলো এবং সাধারণভাবে হিন্দু-প্রধানরা যে মুসলমান সমাজ, এমন কি তার বিকাশমান মধ্যবিত্ত শিক্ষিত অংশকেও বৈরী দৃষ্টিতে দেখতেন, সেই অনুভবটি নিজের মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন নি।

তাই নিজের বি.এ পরীক্ষার ফলাফলে এই সাম্প্রদায়িক মনোভাবটি যে কাজ করেছিলো সে সম্পর্কে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই। ব্যাপারটি খুবই সম্ভব বলে আমারও মনে হলো। যখন বললাম, কিন্তু হিন্দু অধ্যাপকরা তো আপনাকে ভালো ছেলে বলে জানতেন, তখন তিনি বললেন, আমার কলেজেব প্রফেসববা জানলে কি হবে। তখন তো খাতার ওপর পরীক্ষার্থীব নাম লেখা থাকতো। আব তা থেকেই ধরা যেত কোন্ খাতা হিন্দু--ছাত্রের এবং কোন্ খাতা মুসলমান ছাত্রের। আর এ কারণেই মুসলমান ছাত্রের পক্ষে সেদিন ভাল করা ছিলো প্রায় অসম্ভব।

সেকালের কথা ভালো করে আমি জানিনে। কিন্তু মিযাভাইয়ের এ ব্যাখ্যায় যুক্তি আছে।

সে যা হোক। তবু তিনি ঢাকায় পড়তে এসেছিলেন এম.এ, ইংরেজিতে। ইংরেজিতে তাঁর দক্ষতা ছিলো এবং এখনো আছে। এখনো তিনি যেমন দ্রুতগতিতে সুন্দর শব্দরাজি দিযে ইংরেজিতে নিজের মনের ভাব, বিশেষ করে লিখিতভাবে প্রকাশ করেন, তাতে আমার মনে বিস্ময় আর ঈর্ষার সঞ্চার হয়। আহা, আমি যদি এমন করে ইংরেজিতে লিখতে পারতাম!

ঢাকায় এসে তিনি ইংরেজির অধ্যাপক এস এন রাযের স্নেহ পেয়েছিলেন। ডঃ হাসানও তাঁকে প্রশংসা করেছেন। কিন্তু গরিব কৃষকের ঘর থেকে একেবারে নিজের উদ্যোগে যে ছেলেটি স্কুল থেকে কলেজ, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এসেছিলো সে যখন ১৯২৮ কিংবা ২৯-এর দিকে একটি চাকরির সুযোগ পেল তখন আর সে চাকরিকে গ্রহণ না করার দুঃসাহস দেখাতে পারল না। কারণ তার ওপর নির্ভর করছে গবিব বাবা, মা, ছোট ভাই আর বোনেরা।

আমি একটু সমাজতাত্ত্বিক ভাব থেকে জিগ্যেস করলাম, কিন্তু এম.এ পড়ার জন্য কলকাতা না গিয়ে ঢাকা কেন এলেন? বরিশাল থেকে তো কলকাতা যেতে পারতেন।

মিয়াভাই বললেন, ১৯২১ সনে ঢাকা ইউনিভার্সিটি তৈরি হলো। তারপর থেকে পূর্ববঙ্গের আমাদের কাছে, বিশেষ করে অর্থের দিক থেকে যারা কম সচ্ছল, তাদের ঢাকা আসার দিকেই বেশি ঝোঁক ছিলো। আমিও সে কারণেই ঢাকাতে পড়তে এসেছিলাম।

মিয়াভাইয়ের কাছ থেকে আরো অনেক কথা জানার আছে। কিন্তু এদিনের সাক্ষাতে অন্য কথা আর তুললাম না। মিয়াভাই সাহেবের কাছে আমরা যারা ছোট ভাইবোন, তাদের ঋণের শেষ নেই। একথা সচেতনভাবে আমি সবসময়ই মনে করেছি। এখন তাঁর নিজেরই বৃহৎ সংসার। তাঁর সন্তানরাও জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নানা পথঘাট ঘুরে আমিও সংসাব

জীবনে থিতু হয়ে বসেছি। আমারও ছেলেমেয়ে আছে। সংসারের দায়দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্ব পালনের আর্থিক অক্ষমতা জীবনের সমস্যাকে রোজকে রোজ কঠিনতর করে তুলছে। মিয়াভাই সাহেবের ঋণের কোনো পরিশোধ হতে পারে না। তিনি সেদিন না পড়ালে আমার বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এসে পৌছাও সম্ভব হতো না। কিন্তু এ ঋণের কথা মুখে প্রকাশ করা যায় না। শব্দের কৃত্রিমতায় তা লঘু হয়ে দেখা দেয়। আজো তার কাছে কৃতজ্ঞতার কথা মুখে বললাম না। কিন্তু উঠে আসার সময়ে তিনি যেন মনে কিসের ভার অনুভব করে বললেন, তোমাদের কারুর বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ জানেন, আমি সারা জীবন আমাব দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি।...

আমি বললাম, আমাদের বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগ থাকা যে কত স্বাভাবিক তা আমি জানি। তবু যে আপনি কোনো অভিযোগ রাখছেন না, সেও আপনার গুণ, আমাদের নয়।...

মিয়াভাই সাহেবকে সালাম করে ছোট ছেলেকে সাথে করে চলে এলাম।

তাঁব যে এদিন দেখা পেযেছিলাম, আর অতীত নিযে একটু আলাপ করতে পেবেছিলাম, তাতে নিজের মনটা আনন্দে বেশ ভরে উঠেছিলো

গ্রামে নির্বাসন : পিতামাতার কাছে প্রত্যাবর্তন

সে এক পাগলামিই বটে। '৪৬ সনে এম.এ পাস শেষ হলো। সেকালের ঢাকা ইউনিভার্সিটি আর একালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আকাশ–পাতাল পৃথক। আমার জীবনের এ এক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। প্রাচীনকালের জ্ঞানের আশ্রমের কথা শুনেছি। গুরুগৃহে, গুরুর সাহচর্যে, নৈকট্যে শিষ্যেব বাস। শিষ্যেব সাধনা। চল্লিশের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমার জীবনে প্রায় তাই ছিলো। ঢাকা ইউনিভার্সিটিকে আমি আমাব নিজের বাড়িতে রূপান্তরিত করে ফেলেছিলাম। গুরুদের নৈকট্য পেয়েছি। তাঁদের স্নেহ এবং সাহচর্যে ধন্য হয়েছি।

দর্শনের ছাত্র। দর্শন বিভাগে সর্বমোট ৫টি কিংবা ৬টি ছাত্রছাত্রী। ছাত্রী বোধ হয় অনার্সে ছিলো দু'টি। একটিব নাম ছিলো ঊষা পৈত। ওদেব বাসা ছিলো পুরোন ঢাকার পাতলা খান গলিতে। এখানেই বাসা ছিলো সেদিনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অনার্স এবং এম.এ–ব অন্যতম জনপ্রিয় কমিউনিস্ট ছাত্রকর্মী রবি গুহেব। রবিগুহ আর নাজমুল করিম, এঁরা আমার বয়োজ্যেষ্ঠ। ইউনিভার্সিটির ভাষায় 'সিনিয়ব'। কিন্তু আমাদের এই তিনজনের ক্ষেত্রে কোনো বয়োজ্যেষ্ঠতা বা বয়োকনিষ্ঠতার ব্যাপার ছিলো না। আমরা পরস্পরের নিকট ছিলাম আত্মীয়সম। রবিগুহকে আমি নাম ধরে 'আপনি' বলে সম্বোধন করতাম। কিন্তু সে 'আপনি'তে সমীহের চাইতে প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিলো অধিক। রবি গুহও আমাকে 'তুমি'–র বদলে 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন। কিন্তু সে 'আপনি' স্নেহ মমতায় 'তুমি'রও অধিক ছিলো। রবি ইউনিভার্সিটিব হলে থাকতেন না। থাকতেন বাসায়। ঐ পাতলা খান লেনেই বোধ হয়। তাঁর দিদি এবং ভগ্নিপতিব সঙ্গে। তাঁদের সে বাসাও আমার নিজের বাসায় পরিণত হয়েছিলো। তাঁদের কোনো পারিবারিক আতিথেয়তা ও অনুষ্ঠান আমাকে বাদ দিয়ে হতে পারতো না।

অনার্স এবং এম.এ.-তে যে ভালো ফল হলো, এতে আমার চাইতে নাজমুল করিম আর রবি গুহের আনন্দই অধিক। আমি যতো বলি, স্যাররা খাতির করে নম্বর দিয়েছেন। আমি এর যোগ্য নই। তাঁরা ততো বলেন, এরকম খাতির স্যাররা আমাদের কেন করেন না?

অনার্স আর এম.এ-তে ভাইভা পরীক্ষা শেষ করে বেরিয়ে আসতে মূল পরীক্ষক প্রখ্যাত দার্শনিক হরিদাস ভট্টাচার্য কাঁধে স্নেহের হাত রেখে বললেন, ভালো করেছ। এখন কি করবে? আমি সবিনয়ে হেসে বললাম, 'মাস্টারি করা ছাড়া আর কি করব স্যার?' তিনি তখন বিভাগ থেকে অবসব নিয়ে কলকাতা চলে গেছেন। দর্শন বিভাগের হেড তখন ডঃ বিনয় রায়। বিনয় রায় ইংবেজি বিভাগেব তখনকার হেড এস.এন. বায়ের ছোট ভাই ছিলেন। উভযেরই ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সহাস্য স্নেহপূর্ণ ব্যবহার ইউনিভার্সিটির সর্বমহলে পবিচিত ছিলো।

চাকরিব দরখাস্তের ভিত্তিতে নয। বিনয়বাবু বললেন, ফজলুল কবিম, কাল থেকে তুমি ক্লাস নিতে শুরু কবো।

তখনো ছাত্রদের সংখ্যা কম। ক্লাস নিতে গেলে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষক হিসেবে গণ্য করার চাইতে তাদের সঙ্গেই পাঠরত আর একটি ছাত্র বলেই বিবেচনা করেছে বেশি। ভাবতে আজ মজা লাগছে।

ভালোই লাগছিলো এই মাস্টারি। '৪৭--এর শেষ আর '৪৮-এর প্রথমে। কিন্তু দেশে সামাজিক, রাজনৈতিক সঙ্কট বৃদ্ধি পাচ্ছিল। পাকিস্তান হয়ে গেছে। ভারত বিভক্ত হয়েছে। আগে যা সম্প্রদাযে সম্প্রদাযে সীমাবদ্ধ দাঙ্গা হিসেবে সংঘটিত হযেছে, তা এখন ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের রূপ গ্রহণ করেছে। '৪৬-এর ১৬ আগস্ট হলো 'ক্যালকাটা কিলিং'। তার প্রতিক্রিয়ায নোয়াখালি, বিহারের হত্যাকাণ্ড। '৪৭-এর বিভাগের কালে পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের ব্যাপক হত্যাকাণ্ড। ফলে সাধারণ মানুষেব অসহায়তা, নিবাপত্তাহীনতা। লক্ষ লক্ষ নরনারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার এপাব থেকে ওপার গমন।

এব আঘাত ঢাকা ইউনিভার্সিটিতেও এসে লাগল। দাঙ্গার আকারে নয়। হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত প্রখ্যাত শিক্ষকদের ঢাকা থেকে কলকাতা ও ভাবতের অন্যান্য স্থানে গমন। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে প্রযোজনীয় মানসম্পন্ন শিক্ষকদেব তখন অভাব। একটা দায়িত্ববোধ থেকেই দর্শন বিভাগে শিক্ষকতা শুরু করেছিলাম। কিন্তু চাকরির বাইরে রাজনৈতিক একটা দায়িত্ব বহন এবং আদেশ পালনেরও একটা ব্যাপার ইতিমধ্যে ঘটে গেছে। কমিউনিস্ট সংগঠনের আমি একজন অনুগত কর্মী। সে সংগঠনেও সামাজিকভাবে দেশত্যাগের আঘাতে কর্মীর অভাবে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। সংগঠন তাই বলল, তোমার অধ্যাপনার চাকরি ছাড়তে হবে। তার প্রধান কারণ, গুপ্ত পুলিশের দৃষ্টির খরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কর্মীশূন্য মাঠে আমি তাদের কাছে পূর্বের মতো আর 'ফেলনা' রইলাম না। আমাকে তারা অন্বেষণ করে বেড়াতে শুরু করল।

পার্টি বলল, তুমি চাকরি ছাড় এবং আত্মগোপন কর। আমি তাই করলাম। কোনো অসুবিধা হলো না সিদ্ধান্ত গ্রহণে। আমার বিভাগের হেড বিনয়বাবুকে গিয়ে দরখাস্ত দিয়ে

বললাম, স্যার, আমি আর চাকরি করব না।

তিনি প্রথমে অবাক হলেন। ব্যাপারটার আকস্মিকতায়। বিশ্বাস করতে চাইলেন না। রাগ করে বললেন, তোমার পদত্যাগপত্র আমি ছিঁড়ে ফেলে দেব।

আমি বললাম, স্যার, আপনি তো আমাকে নিজের সন্তানের মতো জানেন। সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। একে তো আর বদল করা যাবে না।

স্যার আমাকে চার বছব ধরে দেখে আসছেন। তাঁর বাসায় আমার যাতায়াত ছিলো অবাধ। আমাকে তিনি আবেগে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি তাঁর স্নেহ-সম্ভাষণ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আত্মগোপনে চলে গেলাম।

চাকরি থেকে পদত্যাগ করাব কথা শুধু বিভাগে আলোচ্য বিষয় হলো না। সরকারি মহলেও আলোচিত হলো। আমাব সেই '৪৮ সনের চাকরির নথি খুললে এখনো তাব মধ্যে বেজিস্ট্রারের কাছে লেখা স্বরাষ্ট্র তথা পুলিশ বিভাগের কর্তাদের কৈফিয়ত তলবমূলক বার্তাব সাক্ষাৎ পাওয়া যায। কেন ফজলুল করিম সরদাব চাকরি ছেড়েছে এবং তার আস্তানা, অধিষ্ঠান, 'হোয়েয়ারঅ্যাবাউটস্' কোথায়, তা সরকারকে অবগত করা হোক।

আসলে আমার আস্তানা-অধিষ্ঠানের কোনো নিশ্চয়তা ছিলো না। দুর্বল সংগঠন। আমি পাতলা আর কৃশ দেহের ক্ষুদ্রকায় জীব হলেও আমার নামটা ভাবি ছিলো। সে নামকে ছেঁটে ফেলেও রেহাই পাওয়া দায হযে উঠলো। নাম পাল্টালাম। নামের শরীর থেকে ভারি অংশ 'সরদার'কে বিদায কবলাম। ওজনে হাল্কা হল বটে, তবু নিঃশঙ্ক হওয়া গেল না। শহবে নিরাপদ আশ্রয়ের অভাব। পার্টি দেখল, আমি তাদেব বিদ্যমান অবস্থায় সম্পদের চাইতে বোঝা বেশি। কোথায রাখবে আমাকে।

অবশেষে বলল, ঢাকা জেলার মনোহবদি-চালাকচর এলাকায় কৃষকদের মধ্যে আমাদের কিছু প্রভাব আছে। তুমি সেখানে গিয়ে থাকো। কৃষকদের মধ্যে থাকবে। তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা করবে।

তাই সই। আমাকে কোনো কর্মী-বন্ধু পৌছে দিলেন চালাকচরে। চালাকচরে তখনো আন্দামানের নির্বাসন-ফেরত বিখ্যাত কৃষক নেতা অন্নদা পাল হযতো ছিলেন। এলাকার প্রবাদ পুরুষ। চালাকচর, পীরপুব, শরীফপুর, মনোহরদি, পোরাদিয়া, হাতিবদিয়া, এই নামগুলো এখনো মনে ভেসে উঠছে। কারণ এই গ্রামগুলোতে '৪৮-৪৯ সনে প্রায় এক বছব আমি আত্মগোপন করেছিলাম। পীরপুরের প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক আখতারুজ্জামানের হাসিমুখ চেহারাটি এখনো চোখের সামনে অমলিন। তাঁর এলাকার সম্মানিত শিক্ষক এবং গ্রামীণ নেতা। কমিউনিস্ট সংগঠনের একনিষ্ঠ কর্মী। তিনি আমাকে স্বনামেই জানতেন। কিন্তু তিনি অন্য লোকের কাছে আমাকে ভিন্ন নামে পরিচয় করিয়ে দিতেন। আখতারুজ্জামান হয়তো আজ আর বেঁচে নেই। পীরপুরের পাশেই ছিলো শবীফপুর। শরীফপুর ছিলো প্রধানত পানের বরজ বা পানচাষীদের এলাকা। হরেন সিং, সুরেশ সিং, এরূপ নাম মনে ভেসে উঠছে। তাদের বাড়িঘর ছিলো গ্রামের অন্য, বিশেষ করে মুসলিম-প্রধান এলাকা থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট। ঘরের সঙ্গে ঘর লাগানো। উঁচু দাওয়া। সুন্দর নিকোনো, ধোয়া-মোছা উঠোন। টিনের ঘরই বেশি। প্রত্যেক বাড়ির পাশে পানের বাগান বা বরজ।

বাঁশ আর পাটকাঠি দিয়ে পানের লতার সাড়ি দেওয়া মাচান। কী সুন্দব পরিচ্ছন্নতায় রক্ষণাবেক্ষণ। তাঁরা যেদিন তোলাপান বিক্রির জন্য হাঁটে যেত, সেদিন সকালে পানের বরজে ঢুকে আমিও পানলতা থেকে কচি পান তুলে এনে তাঁদের সাহায্য করতাম।...

এমন আত্মগোপনের জীবনে ঘটনার আধিক্য ছিলো না। তাই ঘটনার কোনো স্মৃতি নেই। তবু এই একটা বছর গ্রামের কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে জীবনযাপনই একটা ঘটনা হিসেবে আমার জীবনে অমোচনীয় এক আনন্দকর স্মৃতির পলি রেখে গেছে। গরিব কৃষকের এলাকা। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে কাজের অভাবে গরিব কৃষক ও ক্ষেতমজুরের অর্ধাহারে-অনাহারে সঙ্কট বৃদ্ধি পেত। কিন্তু এলাকায় কাঁঠাল হতো প্রচুব। প্রত্যেক বাড়িতেই কাঁঠাল গাছ ছিলো। আমি অনেক সময়ে ভাতের বদলে কাঁঠাল খেয়ে দিন কাটিয়েছি। ভাত পেলে ভাতের সঙ্গে কোনো ডাল-তরকারি নয়। একটি শুঁটকি-পুঁটি পাটকাঠির মুখে আগুন ধরিয়ে তাকে পুড়িয়ে ভাতের সঙ্গে মেখে খেয়েছি...

হিন্দু পান কৃষকদের বাড়িতে হিন্দু নাম নিয়ে থেকেছি। আখতারুজ্জামানই নিয়ে গেছেন এলাকাতে। আমাকে অশোক কিংবা আশীষ নাম দিয়ে অন্দবে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। মেয়েরা তাঁদের দূব সম্পর্কীয় দেবর কিংবা মাসতুতো, পিসতুতো ভাই হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

সেই একটি বছরের এমন প্রাপ্ত জীবনকে আমি একটা সৌভাগ্য হিসেবে গ্রহণ কবেছিলাম। সেই কবে শিশু বয়সে আমার অভিভাবক বড় ভাইয়ের কাঁধে চড়ে নিজের গ্রাম ছেড়ে এসেছিলাম। প্রায় পঁচিশ বছব পবে আবার যেন আমার সেই নিজগ্রামে প্রত্যাবর্তন ঘটল, বাবা, মা, চাচা-চাচী, ভাইবোনের কাছে প্রত্যাবর্তন।

সেই জীবনের স্মৃতি এখনো টানে, এই প্রৌঢ় বয়সে। ইচ্ছে হয় আবার ফিরে যাই সেই চালাকচর, পীরপুর, শরীফপুর, পোড়াদিয়া, হাতিরদিয়া আর মনোহরদিতে।...

২৫ ডিসেম্বর ১৯৪৯: চল্লিশের দশকের শেষ

শতকই বলি, আর দশকই বলি, এগুলো প্রচলিত, তবু কৃত্রিম হিসাব। সময়ের হিসাব। সময়ের গতি এবং তার এরূপ শুরু, শেষের হিসাব সবার জীবনে এক নয়। মহাকবি শেক্সপীয়র নাকি বলেছিলেন, প্রেমিকের জন্য সময়ের গতি একরকম, আর ফাঁসির আসামীর জন্য আর এক রকম। প্রেমিকের প্রতীক্ষার মুহূর্ত ঘণ্টাতেও শেষ হয় না। ফাঁসির আসামীর ঘণ্টা মুহূর্তেই শেষ হয়ে যায়।

'চল্লিশের দশকের ঢাকায়' আমার যা একটু বোধ-বুদ্ধির বিকাশ, তার শেষ হয়ে গেল আকস্মিকভাবে ২৫ ডিসেম্বর ১৯৪৯ সনে। '৫০ পর্যন্ত আর আমি অপেক্ষা করতে পারলাম না।

যথার্থই কি ২৫ ডিসেম্বর '৪৯? ২৫ ডিসেম্বর অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। কিন্তু সেটি আমার জীবনেও যে একটি পর্যায়ন্তরের সূচনা ঘটাবে তা সেদিন বুঝি নি।

আসলে তারিখটা ২৫ ছিলো কিনা তা যাচাই করার জন্য আমার বন্ধু, প্রখ্যাত সাংবাদিক,

সাহিত্যিক দৈনিক 'সংবাদ'-এ কর্মরত সন্তোষ গুপ্তের কাছে গেলাম। সন্তোষগুপ্তকে আমি প্রীতির সম্বোধনে শুধু 'সন্তোষ' বলে ডাকি। 'তুমি' বলি। সন্তোষ আমাকে 'আপনি' বলে। সে বয়সের কারণে কিনা জানিনে। কিন্তু সন্তোষের সঙ্গে সেই '৪৯ সনে একদিনের যে পরিচয় ঘটেছিলো, সেটিই আজীবনের পরিচয় হয়ে রয়েছে। কিন্তু আমার কাছে সন্তোষের এক পরিচয় অনন্য এক স্মৃতিধর হিসেবে। কম্প্যুটারের যুগ আসার পূর্ব থেকে সন্তোষের মস্তিষ্ক কম্প্যুটারে পরিণত হয়েছিলো নিশ্চয়ই। স্মৃতি, তথ্য, সংখ্যা আর তারিখের কম্প্যুটার। সে কিছুই বিস্মৃত হয় না। এবং তার স্মৃতির ওপর নির্ভর করেই সে ইতিহাসের মোকাবেলা করতে পারে। তাঁর সে পরিচয় সাম্প্রতিককালেও আমরা পাচ্ছি। সন্তোষের বয়স কত, এটি তাঁকে জিগ্যেস করতে হবে। দেখতে আমার চাইতেও পাতলা-দুবলা। বিরামহীনভাবে সিগাবেট পান করে। আমাব সঙ্গে দেখা হলেই বলি, তোমাকে না সিগারেট খেতে নিষেধ কবেছি। সে তার কাব্যিক চরণ উচ্চারণ কবে বলে, 'আয়ু নয় তো, বায়ু। সিগাবেটের ধূম্রের সঙ্গে সে যদি উড়ে যায়, তো যাক না। তাতে আফসোস কি?

আমি তাঁকে বলি, 'কম্প্যুটার' সন্তোষ। সেদিন খোঁজ করে সাক্ষাৎ কবে বললাম, সন্তোষ, তুমি-আমি সেই '৪৯ সনের কোন্ তারিখে এ্যারেস্ট হয়েছিলাম?

সন্তোষ নিশ্চিন্তে বলে দিল, ২৫ ডিসেম্বর, দুপুরে খাওযার পবে।

: কে কে সেদিন তোমার বাসা থেকে গ্রেফতার হয়েছিলাম?

: আপনি, আমি, আমার মা, বারি সাহেব, রানু চ্যাটার্জি ... আর যেন কে?

: জ্ঞানদা, জ্ঞান চক্রবর্তী কি সেদিন গ্রেফতার হয়েছিলেন?

সন্তোষ বলল : না। জ্ঞানদা বোধ হয় তার আগেই গ্রেপ্তার হযেছিলেন।...

যাক, বোঝা গেল, সন্তোষ সন্দেহের উর্ধ্বে। আমরা গ্রেফতার হয়েছিলাম সন্তোষের বাসা থেকে ২৫ ডিসেম্বর ১৯৪৯ সনে।

ঘটনার স্মৃতি নয়। স্মৃতিব পলি। স্মরণেব কাঠি দিযে তাই নিযে নাড়াচাড়া করছি। আজো এতদিন পরে। পুবো চুয়াল্লিশ বছর পরে। সন্তোষ দিনরাত 'কলাম' লেখা নিযে ব্যস্ত। তার সময় নেই এসব নিয়ে আলাপ করার। গল্প করার। চেপে ধরলে বলে, আর কি হবে বাল্যকালেব বালখিল্য সেসব ব্যাপারকে খুঁচিয়ে তুলে?

একথা রাজনৈতিক বিশ্লেষণে সন্তোষ বলতে পারে। সে বলে, সেকালের আদর্শ, বিশ্বাস-নির্যাতন ভোগ, ত্যাগ সবই ছিলো ভুল।

এজন্য সন্তোষের ওপর আমার কোনো মান-অভিমান নেই। সন্তোষের বর্তমানে 'সব্যসাচীর' কলম এবং 'কলামৃন' আছে। আমার যে ৪৪ বছর আগের স্মৃতির পলি বাদে আর কিছু নেই। আবো পাঁচ বছর যদি বাঁচতে হয়, তবে আমি বাঁচি কি নিয়ে!

তাই বাল্যকালের বালখিল্যতায় আমার আফসোস নয়, রোমাঞ্চ লাগে। এ রোমাঞ্চের কথা অপরকে লিখে বা বলে বোঝানো মুশকিল।

সন্তোষের বাসা। ঢাকার তাঁতিবাজারে। পুরনো একতলা একটি দালানে। ঢাকা কোর্টের পেছনের পশ্চিম দিকের এলাকা। বাসা নয়, তাকে আমরা জানতাম 'ডেন' বলে। নিষিদ্ধ প্রায় গোপন কমিউনিস্ট পার্টির অভিধানের টেকনিক্যাল শব্দ 'ডেন'। শব্দটা

ভয়ঙ্কর। অর্থ : গুহা, গহ্বর ইত্যাদি। শুধু শব্দটা ভয়ঙ্কর নয়। ব্যাপারটাই ভয়ঙ্কর ছিলো। কত যে ভয়ঙ্কর তা নিরীহ সদ্য এম.এ পাস করা, রোমান্টিকতার আবেগে আবিষ্ট, হাতের মোয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের শিক্ষকতার চাকরিতে রিজাইন দেওয়া আমি বুঝতাম না। আসলে আমাদের সে জীবনে 'ভয়' শব্দটার অর্থই আমি বুঝতাম না। রাতের অন্ধকারে নিম্নস্বরে আশ্রয়দাতার বিভিন্ন বাড়িতে আলোচনা বসেছে। দেশের অবস্থা নিয়ে জেলা কমিটির মিটিং বসেছে। 'ডাকাতি'র প্রোগ্রাম নয়। পরিস্থিতি নাজুক। সে বিষযে আলোচনা। ইতিমধ্যে গ্রেফতার হয়ে গেছে অনেক কমরেড। যারা আছি, দায়িত্ব বহন করতে হবে তাদের। জনতার মধ্যে থাকতে হবে। বিবেক-বুদ্ধি মত যা পারি সেটুকুই করতে হবে। বলতে হবে, বর্তমানই শেষ নয়। মৃত্যুর পরেও জীবন থাকে। থাকবে। দেশ থাকবে। ইতিহাস থাকবে। ইতিহাস তৈরি হবে। ইতিহাস আমাদের পক্ষে। সমাজ বদলাবে। বিপ্লব অনিবার্য। বিপ্লব মানুষের জীবনে, সমাজেব জীবনে সংঘটিত হবে।

আমার তো মনে হয় কথাগুলো সাংঘাতিক কোনো খারাপ কথা নয। ভয়ঙ্কব কথা নয। কিন্তু সেদিনের এবং এদিনের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা তাকে তাই মনে করে। কেউ এ বকম কথা ভাবছে, বা বলছে, মনে মনে কিংবা কানে কানে, এমন আভাস পেলেই তাকে 'জননিরাপত্তা' আইনে গ্রেফতার করে 'নিবাপদ' জেলখানাতে আবদ্ধ কবেছে।

কাজেই এমন যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাতে সন্তোষ কিভাবে জড়িত হয়েছিলো, একথাটা আজো আমার জানা হয় নি। আব তা জানাও যাবে না। সন্তোষ আব তা বলবে না।

অথচ যথার্থই কী ভয়ঙ্কর, কী বিপজ্জনক! বিধবা মা। আমরা ডাকতাম 'মাসিমা' বলে। তাঁকে নিযে বাসা করেছে। নিজে চাকরি কবে পূর্ববঙ্গের কারা-প্রধান তথা 'ইনস্‌পেক্টর জেনারেল অব প্রিজন্‌স্'-এর অফিসে। তারই গোপন সহকারী। 'কনফিডেনস্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট'। অফিস ঢাকা জেলেবই ভেতরে। আর তাব তাঁতিবাজারের বাসায় কমিউনিস্ট ডেন! 'বাঘেব ঘরে ঘোগের বাসা'। সেখানে রাতের অন্ধকারে আসেন কমিউনিস্ট নেতা ফণী গুহ, অনিল মুখার্জি, জ্ঞান চক্রবর্তী, আবদুল বারি, রওশন শেখ, মনু মিযা এঁরা। আসেন সংগঠনের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে। রাতের আঁধারে আসেন। দিনেব বেলা থাকতে হলেও অন্ধকারেই থাকেন। আবার আঁধার হলে যার যেখানে যাওয়ার চলে যান সেখানে। সন্তোষের বাসায় ছিলেন কৃষকনেতা অজিত চ্যাটার্জির স্ত্রী বানু চ্যাটার্জিও।

এই 'ডেনে'ব বিষয়ে আব একটু জিগ্যেস করতে সন্তোষ স্বল্পতম দৈর্ঘ্যের দু'একটি বাক্যে বলল, আসলে ডেনটা আরো আগে তুলে দেওয়া উচিত ছিলো। আমার বাসায় ঢোকার মুখেই কিছুদিন আগেই গ্রেফতাব হযেছিলেন ফণী গুহ। কাজেই বাড়িটার ওপর সরকারের আই.বি তথা গুপ্ত পুলিশের 'ওয়াচ' অবশ্যই ছিলো। কিন্তু পার্টি প্রয়োজনীয় সময়ে উপযুক্ত ডিসিশন নিতে পারে নি।

আমি এত সবের কিছুই জানতাম না। আমি ছিলাম নির্বাসনে। ঢাকা জেলার মনোহবদি থানার চালাকচর-পীরপুর-শরীফপুর অঞ্চলে আত্মগুপ্ত অবস্থায়: আমার চাকরিতে রিজাইন করে 'আন্ডারগ্রাউন্ড' চলে যাওয়ার পর থেকেই হয়ত বা '৪৮ সনের মধ্য কিংবা শেষ দিক থেকেই। সেখানে আমার চলছিল ভালোই। জলের মধ্যে মাছের যেমন। কাঁঠাল

আর শুঁটকি–পুঁটির পোড়া খেয়ে।

কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ওষুধের ছোট্ট খামে হুকুম গেল : তোমাকে ২৩ ডিসেম্বর ঢাকায় আসতে হবে সাংগঠনিক আলোচনার জন্য। 'কোরিয়ার' গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসবে। তুমি রেডি থেকো।

আমি রেডি ছিলাম। আর 'কোরিয়ার' আমাকে রাতের আঁধারে প্রায় চোখ বাঁধার মতো করে অপরিচিত একটি এলাকার অপরিচিত একটি বাড়িতে নিয়ে এসে রেখে গেল। সেখানেই আলোচনাটি বসেছিলো। সকালের সেশন শেষ হয়েছে। হয়ত পাঁচ–ছ' জনের বৈঠক। দুপুরে বিরাম। খাওয়া–দাওয়ার জন্য। উচ্চকণ্ঠে কোনো কথা নয়। হাসিও নয়। কাশিও নয়। এ বাড়িতে কোনো লোক আছে, তা কেউ আন্দাজ করবে কি করে?

কিন্তু যাদের শ্বাপদ–চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছিল নিরীহ কেসেমের লোকগুলোকে, তারা ঠিকই আন্দাজ পেয়েছিলো।

তাই দুপুরেব শেষে, অন্ধকারের অপেক্ষা না করেই তারা আক্রমণ করল। বাড়িটা ঘিরে ফেলল। পেছনের দরজায় দমাদম আঘাত পড়ল। আমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হলো না, কি ঘটতে যাচ্ছে।

বিকেল বোধ হয় চারটে। পালাবার কোনো পথ নেই। তবু একটা দরজা দিয়ে দেয়াল টপকে পাশের বাড়িতে পড়লাম। সাথে তখন আর কে যেন ছিলো। চারপাশের বাড়ির ছাদেই মানুষজন উঠে গেছে। তারা হয়ত ভাবছে, পুলিশ ডাকাত ধরছে। আমরা এ বাড়ি থেকে ওবাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করতেই চারদিকে থেকে শব্দ উঠছে 'ঐ যায়, ঐ যায়।' এখন ভাবতে মজাই লাগছে। কিন্তু সেদিন?

পুলিশ সন্তোষের গায়ে হাত তুলেছিলো। হয়ত লাঠি মেরেছিলো। মাসিমা সহ্য করতে পারেন নি। চুলোর পাশ থেকে লাকড়ি তুলে তিনিও তাগ করেছিলেন পুলিশের দিকে।

মিনিট পনেরোর মধ্যে অপারেশন শেষ। সন্তোষ, মাসিমা, রানু চ্যাটার্জিসহ আমাদের সবাইকে ধরে একটা জায়গায় জড়ো করে নিয়ে এলো পাশের কোতোয়ালী থানায়। বসিয়ে বাখল এক গারদে। কিছু পরে দেখলাম আই বি মানে গুপ্ত পুলিশ নানা জায়গা থেকে খবর পেয়ে ছুটে আসছে। সবাইকে দেখছে। কার কি নাম, জেনে নিচ্ছে। আমার নাম শুনে অবাক হলো। চেহারার দিকে চেয়ে পছন্দ হলো না। ক্ষুদ্র দেহে ভারি নাম। এই নামের পেছনে তারা এখানে ওখানে এতদিন ছুটে বেড়িয়েছে। জেরার সময়ে আপ্যায়ন যে আরো কিছু না জুটেছিলো তা নয়। কিন্তু সে কথা স্মরণ করে কি হবে? রাতটা থানায় রাখল। পরের দিন পাঠিয়ে দিল ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে। জেলের গেটে নাম–পরিচয় লিখে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলো নানান জনকে নানান জায়গাতে। আমার সঙ্গে ছিলেন বোধ হয় সন্তোষ আর রেলশ্রমিক নেতা বারি সাহেব।

জেলখানার অফিস থেকে ভেতরে 'এসকর্ট' করে নিয়ে গিয়েছিলো নিরাপত্তা বন্দীদের খবরদারি করতো যে জাঁদরেল জমাদার, সেই নাজির জমাদার। গোড়াতে ছিলো বোধ হয় বিহারি। কিন্তু বাংলাদেশে থাকতে থাকতে 'বাংলা–বিহারিতে' পরিণত হয়ে গেছিলো। দশাসই চেহারা। ভারি আওয়াজ। নিয়ে গেল আমাদের 'ফাঁসির সেল' তথা খুপরিতে। আট

ডিগ্রিতে। পাশাপাশি আটটা খুপরি। সামনে পাশে উঁচু দেয়াল। ফাঁসির ডিগ্রিতে ঢোকাতে ঢোকাতে নাজির জমাদার আওয়াজ দিল, 'যাইয়ে। হিঁয়াছে আর যানে নেহি সাকতা। এখান থেকে আর বেরুতে হবে না।' সেদিনের পরিবেশে হুঙ্কাবটা মিথ্যে ছিলো না।

আমি এখনো জানিনে, সেই সেকালে, আমাদের গ্রেফতারের খবর অন্তত 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় ২৬ ডিসেম্বর কিংবা তার কাছাকাছি কোনো তারিখে কিভাবে উঠেছিলো।...

কথা শুরু করেছিলাম 'চল্লিশের দশক' নিয়ে। সেই ৪০ সনে বরিশালের একটি নিরীহ 'পোলা' কিশোর বালকের ঢাকা আগমনেব কথা বলে।

সম্প্রতি জাতীয় যাদুঘবের উদ্যোগী একজন কর্মী আবদুল মোতালেব আমাকে দিয়ে জন্ম থেকে অর্থাৎ ২৫ থেকে '৯৩ পর্যন্ত জীবনেব কাহিনীব একটি 'আউটলাইন' বারবার অনুরোধ কবে বলিয়ে তাঁর শব্দগ্রাহক যন্ত্রে ধরে রাখলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিযে একটা অনুভূতি জেগেছিলো। তাঁকে বলেছিলাম, আমার জীবনের আবার কথা কি? তবু বলতে গিযে দেখলাম, কথা কথাকে টেনে তুলছে। ঘটনা ঘটনাকে। তার পরিমাণে নিজেই একটু বিস্মিত হয়ে গেলাম। দ্বিধায–সঙ্কোচে পূর্ণ সেই 'পোলার' মনে জমা কথার পরিমাণ আজ দেখছি খুব কম নয়। ঘটনাব বিস্তাবিত বিবরণ নয়। কোনো ঘটনার বিস্তারিত স্মৃতি নেই।

আজ এখানেও এই নতুন পর্যাযেব কোনো বিস্তারিত বিবরণ নয়। এ প্রসঙ্গের উথাপন কেবল এই কথা বলতে যে, চল্লিশের দশকের যবনিকা ঘটল আমার জীবনে সেই ২৫ ডিসেম্বব ১৯৪৯ সনে।

এবপরের পর্যায় জেলের পর্যায। রাজবন্দীর জীবনের পর্যায়। এই পর্যাযের দৈর্ঘ্য কযেক কিস্তিতে প্রায় এগাবো বছব। এই এগারো বছবেই বাইবের পৃথিবীতে, পূর্ববঙ্গের সামাজিক–রাজনৈতিক জীবনে কত পরিবর্তন ঘটে গেছে। প্রথম পর্যায়ে বন্দী ছিলাম '৪৯ থেকে '৫৫ সনের মধ্যভাগ পর্যন্ত।

এই প্রথম পর্যায়েই ঘটেছিলো ঢাকা জেলের প্রায় একশ' বাজবন্দীর দীর্ঘ ৫৮ দিনের অনশন সংগ্রাম। জেলের ভেতর মানবেতর অবস্থা থেকে বাজবন্দীদের একটু মানুষের মতো মর্যাদা আদায় করার সংগ্রাম। এই অনশন ধর্মঘটের মাঝখানেই আমবা গ্রেফতার হয়েছিলাম। আর গ্রেফতার হওয়ার পরদিন থেকে অনশন সংগ্রাম আমরাও শুরু করেছিলাম। অন্য বন্ধুদের যদি ৫৮দিন হয়েছিলো তো মাঝখান থেকে আমাদের অর্থাৎ আমার, সন্তোষ, বারি সাহেব, এদের অন্তত ৩৩ দিন অনশন হয়েছিলো। কিন্তু তার মর্মান্তিক কাহিনী সংক্ষেপে বলা যায় না। অপর দু'একটি উপলক্ষে কিছু স্মৃতির টুকরোতে হয়ত এর আভাস দেবার চেষ্টা করেছি।

এই অনশনের দশ দিনের দিন ঘটেছিলো বন্দী, কুষ্টিয়ার শ্রমিক নেতা শিবেন রায়ের হত্যাকাণ্ড। 'ফোর্সড্ ফিডিং' বা জোর করে নাকের মধ্যে নল ঢুকিয়ে দুধ বা জলীয় কিছু ঢেলে দেওয়ার সময়ে শ্বাস বন্ধ করে হত্যা করার মর্মান্তিক ঘটনা।

আমার আফসোস পূর্ববঙ্গের রাজবন্দীদের বছরের পর বছর বন্দিদশার কাহিনী, তাদের

নির্যাতনভোগ, নিহত হওয়া এবং সমস্ত প্রতিকূল অবস্থাতেও নিজেদের রাজনৈতিক মনোবল রক্ষার অবিশ্বাস্য চেষ্টার কাহিনী আজ পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে রচিত হয় নি। এবং সে কাহিনী বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম এবং তার প্রগতিশীল সংগ্রামী কর্মীদের কাছে অজ্ঞাত। অথচ কারাগারের অন্তরালে সেদিনের শত শত কমিউনিস্ট রাজবন্দীর মরণপণ সংগ্রাম কারাগারের বাইরের রাজনৈতিক জীবনকে অনুপ্রাণিত করে জঙ্গী ও সংগ্রামী করে তুলেছিলো। আবার বাইরের সংগ্রামী জীবনের বিস্তার ও বিকাশ কারাগারের ভেতরের মুমূর্ষু রাজবন্দীদের জীবনকে আশার আলো দিয়ে সঞ্জীবিত করে তুলেছিলো।

অনশন ধর্মঘটের বিস্তার ঘটেছিলো রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে এবং সিলেটের জেলেও। সিলেটের জেলে '৫০ সনে স্থানান্তরিত হয়ে জেনেছিলাম সিলেট জেলের সাথীদের ওপর প্রৌঢ়, প্রবীণ আর কিশোব বন্দীদেব ওপর অবিশ্বাস্য অত্যাচারের কথা।

এই '৫০ সনেই ঘটেছিলো রাজশাহীর বাজবন্দীদের ওপর ২৪ এপ্রিল খাপড়া ওয়ার্ডে নির্বিচার গুলিবর্ষণ। আর তাতে নিহত হয়েছিলেন সাতজন রাজবন্দী, শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র আন্দোলনের নেতা হানিফ শেখ, বিজন সেন, সুধীনধর, কম্পবাম সিং, আনোয়ার হোসেন, দেলোয়ার হোসেন এবং সুখেন ভট্টাচার্য। আহত হযেছিলেন আরো অনেকে।

এই '৪৯-৫০ সনেই সাঁওতাল আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী ইলামিত্র এবং সাঁওতাল কর্মীবা গ্রেফতার হয়ে এসেছিলেন। গ্রেফতারের মুহূর্ত থেকে থানার হাজতে ইলামিত্রের ওপর সংঘটিত হয়েছিলো অবিশ্বাস্য পাশবিক নির্যাতন। সংখ্যাহীন সাঁওতাল বন্দী থানায় এবং জেলখানায় অত্যাচারিত হয়ে নিহত হয়েছিলেন।...

দশকের হিসেব হয়ত কালের বুকে সামান্য সময়ের হিসেব। তবু এই সামান্য সময়ের অসামান্য ঘটনাসমূহই রচনা কবেছিলো পূর্ববঙ্গের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের পরবর্তী বিবর্তন ও বিকাশের ভিত্তিভূমি।

২৪. ৯. ১৯৯৩

